ইসলামে দাস-দাসী ব্যবস্থা

যুদ্ধ-মনস্তত্ত্ব, জেনেভা কনভেনশন ও বাস্তবতা

ডা. শামসুল আরেফীন

- **প্রথম প্রকাশ**
  মার্চ ২০২২
- **গ্রন্থস্বত্ব**
  লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
  মাকতাবাতুল আযহারের পক্ষে ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা থেকে প্রকাশক মাওলানা মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত।
  দোকান নং : ১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা কর্তৃক পরিবেশিত।
- **ই-মেইল**
  maktabatulazhar2@gmail.com
- **প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র**
  ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা : 019 24 07 63 65
- **শাখা বিক্রয়কেন্দ্র**
  দোকান নং : ১, আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা : 01715 02 31 18
- **প্রচ্ছদ**
  বুশরা আফজাল
- **মূল্য**
  ৪৮০ (চারশত আশি) টাকা মাত্র

ISLAME DASH-DASHI BABOSTHA
JUDDHO MONOSTOTTO BASTOBOTA
by Dr. Shamsul Arefin
Published by : MAKTABATUL AZHAR, Dhaka, Bangladesh
Phone No: 01924 07 63 65

শারঈ সম্পাদকগণের ভূমিকা

১.

বইটি আমার আদ্যোপান্ত পড়ার সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ্। আমাদের শত্রুরা ইসলামের যেসকল বিষয় নিয়ে অধিক আলোচনা করে, মুসলিমদের ভুল বুঝাতে চায়, তার মধ্যে দাসপ্রথা অন্যতম। বিগত বছরগুলোতে এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক লাইভ আলোচনা হয়েছে, প্রবন্ধ লেখা হয়েছে এবং অনেকে বইও বাজারে আছে। কিন্তু তাদের সৃষ্টি করা সংশয়গুলো নিরসনে কোরআন-সুন্নাহ ও সালাফদের ব্যাখ্যার পাশাপাশি দাসপ্রথার সাথে যুদ্ধনীতি, সমাজনীতির সম্পর্কগুলো কেমন, বিস্তারিতভাবে তা জানা খুবই জরুরি ছিল। আজ ইউরোপের শেখানো ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামকে বুঝার রোগ অনেকের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই খুবই দরকার ছিল ইসলামের ব্যাখ্যা জানার সাথে ইউরোপের মানবতা ও দাসদের নিয়ে তাদের আসল চেহারা উন্মোচিত হওয়া। নতুবা বর্তমান সময়ে সৃষ্ট বহু প্রশ্ন মনে থেকে যাবে। যার বাস্তবতা আমরা আমাদের সমাজের মানুষদের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে বুঝতে পারি।

যারা সালাফদের ব্যাখ্যার অপব্যাখ্যা করে থাকে এবং ইউরোপের ব্যাখ্যা গ্রহণ করে বলে যে, দাসপ্রথাকে ইসলাম মানসুখ করে দিয়েছে, আমাদের প্রিয় শামসুল আরেফীন শক্তি ভাই এই বইটিতে তাদের বিস্তারিত জাবাব দিয়েছেন। বইটি পড়ে আমার যেটা মনে হয়েছে: এই বিষয়ে আরবি, উর্দু ও বাংলায় বেশ কিছু কিতাব পড়েছি। কিন্তু এত সুন্দর করে প্রতিটি কথা দলিল সহকারে গুছিয়ে লিখেছেন, এমন বই বাংলা ভাষায় দ্বিতীয়টি আর নেই। আমার বিশ্বাস: বইটি আমাদের জন্য যেমন জরুরি, তেমনি আমাদের সামনের প্রজন্মের জন্যও বইটি জ্ঞানগত জরুরত পূর্ণ করবে। তাই আমরা না থাকলে যেন আমাদের সন্তানদেরকে তারা ভুল বুঝিয়ে ভুল পথে নিতে না পারে, সেজন্য বাংলাভাষী মানুষের কাছে এই বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মানুষ মাত্রই ভুল করে, কিন্তু মানুষের চেষ্টা অনেক দামী। অনিচ্ছাকৃত থেকে যাওয়া ভুলগুলো সামনে শুধরিয়ে নেওয়া হবে, ইন শা আল্লাহ। তবে ইসলামের ব্যাখ্যাগুলো আলেমদের ব্যাখ্যা সামনে রেখে নেওয়া হয়েছে। নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু যুক্ত করা হয়নি।

আল্লাহ ! আমাদের এই মেহনতটুকু তুমি কবুল করে নেও। আমাদের ভুলত্রুটি তুমি মাফ করে দাও। আমিন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
আলিম | সম্পাদক | শিক্ষক

২.

অমুসলিম কিংবা প্রাচ্যবিদদের পক্ষ থেকে ইসলামের উপর আঘাত করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বিধানকে ফোকাস করা হয়। এরমধ্যে অন্যতম একটি হল দাসপ্রথা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। সুপ্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীতে নানাভাবে দাসপ্রথার প্রচলন চলে আসছে।প্রচলিত ছিল দাসপ্রথার বিভিন্ন উৎস। ইসলাম এসে একদিকে দাসপ্রথার একাধিক উৎসকে বন্ধ করেছে, অন্যদিকে মানব সভ্যতার নির্মম বাস্তবতা যুদ্ধকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্বের বিবেচনায় এই প্রথাকে পরিপূর্ণরূপে বিলুপ্তও করেনি।তবে এই একটি উৎস থেকে প্রাপ্ত দাসদেরকে আখিরাতের মুক্তি ও সামাজিক জীবনের সম্মানের দিকে নিয়ে আসার জন্য দিয়েছে নজিরবিহীন পদ্ধতি।

কিন্তু আমাদের মধ্যে হীনমন্যতার শিকার কিছু মুসলিম অমুসলিমদের প্রশ্নবাণে এই ক্ষেত্রে প্রান্তিক একটি অবস্থান গ্রহণ করেন।তারা ইসলামকে গুড হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়ে দাসপ্রথাকেই রহিত করে দেন। যা একদিকে ইসলামের অরহিত এক বিধানকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে, অন্যদিকে হিউম্যান সাইকোলজি ও যুদ্ধ বাস্তবতায় দ্বীনে ইসলামের উপযোগিতা ও সফলতাকে অস্বীকার করছে। কারণ যুদ্ধ পরবর্তী বাস্তবতায় ইসলামের সম্মানজনক দাস সিস্টেমের কোন বিকল্প আজ পর্যন্ত কোন সভ্যতা দিতে পারেনি। এমনকি জেনেভা কনভেনশনগুলোও পরাজিতদের উপর যুদ্ধ

পরবর্তীতে নেমে আসা বিপর্যয়ের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারেনি।

মুহতারাম শামসুল আরেফীন শক্তি ভাই বিভিন্ন সভ্যতায় দাসপ্রথার নিষ্ঠুরতা, ইসলামে দাসপ্রথার মহানুভবতা এবং আধুনিক দাসপ্রথার স্বরূপ এই তিনটি বিষয় বক্ষমান বইটিতে মুনশিয়ানার সাথেই তুলে ধরেছেন। দাসপ্রথা নিয়ে অমুসলিমদের জবাবেই ক্ষান্ত থাকেননি, প্রশ্ন করেছেন তাদের সিস্টেম নিয়ে। আঘাত করেছেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আধুনিক দাসপ্রথার কাঠামোতে।

আমাকে যদি এই বইয়ের অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে বলা হয়, তবে আমি এর তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরব।

এক. বইটিতে পরাজিত মানসিকতায় প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণের পরিবর্তে ইউরোপীয় দর্শনকে প্রশ্নবাণে আক্রমণ করা হয়েছে।

দুই. শান্তি ও মানবতার দাবিদার পুঁজিবাদী বিশ্বের হর্তাকর্তাদের চাপিয়ে দেয়া আধুনিক দাসপ্রথার নির্মম অথচ অনিন্দিত (যার নিন্দা করা হচ্ছে না) চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

তিন. মূল বিষয়বস্তুর সাথে কোনভাবে প্রাসঙ্গিক, এমন বিষয়গুলোর অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ আলোচনা এসেছে। উদাহরণস্বরূপ কনসেন্ট বা সম্মতির কথা বলা যায়। কনসেন্টের পশ্চিমা দর্শনের উপর ভিত্তি করে চলছে যতসব লিবারেল যৌন অসভ্যতা।লেখক অত্যন্ত চমৎকারভাবে কনসেন্টের ধারণার অসম্পূর্ণতা ও ক্ষতিকে তুলে ধরেছেন। এমন আরো অনেক বিষয়েরই আলোচনা এসেছে যা পড়ার সময়ই পাঠক দেখতে পাবেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা লেখকের চিন্তা ও কলমকে আরো শাণিত করুক। হিদায়াত ও দাওয়াতের পথে ইস্তিকামাহ দান করুক। সর্বোপরি বইসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের মেহনতকে কবুল করে নিক। আমিন।

মাওলানা ইফতেখার সিফাত

আলিম | লেখক | অনুবাদক | সম্পাদক

সূচিপত্র

শুরুর আলাপ

> "প্রতিটি মানবশিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি বানায়, খ্রিস্টান বানায়। [১]

ফিতরাত হল মানুষের সহজাত বোধ। অধুনা বিজ্ঞানীরাও দেখেছেন শিশুরা সহজাতভাবেই সর্বশক্তিমান একক স্রষ্টায় বিশ্বাসী: [২]

- অধ্যাপক জাস্টিন ব্যারেট তাঁর *'Born Believers:' The Sciencce of Children's Religious Belief'* বইয়ে সিদ্ধান্ত টেনেছেন: শিশুরা প্রাকৃতিক ধর্মে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে গোটা দুনিয়া একজন স্রষ্টা নির্মাণ করেছে, যিনি মানবীয় বৈশিষ্ট্যের ঊর্ধ্বে।

- ১৫১ জন নাস্তিক ফিনিশ প্রাপ্তবয়স্কের উপর, ১৪৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক নাস্তিক উত্তর-আমেরিকানের উপর এবং ৩৫২ জন প্রাপ্তবয়স্ক উত্তর আমেরিকানের উপর (নাস্তিক-আস্তিক মেশানো) করা ৩টি রিসার্চে উঠে এসেছে: সচেতনভাবে ধর্মহীন হওয়াটা অত্যন্ত কষ্টকর, প্রকৃতিকে পরিকল্পিত হিসেবে দেখার প্রবণতা গভীরভাবে স্বভাবগত। জীবিত-জড় ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুগুলোকে বাইরের কোনো স্রষ্টার সৃষ্টই হিসেবেই দেখেন ফিনল্যান্ডের নির্ধামিকেরা, এবং এই সৃষ্টির কোনো উদ্দেশ্য আছে তাও তারা স্বীকার করেন।

- অধ্যাপক ডেবোরাহ কেলমেন তাঁর *'Are Children Intuitive Theist'* প্রবন্ধে নানান রিসার্চ ঘেঁটে সিদ্ধান্তে এসেছেন: ৫ বছরের দিকে শিশুরা বুঝতে শুরু করে প্রকৃতি মানবসৃষ্ট নয়। ৬-১০ বছরের শিশুরা প্রকৃতির মাঝে একটি মহৎ কোনো উদ্দেশ্য টের পায়। শিশুদের ব্যাখ্যামূলক মনোভাবকে 'সহজাত আস্তিক্যবাদ' বলা যেতে পারে।

---

[১] সহীহ বুখারি ১৩৫৮, সহীহ মুসলিম ২৬৫৮
[২] হামযা জর্জিস, দ্য ডিভাইন রিয়েলিটি (অনুবাদ: মাসুদ শরীফ, সিয়ান প্রকাশনী)

- মনোবিদ পল ব্লুম প্রমাণ করে দেখিয়েছেন: একজন মহান পরিকল্পনাকারীর উপর বিশ্বাস এবং দেহ-মনের দ্বৈত সত্তা, ধর্মের এই দুই গুরুত্বপুর্ণ পয়েন্ট কিশোরদের চিন্তায় স্বভাবগত।

- মনোবিদ অলিভেরা পেত্রোভিচ তাঁর *Natural-Theological Understanding from Childhood to Adulthood* বইয়ে মন্তব্য করেন: অতিপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যধারী ঈশ্বরে বিশ্বাসটিই স্বাভাবিক, নাস্তিকতা আরোপিত ও অর্জিত অবস্থান। ৭ গুণ বেশি স্কুলগামী শিশু বিশ্বাস করে চারপাশের এসব ঈশ্বরের সৃষ্টি।

এরপর কী হল? শিশুকাল থেকে ১০-১৫ বছর সেক্যুলার পরিবার, সেক্যুলার সমাজ, কট্টর সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে আমাদের ফিতরাত নষ্ট হয়ে যায়। সহজাত নৈতিক বোধ, সহজাত মনন, সমাজবোধ, ভালোমন্দের বিচার নষ্ট হয়ে সেখানে জায়গা করে নেয় ইউরোপীয় রুচি। ইউরোপের এনলাইটেনমেন্ট (১৭শ-১৮শ শতাব্দী) ও মডার্নিটি (১৮৫০-১৯৪৫) থেকে উৎসারিত চিন্তাকাঠামো হয়ে পড়ে আমাদের কাণ্ডজ্ঞান। তা-ই হয়ে দাঁড়ায়, যা চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থা প্রণেতা লর্ড উইলিয়াম মেকোলে ১৮৩৫ সালে—

> “ এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা এমন একটা শ্রেণী তৈরি করতে চাই, যারা গায়ের চামড়ায় তো ভারতীয়, কিন্তু মন-মগজ-রুচিতে ইংরেজ’। [৩]

ইউরোপীয় রুচিতে যা আধুনিকতা, সেটাই আমাদের কাছে আধুনিকতা। ইউরোপ যেটাকে বলবে উন্নতি, সেটাই আমার চোখে উন্নতি। ইউরোপের চিন্তাদর্শন হয়ে দাঁড়ায় আমাদের দীন। স্বাধীনতা, মুক্তি, মর্যাদা, ঠিক-বেঠিক, ভালোমন্দ প্রতিটি শব্দের পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি আমরা ধারণ করি। তারা যেভাবে পৃথিবীকে দেখে, ঠিক সেই চশমা এঁটে নিই।

এরপর হঠাৎ কারও কারও সংবিৎ ফেরে, হুঁশ আসে— কারও আসে মাঝ-দুপুরে, কারও বেলা গড়ালে, কারও শেষ বিকেলে, কারও বা গোধূলিবেলায়। দীনে ফেরার পর এক দুর্নিবার ভালবাসা থেকেই হোক, আর এতদিন অবহেলার অপরাধবোধ থেকেই হোক, কিংবা ডুবন্ত লোকের পায়ের নিচে চর ঠেকার ফিলিংস থেকেই হোক। সবকিছুর চেয়ে বেশি টান আসে কুরআনে কারীম বুঝার প্রতি... সে এক দুর্নিবার আকর্ষণ। দুনিয়ার এই ইঁদুরদৌড়ের নাভিশ্বাসের মাঝে আরবি শিখে তিলওয়াতের চেয়ে বাংলা অনুবাদ কিনে পড়াটা বেশি সেন্স মেইক করে। বিপত্তিটা বাধে তখন! ইউরোপের চশমা

[৩] Minute on Indian Education,2nd February, 1935; Thomas Babington Macaulay, point12.

চোখে কুরআনের সরল থেকে সরল বাংলা অনুবাদও আর হজম হতে চায় না। পশ্চিম দিচ্ছে 'শান্তি'র বাণী, কুরআন দিচ্ছে 'যুদ্ধ'-এর আদেশ। পশ্চিম গাইছে 'স্বাধীনতা'র গান, কুরআন বলছে 'দাসপ্রথা'র বিধান। পশ্চিম শেখাছে 'উন্নতি'র শিক্ষা, কুরআন দিচ্ছে 'দুনিয়াবিমুখতা'র দীক্ষা। নারীকে পশ্চিম উন্মুক্ত করেছে, কুরআন বলেছে ঘরে থাকতে। পশ্চিম বলছে সমতার কথা, কুরআন দিচ্ছে 'বৈষম্যের' আইন। প্রশ্নরা এসে ভিড় করে... কেউ কেউ উত্তর খোঁজে, না পেয়ে বা মনমতো না পেয়ে জোর করে ঈমানটুকু ধরে রাখে। কেউ মনমতো জবাব না পেয়ে পাড়ি দেয় সন্দেহবাদ ও নাস্তিকতার দিকে। মূল সমস্যাটা যে চশমায়, তা কেউ দেখিয়ে দেয় না। চশমায় ময়লা থাকলে জানালার কাঁচ ঘষে কী লাভ?

প্রথম যে বিষয়গুলো নিয়ে বড় ধরনের খটকা লাগে, তার মাঝে একটা হল 'দাসপ্রথা'। কুরআনে আল্লাহ 'অধিকারভুক্ত দাস'দের সাথে ভালো ব্যবহারের কথা বলেছেন, তাদেরকে বিবাহ দেবার কথা বলেছে। তাদেরকে মুক্তিদানের চুক্তি করতে মালিকদের তাগিদ দিয়েছেন। স্ত্রী ও 'অধিকারভুক্ত দাসী'দের ছাড়া লজ্জাস্থানের ব্যবহারকে পুরুষের জন্য হারাম করেছেন, মানে 'দাসী'দের সাথে ব্যবহার হালাল করেছেন। একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয় এসব শুনলে। একবার মনে হয় আমার মনে বসে যাওয়া সমতা-স্বাধীনতা-নারীর মর্যাদার 'কমনসেন্সের' সাথে মিলছে না তো। আবার মনে হয় 'সেই যুগের বই তো'। জোর করে পশ্চিমা ধারণার সাথে মেলানোর জন্য কাউকে কাউকে বলতে দেখা যায় 'ধাপে ধাপে করলেও কুরআন দাসপ্রথার বিরুদ্ধেই'।

এই প্রশ্নটা যাকেই করবেন, সেই আপনাকে ৪টা কথার যেকোনো একটা বলবে—

১.সে সময়ের অর্থনীতিই ছিল দাসনির্ভর। তাই একবারেই বন্ধ করা হয়নি। (এর সাথে দাসী-সহবাসের কী সম্পর্ক?)

২.সে সময় সমাজই ছিল এমন। দাসপ্রথা, দাসী-সহবাস স্বাভাবিক ছিল। (তাহলে কুরআন কি শুধু সে যুগের জন্যই নাযিল হয়েছে? তাহলে এ যুগে কি কুরআন অপ্রাসঙ্গিক?)

৩.কুরআন তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে বলেছে। আগে খারাপ ব্যবহার করা হত। (দাসপ্রথা থাকবেই বা কেন? কুরআন একে রাখবেই বা কেন? তার মানে কুরআন 'সমতা' চায় না?)

৪.সেই যুগে দাসপ্রথার হুকুম ছিল, এখন আর নেই। (ইসলামে কোনো হুকুম রহিত হয়ে গেছে, এটার দলিল থাকা জরুরি [৪]। কোন আয়াত বা কোন হাদিস দ্বারা এই

[৪] তবে কেউ কেউ সূরা মুহাম্মদের ৪ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণের চেষ্টা করে যে, যুদ্ধবন্দিদের সাথে কেবল দুই

বিধান মানসুখ হয়েছে, তা কেউ দেখাতে পারবে না)

যার কোনোটাই আমাদের চশমার কাঁচে লেগে থাকা ময়লা সরাতে পারে না। কেন যেন এগুলো জবাব হয়ে ওঠে না। আমাকে এই বিষয়ে কয়েকটা পয়েন্ট খুব ভাবিয়েছে—

- ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম। সুতরাং ইসলামের বিধান আমাদের সাইকোলজির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- দাসপ্রথাকে ইসলাম যুদ্ধবন্দির সাথে খাস করেছে, সুতরাং মানুষের 'যুদ্ধকালীন সাইকোলজি'র সাথে এর সংযোগ রয়েছে।
- কুরআনের বিধান কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর দেয়া 'জীবনের মূলনীতি'। তাই যদি হয়, তবে তো যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে দাসপ্রথার বিধান তো কিয়ামত পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক হবার কথা। তাহলে বর্তমান সভ্যতা যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে কী বিধান দেয়? সেটা কি একইসাথে মানবিক এবং প্র্যাকটিক্যাল? দুটোই হওয়া চাই।

২০১৭ সালে 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' বইটিতে প্রথম লিখেছিলাম, খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। গত ৪ বছরে পড়াশোনা বেড়েছে, নতুন নতুন মাত্রায় উপলব্ধি করার সুযোগ হয়েছে 'দাসপ্রথা'র বিষয়টি। সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মিনার ভাইয়ের সাথে একটা ৪ ঘণ্টার লাইভ প্রোগ্রাম হয়েছিল ফেসবুকে। সেটি মুহাম্মদ হোসাইন ভাই শ্রুতিলিখন করে দিয়েছিলেন। তার সাথে আরও দার্শনিক ও ঐতিহাসিক আলাপ জুড়ে আজ আপনার হাতে 'দক্ষিণহস্ত মালিকানা: ইতিহাস- দর্শন-বাস্তবতা' বইটি।

বইটির মূল বিষয় 'ইসলামের দাসপ্রথা'র ধারণা নিয়ে হলেও পাঠক এর মাঝে খুঁজে পাবেন পাশ্চাত্য দর্শন, উপনিবেশবাদ, দাসপ্রথার আধুনিক ধরন ইত্যাদি নানান মাত্রিক আলোচনা, যা তাকে একটা সামগ্রিক আঙ্গিকে বিষয়টি বুঝার ও অনুভবের সুযোগ এনে দেবে ইনশাআল্লাহ।

শামসুল আরেফীন
২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

ধরনের আচরণই করা যাবে (হত্যা ও মুক্তি)। গোলাম বানানোর বিধান নাকি মানসুখ হয়ে গেছে। কিন্তু কথাটা যে ভুল, তা জানার জন্য দেখুন তাফসীরে রুহুল মাআনী ২৫/৩৬-৩৭ এবং ফতহুল বয়ান ৯/৫ — শারঈ সম্পাদক।

ইসলাম ও দাসপ্রথা

দাসপ্রথা

দাসপ্রথা একটি সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান। ঠিক কবে থেকে এর উৎপত্তি, তা বলা মুশকিল। তবে প্রাচীন সকল সভ্যতায় দাসপ্রথার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশর ও ভারতীয় সভ্যতা থেকে নিয়ে মেসোপটেমিয়া, চৈনিক, মায়া (দক্ষিণ আমেরিকা), অ্যাজটেক (বর্তমান মেক্সিকো), হিব্রু, গ্রিক ও রোমান সভ্যতা হয়ে ১৮০০ সালের আগ অব্দি দুনিয়ার সকল সমাজে, সকল যুগে দাসপ্রথা চলে এসেছে। অথচ কতকিছুই তো এর মাঝে বদলেছে। পজিটিভ-নেগেটিভ কোনোটাই না ভেবে চিন্তা করার বিষয় হল, সমাজ-সভ্যতার সাথে কতখানি প্রাসঙ্গিক হলে এর আবেদন সমান তালে বজায় থেকেছে যে, পূর্ববর্তী সকল সভ্যতায়, সকল সমাজে, সকল দেশে দাসপ্রথা ছিল। কেউ-ই কোনো কালেই কোনো সমাজেই একে বিমোচন করার চিন্তা করেনি।

কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। তবে কেবল উদাহরণ দেবার জন্যই উদাহরণ নয়। এসব উদাহরণ থেকে আমরা বুঝব ইতিহাস জুড়ে স্থানভেদে দাসপ্রথার চরিত্র। **কোথাও দেখা যাবে দাসপ্রথার চরিত্রটি জাতিবাদী।** যেমন গ্রীক-রোমানরা ভাবছে অগ্রীক-অরোমানরা নীচু জাত। যেহেতু আমরা জাতিগতভাবে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং নীচুজাতকে দাসত্ব বরণ করতে হবে। এরিস্টটল বলছেন :

> “ দাসত্ব একটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। মানুষ হয়ই দুই প্রকার— দাস এবং অ-দাস। কিছু মানুষ জন্মগতভাবেই দাস, যেকোনো পরিস্থিতিতে দাস হবার জন্যই তাদের জন্ম। বাকিদের জন্মই এদের শাসন করার জন্য, ইচ্ছেমত ব্যবহার করার জন্য এবং সম্পত্তি বানানোর জন্য। [Aristotle, Politics Bk 1, Ch. 5]

প্লেটো বলছেন: মানুষ ও বন্যপ্রাণীদের মাঝে, শহরে-বন্দরে, জাতিতে জাতিতে প্রকৃতিই এটা ঠিক করে দিয়েছে। যে শ্রেষ্ঠ সে নিকৃষ্টকে শাসন করবে ও বেশি পাবে।

এটাই ন্যায়। [Plato, Gorgias]

আর্য ও হিব্রু সভ্যতায়ও দাসত্বের এই বংশীয়, জাতিবাদী, জন্মগত, অনিবার্য, প্রাকৃতিক রূপটা পাবেন। ঋগ্বেদে অনার্য শত্রুদের 'দাস' বা 'দস্যু' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ যুগে 'দস্যু'রা আর্যদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে 'দাস'-এ পরিণত হত এবং তাদের ঘরবাড়ি ও জমি বাজেয়াপ্ত করা হত। পরাজিত দাসরা বিজয়ী আর্যদের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত। [৫] ইহুদিদের ওল্ড টেস্টামেন্টে অ-ইহুদি জাতিকে দাসত্বে গ্রহণের বিধান দেয়া হয়েছে। আর প্রাচীন ইহুদিধর্ম বংশীয় ধর্ম, বর্তমান ইহুদিবাদ জাতিবাদী ধর্ম। অর্থাৎ বনী ইসরাঈল ছাড়া বাকি জাতিরা নীচু। Old Testament-এ রয়েছে: [৬]

> “ তোমাদের চারপাশের জাতিদের থেকে পুরুষ এবং নারী ভৃত্যদের তোমরা পেতে পারো, তাদের থেকে খরিদ করতে পারো। তোমাদের মাঝে থাকতে আসা অস্থায়ী বাসিন্দাদের (ভিন জাতির) মধ্য থেকেও নিতে পারো, তারা হয়ে যাবে তোমাদের সম্পত্তি।

খ্রিস্টবাদ কী বলছে? রোমান খ্রিস্টান যাজক ও দার্শনিক থমাস একুইনাস বলেন: অসাধারণ বুদ্ধির মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই ক্ষমতা নেবে, কম বুদ্ধির শক্তিশালী মানুষকে প্রকৃতিই দাসের ভূমিকায় নামাবে। [৭] অর্থাৎ **যুগে যুগে সমাজে গোত্রে দাসপ্রথাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক পরিণতি হিসেবে দেখা হত।** দাস ও দাসমালিক উভয়েই একে নিয়তি বলে মেনে নিত। এ ব্যাপারে বাইবেলের অবস্থান হল সেন্ট পলের উপদেশবাণী—

> “ ক্রীতদাসেরা, তোমরা তোমাদের এ জগতের মালিকদের ভয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কায়মনোবাক্যে মেনে চলো, যেন তোমরা খ্রিস্টেরই মান্য করছ। কেবল সে দেখছে বলে, বা তাকে খুশি করার জন্যই না কেবল, বরং খ্রিস্টের দাস হিসেবে গডের ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য অন্তর থেকে মান্য করো। উৎসাহের সাথে কাজকর্ম করো, যেন গডেরই কাজ করছ, মানুষের না। [Eph 6:5-8 এবং Col 3:22-24]

> “ যারা দাসত্বে আছো, মালিকদের সকল সম্মানের আধার মনে করো। যেন

[৫] ঋগ্বেদ ১/১৯/৮, ৫/৩৪/৬, ৬/২৫/২, ৮/৪০/৬ সূত্রে প্রাচীন ভারতের দাসপ্রথা, ড. দেবরাজ চানানা।

[৬] Book of Leviticus, Chapter 25: 44-46

"Your male and female slaves are to come from the nations around you; from them you may buy slaves. 45 You may also buy some of the temporary residents living among you and members of their clans born in your country, and they will become your property.

[৭] Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles

গডের নাম ও শিক্ষার সাথে বেয়াদবি না হয়। [1Tim 6:1-2]

> দাসেরা, তোমাদের মনিবদের কর্তৃত্ব মেনে চল মন থেকে অনুগত হয়ে। যারা দয়ালু কেবল তাদেরই না, যারা নির্দয়, তাদেরও। [1Pet 2:18]

> দাসদের বলো তারা যেন মনিবদের প্রতি বাধ্যগত হয়, এবং তাদেরকে সবকিছুতে তুষ্ট করে। মুখের উপর কথা না বলে, চুরি না করে। বরং পরিপূর্ণ আনুগত্য দেখায়। ফলে তারা হবে ত্রাণকর্তা গডের আদর্শের অলঙ্কার। [Titus 2:9-10]

এখানে দাস হবার কারণ কেবল 'ভিন জাতির হওয়া' এবং 'অনিবার্য নিয়তি'। আবার দাসত্বের আরেকটি চরিত্র আমরা দেখব— কর্মফল। মধ্যযুগের খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিকরা কীভাবে দাসপ্রথার ব্যাখ্যায় দিচ্ছেন দেখা যাক। সেইন্ট অগাস্টিন বলছেন : দাসত্বের প্রধান কারণ হল 'পাপ'। পাপের দরুন একজন মানুষ আরেকজন মানুষের নিয়ন্ত্রণে আনীত হয়। যদি গডের আদেশ সে মেনে চলত, তবে এই পরিণতি ঘটতো না।... দাসত্বের শর্তই হল পাপের ফল [৮]

এনলাইটেনমেন্ট

এবার দাসপ্রথার আরেকটি চরিত্র দেখব, যেখানে নিম্ন সভ্যতার বা নিম্ন আদর্শের মানুষ বলে কেউ দাস হয়। পশ্চিমা জীবনাদর্শের ভিত্তি এনলাইটেনমেন্ট। তাদের আদর্শের নির্মাতা এই এনলাইটেনমেন্ট যুগের দার্শনিকেরা। তারা কে দাসপ্রথাকে কীভাবে দেখেছেন, সেটা জানলে আমাদের জন্য সহজ হবে বুঝতে।

ইমানুয়েল কান্ট

জার্মান আলোকায়ন যুগের মূল ব্যক্তিত্ব হলেন কান্ট। নিজে দাসপ্রথার ব্যাপারে কথা না বললেও তাঁর বিখ্যাত Theory of Race বেশ আলোচিত। এরিস্টটলের মতটাই তিনি বলেছেন একটু ভিন্নভাবে। তাঁর মতে, **কিছু গ্রুপ প্রাকৃতিকভাবেই শাসিত বা দাসত্বে থাকার জন্য উপযুক্ত, সেটা বোঝা যায় শারীরিক বৈশিষ্ট্য থেকে, যারা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশ থেকে এসেছে।** এই দৃষ্টিভঙ্গির দরুন কান্ট ও তাঁর অনুসারীদের যুক্তি হল, পুরো বিশ্বের সভ্যকরণ শক্তি (civilizing force) হল ইউরোপ। এবং আফ্রিকান ও নেটিভ আমেরিকানরা শাসিত হবারই যোগ্য। [৯]

---

[৮] St Augustine, The City of God, 19:15

[৯] Three Philosophers on Slavery , Classics of Western Philosophy

জন লক

ব্রিটিশ চেরাগায়নের পুরোধা বলা হয় জন লক-কে। তাঁকে লিবারেলিজমের জনক বলা হয়, বস্তুবাদের জনক বলা হয়। তিনিই বলেন: জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি হল 'ডিভাইন রাইটস'। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে তিনি সর্বপ্রথম 'জনগণের সরকার' এর কথা বলেন। স্বাধীনতা-সমতা তথা লিবারেলিজমের এই জনক নিজে একাধিক দাসব্যবসা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার ছিলেন। ব্রিটিশ কলোনিগুলোতে দাস সাপ্লাইয়ের জন্য Royal Africa Company গঠিত হলে তিনি এরও অংশীদার হন। ১৬৭৪ ও ১৬৭৫ সালে দুইবার বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেন।

আমেরিকার ক্যারোলিনা রাজ্যের Lords Proprietors-এর সেক্রেটারি ছিলেন। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কলোনিয়াল প্রশাসক ছিলেন। [১০] ক্যারোলিনা রাজ্যের সংবিধানের রচয়িতাদের একজন ছিলেন লক, যেখানে আইন ছিল:

> "Every Freeman of Carolina shall have absolute power and authority over his negro slaves [১১] (ক্যারোলিনার প্রত্যেক স্বাধীন মানুষ তার নিগ্রো দাসদের উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ধারণ করবেন)

Chapter 4 : Of Slavery-তে লক দাসত্বকে ২ ভাগে ভাগ করেন— বৈধ দাসত্ব আর অবৈধ দাসত্ব। তাঁর মতে, কেউ যদি অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করে এবং গ্রেপ্তার হয়, তবে তাকে হত্যা করাও বন্দিকারীর জন্য বৈধ, দাস বানানোও বৈধ। অন্যায় হামলাকারী ও ন্যায়বান বিজয়ীর মাঝে যুদ্ধের পরিণতি হল দাসপ্রথা। লকের মতে, একটা সশ্রম দণ্ড হিসেবে দাসপ্রথা অনুমোদিত। লকের আগে ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক আইনের জনক হুগো গ্রোশিয়াস, দার্শনিক থমাস হবসও দাসপ্রথার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

মন্তেস্কু

ফরাসি এনলাইটেনমেন্ট ও লিবারেলিজমের আরেক খুঁটি। তাঁর Spirit of Laws বইয়ে একদিকে তিনি লিখেছেন: দাসত্ব প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। কেননা, সকল মানুষ সমান এবং স্বাধীন হয়ে জন্মায়। আবার একই বইয়ে তিনি এরিস্টটলের Natural Slavery মতের পক্ষে লিখছেন। তাঁর মতে, বেশি ট্রপিক্যাল (গ্রীষ্মপ্রধান: উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য) এলাকার মানুষ হয় অলস ও আবেগী। সেসব জায়গায় রাষ্ট্র চালাতে হলে দাসপ্রথার দরকার পড়ে। ফলে এসব জায়গায় দাসপ্রথা একটা 'সহনীয়' রূপ ধারণ করে। যেহেতু এসব এলাকার লোক একটা স্বৈরাচারের দাসত্বের মাঝেই বসবাস করে,

---

[১০] Farr 2008, 497–499, for a list of Locke's posts and involvement with slavery

[১১] Locke, 'The Fundamental Constitutions of Carolina, 196

তাই মূল দাসপ্রথাটা একটা মৃদু ভাব নেয়, মালিক-দাসের একটা ঐক্যমত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মত হয়ে যায়। [১২]

হেগেল

পাশ্চাত্য দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক Georg Wilhelm Friedrich Hegel (১৭৭০-১৮৩১) ছিলেন এই বর্ণবাদ ও দাসপ্রথার একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁর মতে, আফ্রিকান সংস্কৃতি প্রাগৈতিহাসিক। নিগ্রোদের কোনো নৈতিকতাবোধ নেই। তাদের মাঝে দাসপ্রথা, বহুবিবাহ, নরমাংস ভক্ষণ ইত্যাদি প্রথা থেকে বুঝা যায়, তাদের মাঝে স্বাধীনতার কোনো ধারণা নেই। **তাদের ভাগ্য তাদের নিজেদের দেশে আরও খারাপ। দাসতে যদিও খারাপ, কিন্তু এদেরকে ম্যাচিউর করার জন্য দাসত্ব প্রয়োজন।** এজন্য একবারে দাসপ্রথা বিলোপ না করে পর্যায়ক্রমে মুক্তি দেয়াটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। (The Philosophy of History, trans. J. Sibree. Buffalo 96–99)

হেগেল জোর দিয়ে বলেন: **যদি আমি আমার প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি মোতাবেক চলি, তার মানে আমি এখনও ঠিক করতে পারিনি আমার কীভাবে চলা উচিত। সুতরাং এক্ষেত্রে দাসত্ব একটা তুলনামূলক উন্নতি** নিগ্রোদের জন্য, যাতে তারা নিজেদের স্বাধীনতার ব্যাপারে সচেতন হয়।

দাসপ্রথা নিয়ে হেগেলের বক্তব্যগুলো থেকে বুঝা যায়, তার মতে দাসত্ব কয়েকভাবে শিক্ষিত (slavery educates) করে তোলে :

১. দাসেরা ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক স্ট্যাণ্ডার্ডের অধীনে থাকতে বাধ্য হয়।
২. দাসত্ব কাজেকর্মে শৃঙ্খলা চাপিয়ে দেয়। প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করে।
৩. কাজের দ্বারা দাস নিজের প্রাকৃতিক সক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়।
৪. দাসত্বের দ্বারা সে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা পায় ইউরোপীয় অর্থনীতি থেকে।

মোদ্দাকথা, দাসত্ব ঐ রাষ্ট্র ও জাতির জন্য দরকারি যারা এখনও যৌক্তিক চিন্তার স্তরে পৌঁছেনি। দাসত্ব তাদের জন্য উচ্চস্তরে পৌঁছোবার মধ্যবর্তী অবস্থা (HG 197)। দাসত্ব ভালো জিনিস না, এটা শেষ হতেই হবে, তবে নিগ্রোরা এডুকেটেড হবার আগে না। একইভাবে কলোনিগুলোতেও দাসপ্রথার ব্যবহার মূলত অনুচিত; কিন্তু দাসত্বের দ্বারা দাসেরা এক ধাপ এগিয়ে যায় মুক্তির চেতনার দিকে (consciousness of freedom), যা অন্যভাবে সম্ভব নয়।

---

[১২] Russell Jameson, Montesquieu et lesclavage, 312-3

হেগেলের মতে, স্বাধীনতার চর্চা কেবল হতে পারে ক্ল্যাসিকাল ইউরোপে (গ্রেকো-রোমান), খৃষ্ট ইউরোপে এবং আধুনিক ইউরোপে। বাকি দুনিয়ার ক্ষেত্রে যদি ইউরোপ তার সভ্যতা আরোপ করে, তাহলে স্বাধীনতা প্রযোজ্য হবে। হেগেল সভ্যতাকে consciousness of freedom-এর ভিত্তিতে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন:

- একজনই স্বাধীন: রেড-ইন্ডিয়ান, আফ্রিকান, ভারতীয়, চীনা ও ওরিয়েন্টাল (পড়ুন মুসলিম) সভ্যতা।
- কিছু মানুষ স্বাধীন: গ্রীক ও রোমান সভ্যতা
- সবাই স্বাধীন: আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা (আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়াসহ)

ইউরোপীয়দের আমেরিকা দখল ও দাসব্যবসা এ কারণে জাস্টিফায়েড যে, তারা ফ্রীডম শেখাতে গিয়েছে। ফ্রীডম হল self-determination, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়া। নিজেই যুক্তি দিয়ে ঠিক করা যে, আমি কী অনুসরণ করব, কোন প্রবৃত্তি পুরা করব। ইউনিভার্সাল কোন নীতি মেনে চলব, নাকি চলবো না। (HG 148-49).এই সামর্থ্য প্রতিটি মানুষের আছে। যেমন: ওরিয়েন্টালরা (মুসলিমরা) এই স্পিরিটের ব্যাপারে জানেইনা, ফ্রীডমের সার্বজনীনতা জানে না, এজন্য তারা unfree.(87; my emphasis).যারা প্রি-হিস্টোরিক ও unfree কালচারে বাস করে তাদেরকে ফ্রীডম বাইরে থেকেই দিতে হয়। [১৩]

সুতরাং খুব স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে **সমতা এবং স্বাধীনতা বিষয়টা ক্ল্যাসিকাল লিবারেলিজমের হর্তাকর্তাদের কাছে দাসপ্রথার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না। দাসপ্রথার মাধ্যমেও সমতা টিকে থাকে, স্বাধীনতা টিকে থাকে** বলে তারা মনে করতেন।

জন স্টুয়ার্ট মিল

ক্ল্যাসিকাল লিবারেলিজমের আরেকজন বিখ্যাত দার্শনিক মিল। একদিকে উপযোগবাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক ও প্রবর্তক। সে হিসেবে দাসপ্রথার তীব্র বিরোধী। তাঁর বিখ্যাত উক্তি: 'বিধাতার আইনে দাসপ্রথার স্বীকৃতি থাকলে মানবসমাজের প্রথম কাজ হবে এমন বিধাতাকে প্রতিহত করা'। আবার তাঁকেই লিখতে দেখা যায়:

> " **বর্বরদের সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে সরকারের বৈধ পদ্ধতি হল স্বৈরাচার,** এটাই তাদের জন্য হবে উন্নতির কারণ এবং শেষমেশ তাদের জন্য এটাই ভালো বলে এটাই ন্যায়সঙ্গত।... **মুক্ত ও সমতাভিত্তিক আলোচনার দ্বারা যতক্ষণ**

[১৩] Alison Stone (Professor of European Philosophy, Lancaster University) Hegel and Colonialism.

কোনো মানবজাতি উন্নত হয়ে উঠছে না, তার আগ অব্দি কোনো অবস্থাতেই লিবার্টির(স্বাধীনতা) মূলনীতিটি প্রযোজ্য নয়। ততক্ষণ পর্যন্ত একজন আকবর বা শার্লম্যানের বিনাপ্রশ্নে আনুগত্য ছাড়া তাদের জন্য আর কোনো ব্যবস্থা নেই, যদি এমন কাউকে পাওয়া যায়। (On Liberty,Chapter 1,page 16)

অর্থাৎ যে জাতি উন্নত না, তাদের জন্য লিবার্টির মূলনীতি প্রযোজ্য নয়। এরকম দ্বিমুখী কথাবার্তায় ভরপুর পশ্চিমা একেকজন দার্শনিকের বক্তব্য। তাহলে কখন একটি জাতিকে উন্নত ধরা হবে? তাঁর মতে:

> "একটি দেশকে তখনই সভ্য ভাবা হয়, যদি আমরা মনে করি রাষ্ট্রটি উন্নত; মানুষ ও সমাজের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যে প্রস্ফুটিত; পরিপূর্ণতার পথে আরও আগানো; আরও সুখী, আরও অভিজাত, আরও জ্ঞানী। (Civilization, John Stuart Mill)

তারা কারা? মিল বলেন:

> "These elements exist in modern Europe, and especially in Great Britain, in a more eminent degree, and in a state of more rapid progression, than at any other place or time. -'এই বৈশিষ্ট্যগুলোর উপস্থিতি অন্য যে কোনও স্থান বা সময়ের চেয়ে আধুনিক ইউরোপে এবং বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেনে আরও অধিক পরিমাণে আছে। এবং অন্যান্য যেকোনো সময় ও স্থানের চেয়ে দ্রুত উন্নতির অবস্থায় রয়েছে এখানে'। (Civilization, John Stuart Mill)

অর্থাৎ ব্রিটিশ বা আধুনিক ইউরোপীয় জাতিগুলোর তুলনায় দুনিয়ার বাকি জাতিগুলোর জন্য লিবার্টির মূলনীতি প্রযোজ্য না। পরাধীন থাকাই তাদের জন্য মঙ্গলজনক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী লর্ড সিসিল রোড্স মিলের থিওরিকেই প্র্যাকটিক্যালি বলেছেন:

> "নেটিভদের সাথে আচরণ করতে হবে শিশুর মত। তাদেরকে ভোটাধিকার দেয়া যাবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্বরদের সাথে বোঝাপড়ায় আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে স্বৈরতন্ত্রের নীতি, যেমনটা ইন্ডিয়াতে সফলতার সাথে করা হয়েছে।'(The Making of a Racist State: British Imperialism and the Union of South Africa)

অর্থাৎ লিবার্টি-সমতা এগুলো শুধু 'সভ্য' জাতির জন্য। তাদের চোখে 'অসভ্য' জাতির জন্য এগুলো নয়। ফলে অসভ্য জাতিতে দাসত্বে নেয়াটা লিবার্টির পরিপন্থী না।

আমেরিকার জাতির পিতারা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতির পিতা (Founding Fathers) বলা হয় সেই সব বিপ্লবী নেতাদেরকে যারা ১৩টি কলোনীকে একত্র করে ব্রিটেন থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। মোটামুটি ৭ জনকে বলা হয় মূল Founding Fathers— John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison, এবং George Washington.

আমেরিকা রাষ্ট্রের নীতি হিসেবে তাঁরা ঠিক করেছিলেন কিছু মূলনীতি যা নানান বিবৃতি-ঘোষণা-সংবিধানে উঠে এসেছে। ৪ জুলাই, ১৭৭৬-এ আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে Thomas Jefferson বলেন:

> “ We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.
>
> এই সত্যগুলোকে আমরা স্বতঃপ্রমাণিত বলে বিশ্বাস করি যে, **সব মানুষ সৃষ্টিগতভাবে সমান।** সৃষ্টিকর্তা সকলকে কিছু অনিবার্য অধিকার দিয়েছেন। তার মাঝে অন্যতম হল- **জীবন, স্বাধীনতা** ও **সুখের সন্ধান।**

সেই Thomas Jefferson-**ই ৬০০ দাসের মালিক ছিলেন।** দাসী Sally Hemings-**এর গর্ভে তাঁর ৬ জন সন্তান ছিল।** জীবদ্দশায় তিনি মুক্ত করেন মাত্র ২ জনকে, ২ জনই তাঁর সন্তান। উইলে আরও ৩ জনকে মুক্তির আদেশ দিয়ে যান। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮২৭ সালে শেষ ১৩০ জনকে বিক্রি করে দেনা শোধ করা হয়।[১৪]

অর্থাৎ **'সৃষ্টিগতভাবে সমান', 'স্বাধীনতা', 'সুখের অধিকার' কথাগুলো তাঁদের দৃষ্টিতে দাসপ্রথার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না।** জর্জ ওয়াশিংটনের Mount Vernon এস্টেটে ৩১৭ জন দাস খাটত তাঁর মৃত্যুর সময়। পেনসিলভ্যানিয়া দাসমুক্তি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা হয়েও Benjamin Franklin দাস রাখতেন বলে জানা যায়। ইতিহাসবিদ Annette Gordon-Reed প্রেসিডেন্ট জেফারসনের ব্যাপারে বলেছেন: 'যদিও অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতাগণও দাস রাখতেন, জেফারসন ছাড়া আর কেউ তো মুক্তির সনদ রচনা করে যাননি।[১৫]

---

[১৪] Slavery at Jefferson's Monticello: "After Monticello", Smithsonian NMAAHC/ Monticello, January – October 2012

[১৫] Annette Gordon-Reed, Engaging Jefferson: Blacks and the Founding Father, The

অর্থাৎ আমেরিকার ফাউন্ডিং ফাদারেরা সবাই কমবেশি দাস রাখতেন। John Adams, Alexander Hamilton আর John Jay এর ব্যাপারে পাওয়া যায় তারা সক্রিয়ভাবে দাসপ্রথাবিরোধী ছিলেন। জেফারসন দাসপ্রথাকে হুট করে বিলোপ না করে ধাপে ধাপে বিলোপের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮২৪ সালে তিনি এমন একটা জাতীয় আইন পাশ করেন যে, নিগ্রো বাচ্চাদের সাড়ে বারো ডলারে কেনা হবে, তাদেরকে বড় করা হবে, পেশাগত প্রশিক্ষণ দিয় এরপর সান্টো ডোমিনিগোতে পাঠিয়ে দেয়া হবে মুক্ত করে, যাতে মেইনল্যান্ডে কোনো বিদ্রোহ করতে না পারে।

মোদ্দাকথা আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা পিতাগণ, কান্ট-হেগেল-লক-মন্তেস্কুদের এই চিন্তাধারাটা ভাবুন যে, দাস রাখাকে তাঁরা সেসময় স্বাধীনতা-সমতা মূলনীতির বিপরীত মনে করতেন না। বরং তাঁরা ভাবতেন নিগ্রোদের জন্য দাসপ্রথাই কল্যাণ। অর্থাৎ ক্ল্যাসিকাল লিবারেলিজমের জনক-ধারক-বাহক-নেতাগণের সমতা-স্বাধীনতার ধারণা দাসপ্রথার সাথে সাংঘর্ষিক ছিলো না। বরং নিগ্রোদের স্বাধীনতা-সমতা এসব উচ্চ আদর্শ শেখানোর জন্য দাসপ্রথাকে জরুরি ভাবতেন। তাহলে চিন্তার এই পরিবর্তন এলো কীভাবে। আধুনিক যুগে আধুনিক চিন্তাধারা বুঝতে হলে 'আধুনিকতা' (Modernity) কী জিনিস তা জানতে হবে। মডার্নিটি হল এনলাইটেনমেন্টের মতই ইউরোপের চিন্তার ইতিহাসে আরেকটি পর্যায়। সেই ১৪-১৫শ শতকে রেনেসাঁ, তারপর ১৭-১৮শ শতকে এনলাইটেনমেন্ট, এরপর ১৮৭০-১৯৩০ এ এসে মডার্নিটি। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পোস্ট-মডার্নিটি। মডার্নিটির চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য হল: সেক্যুলারিজম, লিবারেলিজম, প্রযুক্তি, প্রগতি, প্রথাবিরোধিতা। মডার্নিটির বিপরীত শব্দ হল ঐতিহ্য (Tradition)। মূল কথা হল, আগে যা ঘটেছে তা হল ট্রাডিশন বা প্রথা। প্রথা (মূলত ধর্ম) সমাজকে এগোতে দেয় না, আটকে রাখে। আজকের দিন অতীতের চেয়ে উত্তম, ভবিষ্যত আজকের চেয়ে উত্তম। অতীতের চেয়ে আজ যেমন জ্ঞানবিজ্ঞানে মানুষ উন্নত হয়েছে, তেমনি নৈতিকতায়ও উন্নত হয়েছে। আজকের সেক্যুলার-লিবারেল নৈতিকতা আগের ধর্মের নৈতিকতা থেকে উত্তম, এবং যত দিন যাচ্ছে আমরা উত্তম হচ্ছি। প্রথাকে ঝেড়ে না ফেলতে পারলে আমরা উন্নত হতে পারব না। জন লক, মিল, ওয়াশিংটন, জেফারসনদের চেয়ে আজকের নৈতিকতা আরও উন্নত। ভবিষ্যতে আমরা আরও উন্নত হতে থাকব সমকামকে মেনে নিয়ে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে মেনে নিয়ে, নারীবাদ-বিজ্ঞানবাদকে মেনে নিয়ে, ফ্রীসেক্স-কে মেনে নিয়ে।

আধুনিকতাবাদ একটা স্বতন্ত্র দীন, যা বাকি সব ধর্মকে অকেজো-সেকেলে-বাতিল

William and Mary Quarterly, Vol. 57, No. 1 (Jan. 2000), pp. 171–182

সাব্যস্ত করে। এমনকি নৈতিকতার ক্ষেত্রেও ধর্মকে নিষ্প্রয়োজন সাব্যস্ত করে নিজেকে ধর্মের আসনে বসায়। মানুষের চিন্তাজগতে ধর্মের আবেদন চিরতরে শেষ করে দেয়। এটা এমন ধর্ম যার সমালোচনা সহ্য করা হয় না। এই ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করলে আপনার মনুষ্যত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠবে। আপনি মধ্যযুগীয়, বর্বর, বিপজ্জনক এবং পটেনশিয়াল জঙ্গী। তো এই আধুনিকতাবাদের ফিল্টারে অন্যান্য ট্রেডিশনের মতোই দাসপ্রথা—সে ইসলামই বলুক, আর ক্ল্যাসিকাল লিবারেলিজমের দার্শনিকেরাই বলুক, আর সে যতোই মৃদু-নামেমাত্র কিংবা যতোই মানবিক হোক না কেন— একটা মধ্যযুগীয় চিন্তা, যা ঝেড়ে ফেলতে হবে, যা অমানবিক, যা আধুনিক মানুষের কাছে অগ্রহণযোগ্য। সমতার-স্বাধীনতার এই যুগে দাসপ্রথা শব্দটাই অকল্পনীয় জঘন্য ও ঘৃণ্য।

আধুনিকতাবাদের শিকার একজন মুসলিম এই পয়েন্টে এসে হীনম্মন্যতায় ভোগে ইসলামকে নিয়ে। 'আধুনিকতাবাদ ধর্মে'র সাথে সংগতিপূর্ণ কয়েকটি উত্তর সে খুঁজে নেয়—

- একবার জবাব আসে: 'সেই যুগের বই তো, সে যুগে সমাজ-অর্থনীতি অমনই ছিল'। কুরআনকে 'সেকেলে' বানিয়ে দিতেই হল একেবারে।
- আবার জোর করে পশ্চিমা ধারণার সাথে মেলানোর জন্য কাউকে কাউকে বলতে দেখা যায় 'ধাপে ধাপে করলেও কুরআন আসলে দাসপ্রথার বিরুদ্ধেই'।
- এক ধাপ আগে বেড়ে কেউ আবার বলবেন: কুরআন-হাদিসে উল্লেখ আছে ঠিকই, পরে রহিত (মানসুখ) হয়ে গেছে। কিন্তু কোন আয়াত দ্বারা, বা কোন হাদিস দ্বারা রহিত করা হয়েছে, তা দেখাতে পারবেন না।

ইসলামে দাসপ্রথা অনুমোদিত। এবং এখনও অনুমোদিত। অনেকে যেমনটি দাবি করেন যে, ইসলামে দাসপ্রথা রহিত হয়ে গেছে, তা পুরোপুরি ভুল। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা তা নিয়েই।

১.

সূরা মু'মিনুনের ৬ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা মুমিনদের গুণ বর্ণনা করতে করতে বলেন—

> " মুমিন তো তারা যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; তবে তাদের স্ত্রী এবং যাদের তারা মালিক হয়েছে (দাসী) ব্যতীত।

এ আয়াতে 'মা মালাকাত আইমানুহুম' শব্দ এসেছে। যার অর্থ 'অধিকারভুক্ত

দাসীগণ'। ইবনে কাসির (রহ.)-সহ সকল আলিমগণ এই অর্থ করেছেন [১৬]।

২.

সূরা নূর এর ৩২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন—

> " তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দিবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৩.

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তিম সময়ে তাঁর শেষকথা ছিল—

> " তোমরা সালাতের ব্যাপারে গুরুত্ববান থেকো এবং দাস দাসীদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। আল্লাহকে ভয় করো। [১৭]

যেহেতু এটা নবীজীর জীবনেরই শেষ কথা [১৮], সুতরাং এরপরে আর কারও এখতিয়ারই নেই দাসপ্রথাকে রহিত করার। না কোনো সাহাবীর, না পরবর্তী কোনো আলিমের। উপর্যুক্ত দু'টি আয়াত ও একটি হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে ইসলামে দাসপ্রথার অনুমোদন রয়েছে। যার দরুন পরবর্তীকালে সাহাবা-তাবেঈন এবং পরের যুগের মুসলিমগণ একে গ্রহণ করেছে, কেউ একে রহিত করার কথা বলেননি। মানবাধিকার সনদ, গেটিসবার্গ ভাষণ ইত্যাদি দ্বারা কুরআন-হাদিস রহিত হয় না। কাফিরদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে 'পরাজিত মানসিকতার' কিছু আধুনিক স্কলার বলতে চান যে, ইসলামে দাসপ্রথা এখন নেই। তারা যেই আয়াতটি রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেন তা হলো—

> " তোমাদের জন্য হালাল হল সতীসাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতীসাধ্বী নারী যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে (আহলে কিতাবদের সতী নারী)" [সূরা মায়েদা: ৫ নম্বর আয়াতের অংশবিশেষ]

---

[১৬] তাফসীরে ইবনে কাসীর ১০/১০৯

[১৭] ইবন মাজাহ প্রথম খণ্ড-১৯৮,আবু দাউদ ৫১৫৬

[১৮] এছাড়াও অন্যান্য হাদিসে পাওয়া যায় যে, নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ কথা ছিল: "আল্লাহুম্মা রফীকিল আ'লা"। [সহীহ বুখারি ৪৪৬৩, সহীহ মুসলিম ২৪৪৪] মূলত এটাই ছিল শেষ কথা, তবে সবগুলোকে শেষকথা বলার উদ্দেশ্য হল: নবিজি শেষ নসীহত হিসেবে যেগুলো বলেছিলেন ও পরবর্তী দায়িত্বশীলদের প্রতি যে ওসীয়ত করেছিলেন। — শারঈ সম্পাদক।

তাঁরা এ আয়াত থেকে বলতে চান যে, 'এখানে তো আল্লাহ দাসীদেরকে বৈধ করেছেন, তা বলেন নি। এটাতো শেষ দিকে নাযিল হওয়া আয়াত' (যেহেতু আয়াতটি ১০ম হিজরিতে আরাফার দিনে নাযিল হয়েছিল)। তাদের জন্য জবাব হলো, এ আয়াতের নির্দেশনা হল 'পাত্রী সতী হওয়া, ব্যভিচারী না হওয়া'। এখানে 'সতীসাধ্বী নারী' উদ্দেশ্য, 'স্বাধীনা-দাসী' ইস্যুই এখানে নেই[১৯]। সুতরাং, এ আয়াত কোনোভাবেই দাসপ্রথাকে রহিত করে না। নিজের অজান্তেই দীন বিকৃত করে ফেলছি কি না আমি, সে ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত। মডার্নিটির সাথে খাপ খাওয়ানোর ঠেকা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নেই।

শরীআর উৎস হলো কুরআন এবং সুন্নাহ। কুরআনের অন্যান্য আয়াত, হাদিস এবং নবিজিপরবর্তী সাহাবা রা.-দের আমল থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইসলামে দাসপ্রথার অনুমোদন রয়েছে। আর যদি দাসপ্রথার বিধান রহিত বা বাতিল হয়ে যেতো তাহলে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের অন্তিম সময়ে দাস-দাসীদের অধিকারের ব্যাপারে কথা বলতেন না, যা আমাদের কাছে সহীহ হাদিসে পৌঁছেছে। কিংবা সাহাবাগণ এর উপর আমল করতেন না, আমাদের ইমামগণ এ সম্পর্কিত শত শত ফিকহী মাসআলা উদ্ঘাটন করতেন না। বরং কুরআনের অন্যান্য আয়াত, সহীহ হাদিস, নবীজীর জীবন, সাহাবাদের জীবন থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দাসপ্রথার হুকুম আজও বর্তমান। 'কীভাবে বর্তমান' সেটাই আমাদের আজকের আলোচ্য।

উপমহাদেশে আমাদের আকাবির উলামাদের সিদ্ধান্ত যদি লক্ষ্য করি দেখা যাবে, তাঁরাও কুরআন-হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, আমাদের মত হীনম্মন্যতায় কখনও ভোগেননি।

- শাহ আহমদ শহীদ রহ. দাসপ্রথাকে অনুমোদন দিয়ে ফতওয়া জারি করেন।
- বিখ্যাত আহলে হাদিস আলিম নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালীকে ১৮৮৫ সালে দাসী আমদানির অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়, তিনি এর বৈধতার পক্ষে লড়াই করেন। [২০]
- ১৯২৬ সালে জমিয়তুল উলামা-র সভাপতি মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ কিফায়াতুল্লাহ

[১৯] যদিও কেউ কেউ ইখতিলাফ করেছেন, তবে জমহুরদের মত হল: এখানে দাস-দাসী প্রসঙ্গে বলা হয়নি। তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৩৮, আহকামু আহলিয যিম্মা ইবনুল কায়্যিম রহ. ১/৩০২ — শারঈ সম্পাদক।

[২০] Barbara D. Metcalf, Islamic revival in British India; Deoband 1860-1900 (Princeton: Princeton University Press, 1982) pp. 268-9, 278-80.

দাসপ্রথার শরঈ সীমারেখা মেনে তা পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন।

- মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী তাঁর ১৯৪৬ ও ১০৫৭ সালের গ্রন্থনায় লেখেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনোই দাসপ্রথাকে বিলোপের কথা বলেননি।
- ১৯৩৫ সালের রচনায় মাওলানা মওদূদীও যেসব মুসলিম দাসপ্রথা, জিহাদ, একাধিক বিবাহ ও দীনের অন্যান্য বিষয় নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগে তাদেরকে তিরস্কার করেন।
- ১৯৭৫-১৯৮২ সময়কালের ফতোয়ায় সৈয়দ আবদুর রহিম কাদরী দাসপ্রথাকে অনুমোদন করেন। এবং ইসলাম বিদ্বেষী হিন্দু লেখক অরুণ শুরীর প্রশ্নের জবাবে লেখেন : 'দাসীর সাথে সহবাসের অনুমতির জন্য যেসব শর্ত-শরায়েত প্রয়োজন, সেগুলো আজ পাওয়া যায় না'। [২১]

কুরআনের আয়াত নিজেদের মত করে বা বিদ্যমান পশ্চিমা দর্শন দ্বারা বুঝলে হবে না। কুরআনের আয়াত বুঝতে হবে নবীজীর কর্মপদ্ধতি ও সাহাবায়ে কিরামের শিক্ষা থেকে। ইসলাম কাফির যুদ্ধবন্দিদেরকে দাস হিসেবে গ্রহণের বিধান রেখেছে। এটা ইসলামের 'সিয়ার' বা আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধে বন্দি কাফিরদেরকে দাস হিসেবে গ্রহণের অপশন ইসলামী খিলাফতের খলিফা কিংবা শরঈ শাসকের রয়েছে। খলিফা বা শরঈ শাসক যদি পরামর্শ সাপেক্ষে কল্যাণ মনে করেন, চাইলে যুদ্ধবন্দিদের [২২]—

১. হত্যা করতে পারেন। (নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কোনো বন্দিকে হত্যার আদেশ দিয়েছেন, তবে সেটা যুদ্ধের দরুন নয়, অন্য অপরাধের কারণে)। ইবনে রুশদ সাহাবায়ে কেরামের ইজমার কথা বলেছেন যে, কোনো বন্দিকে এমনিতে হত্যা করা হবে না, দণ্ড হিসেবে হতে পারে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, কেবল দীনের স্বার্থে হতে পারে, কিন্তু অনেক বিশারদ মাকরুহ মনে করতেন। ইমাম সারাখসীর মতে, প্রধান সেনাপতিও করতে পারতেন না, শুধু রাষ্ট্রপ্রধানই পারবেন। সংক্ষেপে, যুদ্ধবন্দীর মৃত্যুদণ্ড অনুমোদিত হতে পারে অতিরিক্ত প্রয়োজনের তাগিদে এবং রাষ্ট্রের বৃহত্তর কল্যাণে। [২৩]

---

[২১] William G. Clarence-Smith (University of London); Proceedings of the 10th Annual Gilder Lehrman Center International Conference at Yale University, Slavery and the Slave Trades in the Indian Ocean and Arab Worlds: Global Connections and Disconnections

[২২] আল-হিদায়া (ই.ফা.) ২/৪৪২

[২৩] ইবনে রুশদের বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৩৫১ ও ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজ-এর সূত্রে Conduction of Muslim State, Dr. Muhammad Hamidullah.

২. নয়তো দাস বানাতে পারেন।

৩. স্বাধীন করে ছেড়ে দিতে পারেন এবং জিযিয়া-খারাজ কর আরোপ করে 'যিম্মী' মর্যাদা দান করতে পারেন। (ইরাক বিজয়ের পর উমার রা. সাহাবীদের সম্মতিক্রমে দাস না বানিয়ে সেখানেই বহাল রেখেছেন এবং জিযিয়া-খারাজ আরোপ করেছেন)

৪. ইমাম মুহাম্মদের মতে, মুসলিমদের অর্থের প্রয়োজন থাকলে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে পারেন। ইমাম আবু হানিফা দ্বিমত করেছেন।

৫. বন্দি বিনিময় করতে পারেন।

কাফিরদের কোনো ঐক্যমত সিদ্ধান্ত, কোনো কনভেনশন মানতে খিলাফত বাধ্য নয়। খলিফা সর্বাবস্থায় ইসলামী আইনশাস্ত্র মানতে বাধ্য। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এই অপশনটি খলিফার থাকবে। আধুনিকতা ধর্মে প্রভাবিত হয়ে আমার-আপনার মানতে কষ্ট হলেও এটাই ইসলামের বিধান।

আরেকটি নতজানু জবাব দেয়া হয় এভাবে: যেহেতু ইসলামের মেজায (ব্যাপক হারে দাসমুক্তির বিধান) এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম দাসপ্রথা চায় না। সুতরাং মানবেতিহাসে যেভাবেই দাসপ্রথা বিলোপ হোক না কেন, ইসলাম তার পক্ষে। এখন যেহেতু পশ্চিম একে বিলোপ করেছে, সুতরাং এটাই ইসলাম সম্মত। এই জবাবে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর মেলে না।

১. এর ফলে ইসলামের দায় এড়ানো যায় না। ইসলাম (আল্লাহ) তখনই কেন নিষেধ করল না এতো অমানবিক একটা জিনিস?

২. মেজায যদি তা-ই হবে, গত ১৪০০ বছরে কেন ইসলামই এটাকে বিলোপ করলো না ধাপে ধাপে।

৩. ইসলামের এই বিধান কি সেকেলে? তার মানে কুরআনের কিছু কিছু আয়াত অকেজো?

আল্লাহ স্বয়ং তাঁর রাসূলকে বলছেন:

وَلَن تَرضَى عَنكَ اليَهُودُ وَلَا النَّصٰرى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم قُل اِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الهُدٰى

“ আর ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের (আদর্শের) অনুসরণ করেন। আপনি বলে দিন: ‘নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত (আল্লাহর দেখানো দিশাই প্রকৃত দিশা)’... [২৪]

[২৪] সূরা বাকারাহ ২: ১২০

যতই নতজানু জবাব আপনি দেন না কেন, তা প্রশ্নকে স্যাটিসফাই করে না। ইসলামকে যতোই আপনি মহান করে উপস্থাপন করেন না কেন, ইসলামের দাসপ্রথাকে যতোই উদার দেখান না কেন, সকল জবাব শেষে যে মডার্নিটির শিবির থেকে প্রশ্নটা থেকে যাবে তা হল:

১. যত মানবিকই করুক না কেন, এখানে মানুষকে সম্পত্তি তো বানানো হয়।

২. মানুষের স্বাধীনতা খর্ব তো করা হয়।

৩. কুরআন-হাদিস-সাহাবাদের আমল একে অনুমোদন তো দিয়েছে, বৈধ তো করেছে। হারাম তো করেনি।

ক্ল্যাসিকাল লিবারেলিজমের চোখেও ইসলামী দাসপ্রথা প্রবলেম্যাটিক ছিল না। হেগেল-লক-হবস-প্রেসিডেন্ট জেফারসন-ওয়াশিংটনদের চোখে মাত্র ১৭০ বছর আগেও এটা নৈতিকভাবে ভুল কিছু না। ১৭০ বছরে এমন কী হয়ে গেল যে, হাজার বছর ধরে আর্থসামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক একটা প্রতিষ্ঠান নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হল। এই আলাপটা আমরা সামনে করব। 'ইসলামের দাসপ্রথা কেমন' এটা মূল প্রশ্ন নয়। 'ইসলামে দাসপ্রথা কেন' এটাই প্রশ্নকারীদের মূল আপত্তি। শুরু আমরা এখান থেকেই করবো।

কেন ইসলাম দাসপ্রথা রেখেছে?

মুসলিমদের উদ্দেশ্যে প্রথম জবাব হলো, এটা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার দেওয়া বিধান। আল্লাহ ভালো মনে করেছেন, তাই রেখেছেন। আমাদের বায়োলজির স্রষ্টা, সাইকোলজির স্রষ্টা, ফিজিক্সের ল'গুলোর স্রষ্টা, সামাজিক প্রক্রিয়ার ফর্মুলার স্রষ্টা একে মানবজাতির জন্য ভালো মনে করেছেন, বহাল রেখেছেন। তাই আমরা মুমিনরা এভাবেই বিশ্বাস করবো। [২৫]

শরীআর কোনো বিধান নিয়ে আমরা মুসলিমরা প্রশ্ন তুলি না। বিধানের মাধ্যম(রাসূল) সম্পর্কে যদি আমি নিঃসন্দেহ থাকি, তবে বিধান নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। আর বিধান নিয়ে আমার সংশয় আছে মানে বিধানের উৎস নিয়ে আমার সন্দেহ আছে (নবিজি সত্যিই আল্লাহর রাসূল কিনা)। ইসলামের যেকোনো বিধান নিয়ে সংশয় তৈরি হলে আগে বিধানের যৌক্তিকতা খুঁজবেন না। আগে নবিজির সত্যতা ক্লিয়ার হয়ে আসুন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়া সাল্লামের উপর একবার নিঃসন্দেহ হয়ে গেছি মানে, তাঁর থেকে যা যা বর্ণিত বলে প্রমাণিত, সবকিছু যৌক্তিক ও সর্বাঙ্গসুন্দর, আমার বুঝে আসুক বা না আসুক। লজিক যা খাটানোর নবিজির সত্যতার বিচারে খাটান, বিস্তারিত জানতে লেখকের 'কাঠগড়া' বইটি দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় কথা হলো, তবে আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি যে, তিনি তাঁর অপার প্রজ্ঞার কিছু কিছু আমাদের বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। এ বিধানের পেছনে নানান হিকমত রয়েছে, যা আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করে দেখিয়ে দিয়েছেন। যদি তিনি তা বুঝার ক্ষমতা আমাদের না-ও দিতেন, তবুও এর উপর আমাদের বিশ্বাস রাখা ফরজ ছিল।

[২৫] 'না বলে কারও জিনিস নেয়া খারাপ' এটা যেমন আমরা ফিতরাত দিয়ে বুঝি, একজন সর্বশক্তিমান স্রষ্টায় বিশ্বাস এমনই ফিতরাতী বিষয়। আর রাসূলের সত্যতা তাঁর জীবনী এবং কুরআনের সত্যতা তার ভাষাশৈলী থেকে সাহাবীরা বুঝেছেন ও ঈমান এনেছেন। একবার ঈমান আনার পর ইসলামের বিধান নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন নেই।

আল্লাহ দয়া করে বুঝার তাউফিক দেন, যাতে আমরা দুর্বল ঈমানদাররা বুঝে ঈমান আনতে পারি। দেখা যাক, আল্লাহর প্রজ্ঞার কতটুকু আমরা বুঝতে পারি।

কারণটি কি অর্থনীতি?

অনেকে ইসলামের দাসপ্রথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'অর্থনৈতিক কারণ' উল্লেখ করেছেন। তারা বলতে চান, যেহেতু তৎকালীন অর্থনীতিই ছিল দাসনির্ভর অর্থনীতি, ফলে দাসপ্রথা একেবারেই নির্মূল করে দিলে সমাধানের বদলে সমস্যা তৈরি করতো, অর্থনীতি-উৎপাদন ভেঙে পড়তো। এজন্য ইসলামে দাসপ্রথা বহাল রেখে মুক্তির সুযোগ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে দাসরা ক্রমে ক্রমে মুক্তি পেয়ে যায়। এই যুক্তির সমস্যা হল, এর ফলে ইসলামের উপর থেকে অভিযোগ মিটে না। কেননা মুক্তিও পাচ্ছে, ওদিকে মার্কেটে নতুন দাস কিন্তু আসছেই, এই পদ্ধতিতে দাসপ্রথা কোনোদিন বিলোপ হবে না। এবং তা-ই হয়েছে, পুরো ইসলামের ইতিহাসে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়নি। ফলে প্রশ্ন রয়েই যায়: ইসলাম কেন এই 'অমানবিক' সিস্টেম বহাল রাখল।

আবার যারা বলতে চান, ইসলামে দাসপ্রথা এখন রহিত হয়ে গেছে, তাদেরও যুক্তি এটাই। আগে যেহেতু দাস-নির্ভর অর্থনীতি ছিল, তাই নবিজি নিষেধ করেননি। কিন্তু ইসলামের মূল মেজায যেহেতু এটাই যে, মানুষ স্বাধীন। সুতরাং যেহেতু এখন দাসপ্রথার উপর কোনো নির্ভরতা নেই, সুতরাং ইসলামে এখন তা রহিত বা বাতিল। কিন্তু ইসলামে যেকোনো হুকুম বাতিল হতে হলে তার দলিল প্রয়োজন। এভাবে মেজাযের কথা বলে হাওয়ার উপর কোনো বিধান বাতিল করা যায় না।

মূলত এই যুক্তিটাই ভুল যে, সেসময় অর্থনীতি দাস-নির্ভর ছিল, বিশেষত সেসময় আরবের অর্থনীতি কোনোভাবেই 'দাস-নির্ভর' ছিল না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক Moses Finley (১৯১২-১৯৮৬) দাসপ্রথার উপর ভিত্তি করে সমাজগুলোকে ২ ভাগে ভাগ করেছেন— দাসসমাজ (Slave Society), এবং দাসওয়ালা সমাজ (society that have slaves)। দাসসমাজের ৩টি শর্ত দিয়েছেন:

- ঐ সমাজের একটা বড় অংশ দাস থাকতে হবে (কমপক্ষে ২০% লোক)
- উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে দাসদের গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা থাকতে হবে।
- সংস্কৃতিতে দাসদের প্রভাব থাকতে হবে। [২৬]

[২৬] Finley, Ancient Slavery and Modern Ideology (1980)

একই কথা বলেন কেম্ব্রিজের প্রোফেসর Keith Hopkins-ও। তাঁদের মতে, ইতিহাসে কেবল ৫টি সমাজ এই শর্ত পূরণ করে— গ্রীক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ উপনিবেশ, ব্রাজিল উপনিবেশ এবং আমেরিকার দক্ষিণী রাজ্যগুলো। যেখানে উৎপাদন অর্থনীতিতে দাসদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল। [২৭] আর মধ্যপ্রাচ্যের সমাজ ছিল জাস্ট দাসওয়ালা সমাজ যেখানে দাসরা ছিল উৎপাদন ব্যবস্থায় নগণ্য, দাসপ্রথা এখানে একমাত্র শ্রম না, শ্রমেরই আরেকটা ধরন মাত্র।

সুতরাং তৎকালীন আরবের অর্থনীতি দাস-নির্ভর ছিল, কথাটা বোধ হয় সঠিক নয়। অর্থনীতির ২০%-এও দাসদের ভূমিকা ছিল না। দাসেরা এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না যে, নবীজীকে শ্রেফ অর্থনৈতিক কারণে এমন অমানবিক প্রথা অনুমোদন দিতে হবে। আর **যদি এতো গুরুত্বপূর্ণই হবে, তারা যদি এতো প্রয়োজনীয়ই হবে, তাহলে দাসমুক্তির এতো ব্যাপক তাগিদও দিতেন না। কারণ অর্থনীতি যদি দাস-নির্ভরই হবে, তাহলে দাসমুক্তি তো অর্থনীতির জন্য বিপদ।** ঠিক যেমনটি আমরা উপরের ৫টি সমাজে পাই, দাসমুক্তির হার শূন্যের কাছাকাছি।

- Eva Sheppard Wolfe এর মতে ভার্জিনিয়া প্রদেশে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পরের ২ দশকে দাসমুক্তির হার ছিল সবচেয়ে বেশি। সেটা কত? ২ দশকে মানে '২০ বছরে ১১,০০০ জন'। শুধু ভার্জিনিয়ার ২,৯৩,০০০ দাসের মধ্যে ২০ বছরে ১১,০০০। ওনার হিসেবে দাসমুক্তির হার ০.২%।
- Keila Grinberg এর গবেষণায় পর্তুগীজ ব্রাজিলে 'প্রতি দশ বছরে ১০০ জন' দাস মুক্ত হত। [২৮]

দাস-নির্ভর অর্থনীতিতে দাস মুক্ত কেন হবে অর্থনীতির ক্ষতি কোরে? তার মানে দাসপ্রথা রেখে দেয়ার মূল কারণ অর্থনীতির ক্ষতি না, মূল কারণ অন্যখানে।

আসল কারণ: যুদ্ধনীতি

ইসলাম দাসপ্রথা কেন টিকিয়ে রেখেছে, সেটা বুঝতে হলে আগে বুঝতে হবে দাসবাজারে দাস আসতো কোথা থেকে। দাসের উৎসের সাথে ইসলামের স্বার্থটা কী? তাহলে চলুন জানা যাক, slave market এ নতুন দাস কীভাবে প্রবেশ করতো

[২৭] Keith Hopkins, Conquerors and Slaves (1978)

[২৮] Paths to Freedom: Manumission in the Atlantic World; edited by Rosemary Brana-Shute, Randy J. Sparks. p11

বা করে। সেটা বর্তমানের 'আধুনিক দাসপ্রথা'-ই হোক, আর সেই যুগের যেকোনো মাত্রার দাসপ্রথাই হোক না কেন। বিশ্ব-ইতিহাসে সকল সমাজে ৫টি উপায়ে নতুন দাস মার্কেটে আসে—

- কেউ **নিজেকে বিক্রি** করে দিতো অভাবে। ঋণ শোধ করতে না পেরে, বা পেটের দায়ে নিজেকে দাসত্বে আবদ্ধ করতো।

- কেউ অভাবে **সন্তানকে বিক্রি** করে দিতো। এখনও দুনিয়ার নানান প্রান্তে এটা প্রচলিত। বিশেষ করে ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর বহু মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় নিজ সন্তানকে বিক্রি করে দিয়েছে বলে জানা যায়।

- **অপহরণ**। Transatlantic slave trade-এ আফ্রিকা থেকে এভাবেই দাস সংগ্রহ করা হত। www.slavevoyages.org জানাচ্ছে:

> “ The Trans-Atlantic Slave Trade Database has information on almost 36,000 slaving voyages that forcibly embarked over 10 million Africans for transport to the Americas between the sixteenth and nineteenth centuries. The actual number is estimated to have been as high as 12.5 million.

এখনও চাকরির কথা বলে, উন্নত জীবনের কথা বলে 'মানবপাচার' এরই নতুন রূপ, যা আমরা আধুনিক দাসপ্রথার আলোচনায় দেখবো।

- **দাস-দাসীর সন্তানও** দাস হতো। মালিক-দাসীর সন্তানও দাস হতো। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন যে দাসীর (Sally Hemings) গর্ভে ৬ জন সন্তানের জন্ম দেন, সেই দাসী ছিল প্রেসিডেন্টের শ্বশুরের ঔরসে, তার মা ছিল দাসী। অর্থাৎ দাসীর গর্ভে মালিকের সন্তানও দাস বিবেচিত হত। Virginia 1662 statute-এ আইন করা ছিল:

> “ All children born in this country shall be held bond or free only according to the condition of the mother” (Hening, 819, 3:252).

অর্থাৎ মায়ের স্ট্যাটাসই সন্তানের স্ট্যাটাস। **বিপরীতে, ইসলামে মালিক-দাসীর সন্তান স্বাধীন** [২৯]**, পিতার বৈধ সন্তান এবং ওয়ারিশ**। আব্বাসী ও উসমানী খলীফাদের অধিকাংশই এমন দাসী মায়ের সন্তান। বিষয়টি আমরা 'হারেম' সংক্রান্ত আলোচনায় বিস্তারিত পাব।

---

[২৯] ইবনে মুনযির, ইজমা পৃ: ১১২; ইবনু আবদিল বার, ইস্তিযকার ৭/৪৩৯

- **যুদ্ধবন্দি।** যুদ্ধে পরাজিত সেনাদের বিজয়ীরা বন্দি করবে এবং দাস বানাবে।

এই ৫ ভাবে নতুন দাস বাজারে যোগ হত। আবার দেখুন, এই ৫ ভাবে একজন স্বাধীন ব্যক্তি দাসে পরিণত হতো। **ইসলাম এসে ৫ টার মধ্যে কেবল 'যুদ্ধবন্দি' আর 'দাসের সন্তান' ছাড়া বাকি সবগুলোকে বন্ধ করে দিলো।** নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

> " আল্লাহ তাআলা বলেন: আমি কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হবো—
>
> ১. যে আমার নামে শপথ করে অতঃপর বিশ্বাসঘাতকতা করে,
>
> ২. যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে (ক্রীতদাস হিসেবে) বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করে,
>
> ৩. যে কোন মজুরকে নিযুক্ত করে তার থেকে পরিপূর্ণ কাজ গ্রহণ করে, অথচ তার পারশ্রমিক প্রদান করে না। [৩০]

দাস-দাসীর সন্তান যেহেতু অলরেডি মার্কেটেই আছে, দাস স্ট্যাটাসেই আছে; মার্কেট থেকে বের হয়নি (মুক্ত হবার বা স্ট্যাটাস থেকে বের হবার মতো কোনো কারণ ঘটেনি) সুতরাং বলা যায়: **ইসলাম কেবল 'যুদ্ধবন্দি' ছাড়া দাস সাপ্লাইয়ের আর সব রাস্তাকে বন্ধ করে দিয়েছে।** প্রফেসর Robert C. Davis তাঁর *Christian slaves, Muslim masters* বইয়ের ভূমিকায় লেখেন—

> " আমেরিকার দাসপ্রথা উত্তর আফ্রিকার দাসপ্রথা থেকে ভিন্ন এই অর্থে যে, আমেরিকারটা ছিল পুরোটাই ব্যবসা (true trade)। কিন্তু উত্তর আফ্রিকায়, দাস বেচাকেনায় লাভ তো অবশ্যই হোত, কিন্তু **দাস আসাটা (traffic) সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হত জিহাদে প্রতিশোধপরায়ণতা দ্বারা'।** [৩১]

আবার সব যুদ্ধবন্দিই দাস হয়ে দাসমার্কেটে আসবে তাও না। আমরা আগেই দেখেছি যুদ্ধবন্দিদের জন্য 'দাস বানানো'-টাই ইসলামে একমাত্র অপশন না। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাস্ত বন্দি কাফিরদের ব্যাপারে ৫টি ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ ইসলামে রয়েছে [৩২]। মুসলিমদের কল্যাণ ও তাদের অপরাধ অনুপাতে এগুলোর যেকোনো এক বা একাধিক ব্যবস্থা নিতে পারেন খলিফা বা বাহিনীর আমীর [৩৩]।

ক. তাদেরকে হত্যা করা: বনু কুরাইযা (পূর্বেকার অপরাধ: উপর্যুপরি চুক্তিভঙ্গ, শত্রুপক্ষের সাথে যোগ দেয়া ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা)

---

[৩০] সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ২২২৭

[৩১] Robert C. Davis, Christian slaves, Muslim masters, intro.

[৩২] ইবনে কুদামা, মুগনী ৯/২২০; ইবনে তাইমিয়া, মাজমাউল ফাতওয়া ৪/১১৬

[৩৩] Conduction of MUslim State, Dr. Muhammad Hamidullah. article 442

খ. মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া: বদর যুদ্ধের পর
গ. মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দেওয়া: বনু মুস্তালিক
ঘ. দাস বানানো: আওতাসের যুদ্ধ
ঙ. বন্দি বিনিময় করা।

অর্থাৎ দাস বানানো 'একমাত্র অপশান' নয়, এটি ৫টি অপশনের একটি। অর্থাৎ দাস যে বানাতেই হবে ব্যাপারটা এমনও নয়, অর্থাৎ ফরজও না। দাস হিসেবে যুদ্ধবন্দিদের গ্রহণ জায়েয বা অনুমোদিত বিধান। যদি আমিরুল মুজাহিদিন (সেনাপতি) মনে করেন যে, মুসলিম বাহিনীর অর্থের প্রয়োজন, তখন মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আবার যদি দেখা যায়, তাদের রিগ্রুপ করার সম্ভাবনা বেশি, তাহলে দাস হিসেবে গ্রহণের আদেশ দিতে পারেন। যদি দেখেন এরা বার বার চুক্তিভঙ্গ করছে, তাহলে মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারেন।

অর্থাৎ সকল দরজা বন্ধ করে ইসলাম দাসমার্কেটে নতুন দাস আসার (স্বাধীন থেকে দাস স্ট্যাটাসে প্রবেশের) একটা দরজাই খোলা রাখল, আর সেটা হল— 'যুদ্ধবন্দি'। যুদ্ধবন্দি ছাড়া আর কোনো উপায়ে ইসলামে দাসপ্রথার সুযোগ নেই। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, **ইসলামের অনুমোদিত দাসপ্রথার সাথে সম্পর্কটা অর্থনীতির না, বরং সম্পর্ক আছে যুদ্ধের। ইসলামে দাসপ্রথা হলো একটা যুদ্ধনীতি। মুসলিম বিদ্রোহী বা অন্য মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নয়** [৩৪], **কেবল কাফির রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধের ক্ষেত্রে** যুদ্ধবন্দিদেরকে দাস হিসেবে গ্রহণের একটি অপশন ইসলাম রেখেছে। খুব এক্সক্লুসিভ ভাবে **'কাফির যুদ্ধবন্দি'**দেরকে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো: কেন রাখলো? কী দরকারে এতো অমানবিক একটা বিধান রাখা হল?

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের দৃষ্টিতে মৌলিকভাবে মানুষ স্বাধীন। অনন্ত পরকালের যে কথা ইসলাম বলে, জবাবদিহিতার ভিত্তিতে যে জান্নাত-জাহান্নামের কথা ইসলাম জানিয়েছে, তার ভিত্তিই তো এই 'ইচ্ছা', এই 'স্বাধীনতা'। এবং এই স্বাধীন সিদ্ধান্তটুকুরই হিসাব নেওয়া হবে হাশরের মাঠে। প্রত্যেকেই তার নিজ কর্মের জন্য দায়ী হবে যা সে 'স্বেচ্ছায়' করেছে। **সেদিন বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না, কেউ বলতে পারবেই না— আল্লাহ আপনি**

[৩৪] ইমাম সারাখসী, আল-মাবসুত ১০/১২৭

বিচারে জুলুম করেছেন। কেননা সে মেনেই নিবে, যার জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তা সে স্বাধীনভাবেই বেছে নিয়েছিল। ইচ্ছে করেই করেছিল।

আর যা অনিচ্ছায় করেছে তার জন্য রয়েছে ক্ষমা। বাধ্য হয়ে কিছু করতে হলে, হারামের অবৈধতাও স্থগিত করে দেওয়া, গুনাহ লেখা হবে না।

- ধর্ষণে মেয়েটার শাস্তি নেই।[৩৫]
- প্রাণ ওষ্ঠাগত হলে শূকরের মাংস নিষেধ স্থগিত।[৩৬]
- দুর্ভিক্ষের সময় চুরি, শাস্তি স্থগিত।[৩৭]
- দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া যাচ্ছে না, বসে পড়ো, কিয়াম বা দাঁড়ানোর ফরজ স্থগিত।[৩৮]
- প্রাণ চলে যাচ্ছে, এখন কুফরি কথা বললে কাফির হবে না।[৩৯]

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, পারলৌকিক জবাবদিহিতার শর্তই হল ইচ্ছার স্বাধীনতা, পছন্দের স্বাধীনতা। ইসলামের মেজায হল: মানুষ মৌলিকভাবে স্বাধীন। 'উপযুক্ত কারণ' ছাড়া স্বাধীনতা হরণ ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ। ইতোপূর্বে আমরা নবিজির হাদিস উল্লেখ করেছি যে, ৩ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনি খোদ সাক্ষী হবেন, যার মধ্যে এক প্রকার হল: যে স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস বানিয়ে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করে। খলিফা উমার রা. মিসরের গভর্নর আমর ইবনে আস রা. কে তিরস্কার করেছেন:

> " হে আমর! তুমি জনগণকে (কিবতী খ্রিস্টানদের) কবে থেকে গোলাম বানাতে শুরু করেছো? অথচ তাদের মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন ও মুক্ত হিসেবেই প্রসব করেছিল।[৪০]

একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণের 'উপযুক্ত কারণ'টি হল: ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই (তুলনীয়: দাসপ্রথার পক্ষে জন লকের যুক্তি)। । আধুনিক দর্শন, আইন, আন্তর্জাতিক

---

[৩৫] মাজমাউল আনহুর : ২/৪৩৬; শরহু মুখতাসারুত তাহাবি : ৮/৪৫৫

[৩৬] সূরা বাকারা : ১৭৩

[৩৭] মূলত ইসলামের 'হদ' বা দণ্ডবিধি কোনভাবেই বাতিল করা যায় না। কিন্তু উমার র.-এর জামানাতে একবার প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে চুরির সংখ্যা বেড়ে গেল। তখন তিনি চুরির কারণে হাত কাটার বিধান সাময়িকভাবে স্থগিত করেছিলেন। এটা হদকে বাতিল করা ছিল না। কেননা কোন শাসক বা খলীফার এই অধিকার নেই। তবে হদের বিধান সন্দেহের কারণে মওকুফ হয়ে যায়। এখানে সেটাই ঘটেছিল। যেহেতু দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ মরণাপন্ন হলেই চুরির মত ঘৃণ্যকর্ম করার কথা; সাধারণ অবস্থায় নয়, আর মরণাপন্ন হলে খাবার চুরি করে খাওয়ারও অনুমতি শারীআতে আছে। এই কারণেই উমার রা. সেই সময় হাত কাটার বিধান মওকুফ করেছিলেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন : ফতোয়া উলামা বালাদিল হারাম : ৪৮৩-৪৮৪) –শারঈ সম্পাদক

[৩৮] বুখারি ১১১৭; আল-ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ : ১/২০৪

[৩৯] সূরা নাহল : ১০৬

[৪০] ফুতুহুল মিসর পৃ: ১৯৫, তবে সনদ দুর্বল।

আইন সবখানেই এই নীতি স্বীকৃত যে, রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের বিরুদ্ধে, আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারীকে আটক করা হবে, বন্দি করা হবে, তার স্বাধীনতা খর্ব করা হবে। ঠিক একইভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক নীতি এই যে, ধৃত শত্রুর স্বাধীনতাকে খর্ব করে তাকে দাসে পরিণত করা হবে, যাতে তার দুষ্কর্ম মথিত হয়, তার দ্বারা ইসলামের ভবিষ্যত ক্ষতি রোধ করা যায়। [৪১] তুলনা করুন লিবারেলিজমের জনক দার্শনিক জন লকের মন্তব্যটা: ন্যায়-অন্যায়ের যুদ্ধে ন্যায়বান বিজয়ী অন্যায়কারী জালিমকে দাস বানাল তা হবে বৈধ দাসত্ব। এবং সাইয়্যেদ কুতুব শহীদের কালজয়ী উক্তি: ইসলামই সভ্যতা, বাকি সব জাহেলিয়াত। সুতরাং ন্যায়পক্ষ অন্যায়কারী পক্ষকে বৈধ দাসত্বে অধীন করবে। ঠিক এটাই আল্লামা শানকিতী রহ. উল্লেখ করেন: 'দাসত্বের কারণ হল তাদের কুফর এবং আল্লাহ-রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা' [৪২]

ইসলামী ফিকহের নানান আইন থেকেও এটা বুঝা যায় যে, স্বাধীনতা হল ইসলামের মৌলিক নীতি ও লক্ষ্য। কেননা ইসলাম জবাবদিহি নিশ্চিত করতে চায়, আর জবাবদিহির শর্ত হল স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। যেমন ইসলামী আইনশাস্ত্রে:

- যদি সন্দেহ থাকে কোনো লোকের ব্যাপারে যে, এই ব্যক্তি দাস নাকি স্বাধীন? তবে তাকে স্বাধীনই গণ্য করা হবে।

- নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কিংবা বাধ্য হয়ে যদি কেউ দাসকে মুক্ত করে, বা 'মুক্তি' বুঝায় এমন শব্দ ব্যবহার করে (যাও, তুমি স্বাধীন, তুমি মুক্ত, তুমি আমার মাওলা ইত্যাদি স্পষ্ট শব্দ) যদিও মনিবের নিয়ত না থাকে, তবুও দাস মুক্ত হয়ে যাবে।

- নানান অপরাধ-ত্রুটির মার্জনা হিসেবে 'দাসমুক্তি'র দণ্ড। (সামনে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে)

দাসপ্রথার ক্ষেত্রেও ইসলামের উদ্দেশ্য মুক্তি— ইহলৌকিক ও একই সাথে পারলৌকিক মুক্তি। সুতরাং আমাদের মূল তর্ক হলো: ইসলামের পূর্বে হাজার বছর ধরে চলে আসা একটি প্রতিষ্ঠান এই দাসপ্রথা। এর একই সাথে কিছু উপকার রয়েছে (আর্থসামাজিক, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক নীতি ইত্যাদি সম্পর্কিত) এবং কিছু ক্ষতি রয়েছে (স্বাধীনতা খর্ব, মানবতার অপমান ইত্যাদি)। ইসলাম 'নিজের লক্ষ্য' পূরণের জন্য এর উপকারকে ব্যবহার করেছে, এর ক্ষতিকে বিলোপ করেছে বিধিবিধান দ্বারা। 'নিজ লক্ষ্য' হাসিল করে শেষ পর্যন্ত 'মুক্তি'কে নিশ্চিত করেছে আরও আইন-

---

[৪১] আল-হিদায়াহ ২/৪৪২
[৪২] Adwa' al-Bayaan (3/387)

কানুন-উৎসাহ দ্বারা।

আবার বলি:

১. ইসলাম 'নিজের লক্ষ্য' পূরণের জন্য

২. দাসপ্রথার উপযোগিতাকে (utility)-কে ব্যবহার করেছে

৩. দাসপ্রথার অপকারকে নিয়ন্ত্রণ বা বিলোপ করেছে

৪. মুক্তি নিশ্চিত করেছে

এই ৪টি পয়েন্ট ধরে আমাদের আলোচনা এগোবে। তাহলে সবার আগে 'কী সেই লক্ষ্য', যার জন্য এই অমানবিক প্রথা ইসলাম বহাল রেখেছে? চলুন তবে...

ইসলাম এর লক্ষ্য কী?

'ধর্ম' বা Religion বলতে ইউরোপ বিশেষ একটা জিনিস বোঝে বা বুঝায়। তাদের কাছে 'ধর্ম' মানে হল 'দুনিয়ার সাথে নিঃসম্পর্ক আধ্যাত্মিকতা', কেননা ধর্ম বলতে ইউরোপের অভিজ্ঞতা হল 'খৃষ্টবাদ'। সেন্ট পলের খৃষ্টবাদ (ইউরোপীয় খৃষ্টবাদ) ইউরোপের চোখে ধর্মের যে ছবি এঁকে দিয়েছে তা হল—

১.

দুনিয়া ও ধর্ম পৃথক জিনিস। একসাথে মেলানো যাবে না— 'Render unto GOD that is GOD's. And render unto Caeser that is Caeser's.[৪৩] কিংবা 'My kingdom is not of this world'. [৪৪] ধর্ম দুনিয়া নিয়ে মাথা ঘামাবে না। সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি এগুলো ধর্মের টপিক না। বর্তমান সেক্যুলারিজমের জন্মের পিছনে খৃষ্টবাদের দায় অনেক।

২.

দুনিয়ার কাজ আর ধর্মের কাজ আলাদা আলাদা। ধর্মের কাজ করতে হয় দুনিয়া থেকে বেরিয়ে। মঠবাসী সন্ন্যাসী হয়ে। আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন:

> " তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য 'রাহ্‌বানিয়্যাত' বা বৈরাগ্যবাদ-কে আবিষ্কার করেছিল। আমি তাদের উপর নির্ধারণ করিনি"। [৪৫]

খ্রিস্ট ইউরোপে হাজার হাজার মানুষ নাজাতের জন্য বৈরাগ্য গ্রহণ করেছে। William Edward Leckey তাঁর *History Of European Morals* গ্রন্থে জানাচ্ছেন। এক

[৪৩] Mark 12:17
[৪৪] John 18:36
[৪৫] সূরাহ আল হাদীদ ৫৭:২৭

একজন পাদ্রীর অধীনে কী পরিমাণ মানুষ বৈরাগ্যচর্চা করত একটু নমুনা দেখা যাক—

পাদ্রী	অধীনস্থ মঠবাসীর সংখ্যা
সেন্ট পেখোমিয়াস	৭,০০০
সেন্ট জেরোম	৫০,০০০
নিট্রিয়ার একজন এবোট	৫,০০০
সেন্ট পেরাপিয়ান	১০,০০০
মিসরের 'অক্সিরিনকাস' শহরের প্রায় সবাই। ২০,০০০ কুমারী নারী ও ১০,০০০ সন্ন্যাসী	
৪র্থ শতকের শেষদিকে মিসরে মঠবাসীদের সংখ্যা আর শহরবাসীদের সংখ্যা প্রায় সমান হয়ে আসে।	

৩.
ধর্মে কোনো যুক্তি নেই, যুক্তির স্থান নেই। মানবিক বুদ্ধিতে ধর্ম ধরে না। নিরেট বিশ্বাসে ধর্মের অস্তিত্ব।

৪.
ধর্ম মানে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক সাধনা। যারা ধর্মপরায়ণ হতে চান, ধর্মের সাধনা করে পরম আত্মিক সাফল্য পেতে চান, তাদের এই মহাযাত্রাপথে প্রধান বাধা হল—দুনিয়া। অপবিত্র পৃথিবীতে মানুষ পদস্খলিত হয়েছে আদমের আদিপাপের কারণে, যা লেপ্টে আছে প্রতিটি মানুষের গায়ে। সেই পাপ থেকে মুক্তি পেতে ও খৃষ্টের প্রিয়পাত্র হতে হলে এই নশ্বর ঘৃণ্য দুনিয়ার চাহিদা, ভোগকে অবদমন করতে হবে। দুনিয়ার সম্পর্ক, সম্পদ ত্যাগ করে মঠবাসী জীবন বেছে নিতে হবে, সারাজীবন যাজক-নানরা বিবাহ করতে পারবে না। পানি ব্যবহার ত্যাগ, লাগাতার উপবাস, নিজেকে নানাভাবে অকারণ কষ্ট দেয়া, মানবিক চাহিদাকে বঞ্চিত করা, আত্মীয়দের বঞ্চিত করে চার্চের নামে সম্পদ লিখে দেয়া ইত্যাদির মধ্যে স্বর্গ তালাশ করতে হবে। এগুলোই ধর্ম [৪৬]।

আরেকটু না বললে আসলে এই সময়ের ভয়াবহ আধ্যাত্মিকতা বুঝা যাবে না। কেন আজ ইউরোপ ধর্মকে শত্রু হিসেবে দেখে, সেটা বুঝতে হলে আমাদের এই ইতিহাসগুলো জানতে হবে। Leckey-র বিবরণ থেকে বৈরাগ্য চর্চার যে পদ্ধতিগুলো আমাদের সামনে আসে—

---

[৪৬] ড. আলিজা আলী ইজাতবেগোভিচ, *প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ও ইসলাম*, পৃ.৭০-৭৮
Uehlinger, Christoph. *"Concepts of Religion between Asia and Europe – Some Retrospective Preliminaries"* Asiatische Studien - Études Asiatiques, vol. 72, no. 1, 2018, pp. 137-145.

৩০ বছর যাবত দিনে ১টি রুটি খেয়ে কাটানো

গর্তে বসবাস ও প্রতিদিনের খাবার ৫টি ডুমুর

বছরে একবার চুল কাটা, ময়লা কাপড় পরা

ইচ্ছে করে মাছিকে দেহে কামড়ানোর সুযোগ দেয়া

শরীরে ৮০ পাউন্ড, ১৫০ পাউন্ড লোহা বহন করা সবসময়

৩ বছর শুকনো ইঁদারার ভিতর বসবাস

৪০ দিন ৪০ রাত কাঁটাঝোপে অবস্থান

৪০ বছর বিছানায় গা না লাগিয়ে ঘুমানো

এক সপ্তাহ যাবত কিচ্ছু না খাওয়া, না ঘুমোনো

পানি স্পর্শ না করা। পানি ছোঁয়া, পা ধোয়া, হাত ধোয়াকে পাপ মনে করা।

শরীরে এমনভাবে রশি বেঁধে রাখা যাতে শরীর কেটে পোকা ধরে যায়।

১ বছর যাবত দাঁড়িয়ে থাকা

পরিবারের সাথে আর কোনোদিন দেখা না করা

চোখ ঝাপসা না হওয়া অব্দি উপোস করা

আত্মা ও বস্তু পৃথকীকরণ আর অবতারবাদের গ্রীক দর্শন খৃষ্টধর্মকে ঈসা আ. এর শিক্ষা থেকে পুরোপুরি নিঃসম্পর্ক করে ফেলল। এই খৃষ্টবাদ হল তাদের চোখে 'পিওর ধর্ম'। ইসলাম ও ইহুদিবাদ 'পিওর ধর্ম' না। কেননা এদুটো কেবল বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক আলাপে সীমাবদ্ধ না, এতে পারিবারিক-সামাজিক-বিচারিক-রাষ্ট্রীয় কথাবার্তা আছে।

সেই অর্থে ইসলাম শুধু ধর্ম না, ইসলাম হলো 'দীন'। দীন এর সবচেয়ে কাছাকাছি অর্থ হলো 'সিস্টেম'।[৪৭] দীনের অর্থ যদি 'ধর্ম' করা হয়, তা হলে ইসলামের ৯০% জিনিস বুঝে আসে না, ধর্মে কেন এতকিছু থাকবে? বাথরুমের ভেতর আমি কি করছি এমন চরম পার্সোনাল লেভেলের অভ্যাস থেকে শুরু করে পারিবারিক আন্তঃসম্পর্ক, সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক, অর্থব্যবস্থা, বিচারিক সিস্টেম, প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—জীবনের ও দুনিয়ার সবক্ষেত্রে 'ভিন্ন নীতির' বুনিয়াদে একটা হলিস্টিক বা সামগ্রিক সিস্টেম হলো দীন। প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। রয়েছে

[৪৭] সহীহ বুখারিতে আমরা দেখতে পাই, দীন এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে সাহাবীদের থেকে 'মিনহাজ' এবং 'শিরাআ' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। আর মিনহাজ অর্থ হল: পদ্ধতি, সিস্টেম ইত্যাদি। [সহিহ বুখারি, পৃষ্ঠা ১১] —শারঈ সম্পাদক

স্বয়ং স্রষ্টাপ্রদত্ত সংজ্ঞা ও ভালোমন্দের মাপকাঠি। হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম— কিন্তু ইসলাম ধর্ম না। ইসলাম হলো দীন, জীবনবিধান, লাইফস্টাইল, ওয়ার্ল্ডভিউ, বিশ্বদর্শন। এর 'ভিন্নতা' কোথায়?

বর্তমান বিজয়ী বিশ্বদর্শনের নাম বস্তুবাদ। মানুষের চেতনা বা আত্মাকে অস্বীকার করে মানুষের দেহকেই সবকিছু ধরে নিয়ে যে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, তা-ই বস্তুবাদ। মানুষ-প্রকৃতি-বিশ্ব-জ্ঞান-মন ইত্যাদি সকল প্রশ্নের বস্তুবাদী সংজ্ঞাকে ভিত্তি ধরে নেয়া হয়েছে; কেননা বস্তু স্পষ্ট-সহজ-বোধগম্য। আর বস্তুর বাইরে সকল কিছুর অস্তিত্বকে হয় অস্বীকার করা হয়েছে, বা অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। মানুষ কী?— এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে না পারলে 'মানুষের সমস্যাগুলো কী কী' তা বুঝাও সম্ভব না, সমাধান কী হবে, তা-ও বাতলানো সম্ভব না। মানুষ কী?— এই প্রশ্নের উত্তর যদি অসম্পূর্ণ-আংশিক-একপেশে হয়, তাহলে যত সমাধানই আপনি খাড়া করবেন সবই হবে অপূর্ণ-আংশিক-একপেশে, যা কখনও কিছুটার সমাধান করবে, কখনও সমস্যাকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে।

আধুনিক সভ্যতার মূল সমস্যাটা মানুষের সংজ্ঞায়। বস্তুবাদী দার্শনিকগণ মানুষকে সংজ্ঞায়িত করেছেন 'স্বার্থপর ও বদ, যৌনতা ও অর্থতাড়িত উন্নত পশু' হিসেবে। ইউরোপীয় সমাজতাত্ত্বিকগণ বলছেন মানুষ হল 'স্বার্থপর ও বদ', ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন মানুষের আদি প্রবৃত্তি যা আর সকল কর্মকাণ্ডকে চালিত করে তা হল: যৌনতা কিংবা প্রতিযোগিতা কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা কিংবা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। ইউরোপীয় জীববিজ্ঞানীরা বলছেন 'মানুষ এক উন্নত পশু ছাড়া আর কিছুই না'। এই বস্তুবাদী সংজ্ঞার উপর রাষ্ট্র দাঁড় করালে তা হবে 'পশুদেরই রাষ্ট্র', সমাজের সংজ্ঞা দিলে তা হবে 'যৌনস্বাধীন স্বার্থপরের সমাজ', বাজারের সংজ্ঞা দিলে তা হবে 'দয়ামায়াহীন মুনাফালোভীদের বাজার'। বস্তুবাদ যে আত্মাহীন মানুষের সংজ্ঞা দেয়, তার থেকে বেরোনো আধ্যাত্মিকতাহীন পরিবার, আধ্যাত্মিকতাহীন সমাজ, আধ্যাত্মিকতাহীন রাষ্ট্র, আধ্যাত্মিকতাহীন বাজারে সমস্যার অন্ত নেই। কেননা মানুষের একটা উপাদানকেই গোনায় ধরা হয়নি— মানুষের আত্মা বা চেতনা বা ভাব।

অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট 'কিছু'-কে থিওরি ধরে পুরোটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেউ শুধু 'কাম-প্রবৃত্তি'-কে ধরে সবকিছুকে, আবার কেউ 'প্রভাব-প্রতিষ্ঠা'-কে ধরে, কেউ 'উৎপাদন'-কে ধরে পুরোটা ব্যাখ্যা করেছেন। কারো ব্যাখ্যা যুক্তিকে স্যাটিসফাই করে, কারোটা বুদ্ধিকে, কারও ব্যাখ্যা প্রবৃত্তিকে, আবার কারওটা ভিতরের সুকুমারবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করে। কিন্তু কেউ এমন কোনো আদর্শ ধারণা আনতে পারেননি, যা একই সাথে
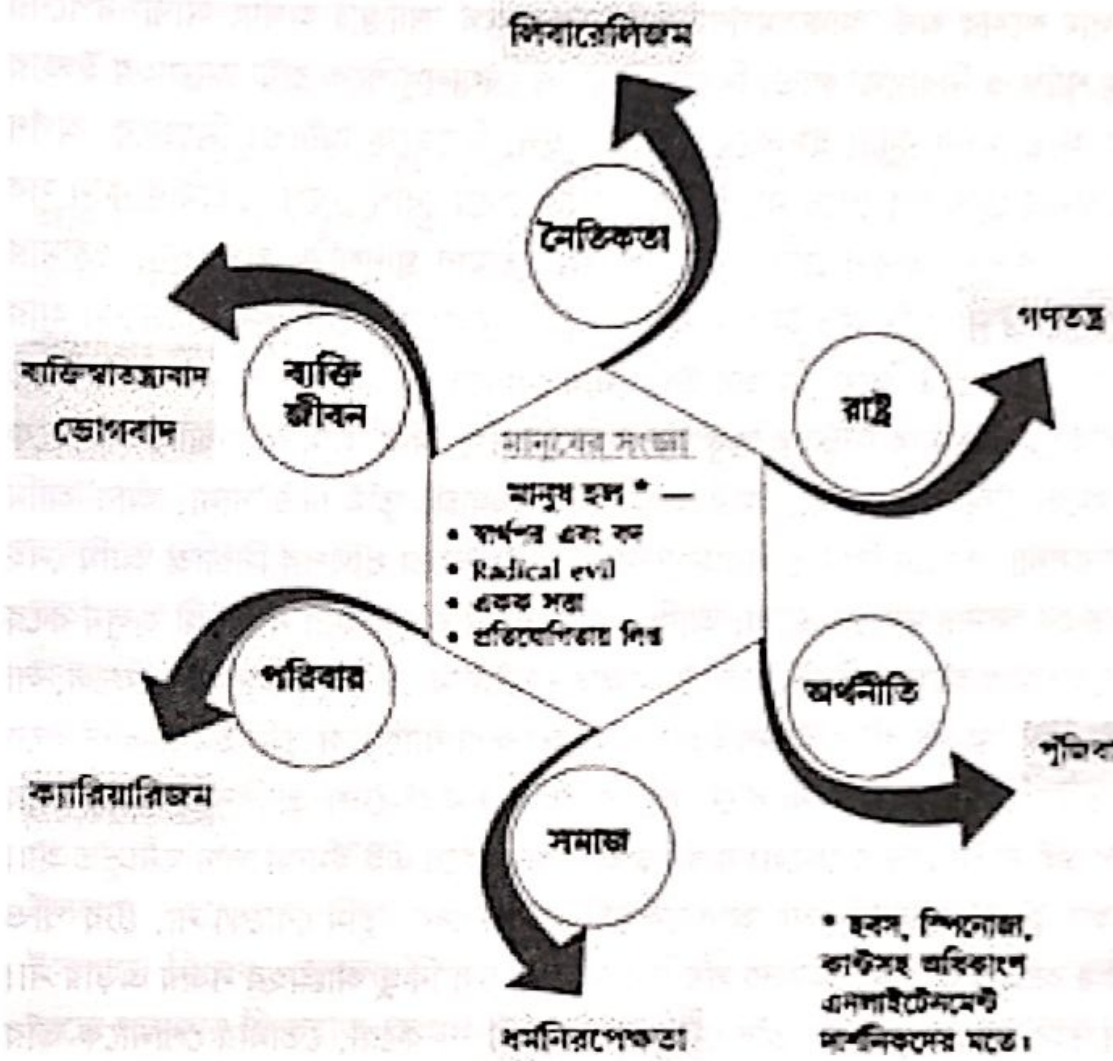
মানুষের সংজ্ঞা একেকটা ক্ষেত্রে একেকটা মতবাদের জন্ম দিয়েছে

মানুষের বুদ্ধি-যুক্তি এবং প্রবৃত্তি ও সুকুমারবৃত্তিকে স্যাটিসফাই করতে পারে। যে ধারণাটা ইসলাম দেয়। বস্তু-অবস্তু, দেহ-আত্মা, ফিতরাত-নৈতিকতা, সমষ্টি-ব্যষ্টি, বায়োলজি-সাইকোলজি, সোশিওবায়োলজি-সোশ্যাল সাইকোলজি-ইকোলজি সকল বিষয় ব্যালেন্স করে সর্বাঙ্গসুন্দর, সর্বোচ্চ কল্যাণদাত্রী জীবনপথ 'সীরাতুল মুস্তাকীম' দেয়া হয়েছে। এজন্যই ইসলাম ফিতরাতের দীন, সহজাত স্বভাবধর্ম। মানুষের বায়োলজি-সাইকোলজির সাথে যা 'যায়' (compatible)। ইসলাম হল সেই জীবনপদ্ধতি বা জীবনদর্শন (দীন), যেহেতু এটা খোদ স্রষ্টা দিয়েছেন। 'বানালেনই যিনি, তিনিই কি জানবেন না?' যে, মানুষকে কোন উপাদানে বানিয়েছি। এজন্য ইসলামের প্রতিটি বিধান এই সবকিছুকে স্যাটিসফাই করে, মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করে, ইহকাল-পরকালে কল্যাণ নিশ্চিত করে। ইসলামের শাশ্বত আহ্বান 'হাইয়া আলাল ফালাহ'— কল্যাণের জন্য এসো।

ইসলাম শব্দের অর্থ 'আত্মসমর্পণ', ধাতুমূলের অর্থ 'শান্তি'। অর্থাৎ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ। নিজের ইচ্ছা ও খেয়ালখুশিকে স্রষ্টা আল্লাহর ইচ্ছার সামনে আত্মসমর্পণ করা। ইসলামের আহ্বান হল: নিজেকে মিটাও। নিজেকে অর্পণ কর। তোমার চোখ সব দেখে না, ঈগল তোমার চেয়ে বেশি দেখে। তোমার কান সব শোনে না, বাদুড় তোমার চেয়ে বেশি শোনে। তোমার ঘ্রাণশক্তি প্রখর না, তোমার জানা পারফেক্ট না। খুলিকাল ইনসানু দ্বয়ীফা। তুমি দুর্বল। তুমি দেখ শুধু নিজেকে। আর এই নিজেকে দেখতে গিয়ে, নিজের উপাসনার বেদীতে তুমি কুণ্ঠিত হও না বলি দিতে কোনোকিছুই। তোমার সিদ্ধান্ত শুধু নিজেকে ঘিরে , আর আমার সিদ্ধান্ত সবাইকে কেন্দ্র করে। তুমি চাও সমতা, আর আমি দেই সুষমতা। তুমি চাও সাম্য, আর আমি দেই ভারসাম্য। আমার সিদ্ধান্ত সর্বাঙ্গসুন্দর, তোমার মতো স্বার্থপর সিদ্ধান্ত আমি নেই না। অতএব আমার দাসত্বে এসো, আমি কারও ওপর জুলুম করি না। তুমি জুলুম করে ফেলো, তোমার আত্মকেন্দ্রিক-সিদ্ধান্ত আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে বিশৃংখলা করে ফেলে, লা তুফসিদু ফীল আরদ্বি বা'দা ইসলাহিহা। আল্লাহর করা ব্যালেন্সে তুমি ইমব্যালান্স করে ফেলো। নিজের উপর জুলুম করে ফেলো, পরিবার-সমাজ-দেশ-প্রাণিকুল সবার উপর তোমার এই জুলুম প্রভাব ফেলে। কখনও অল্প অল্প করে এই ইমব্যালেন্স ঘনীভূত হয়। বেশি হয়ে গেলে একটা সমস্যা আকারে সেটা দেখা দেয়। তুমি বোঝো না, টের পাও না। কিন্তু আল্লাহ জানেন, আল্লাহ সব দেখেন, কোনো কিছু আল্লাহর নজর এড়ায় না। এজন্য তুমি নিজের দেখাকে তাঁর দেখার কাছে সমর্পণ করো, তোমার শোনাকে তাঁর শোনার কাছে মিটিয়ে দাও, তোমার জ্ঞানকে আল্লাহর জ্ঞানের কাছে বিলীন করো। কারণ, তিনি যা জানেন তা তুমি জানো না। তাই স্বাধীনতায় তোমার শান্তি নেই, দাসত্বেই তোমার চিরসুখ।

বুঝে- না বুঝে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কেউ যদি এই সিস্টেম অনুযায়ী জীবনকে পরিচালনা করে এবং 'যারা আল্লাহর সীমালংঘনের নির্দেশ দিচ্ছে আমাদের, তাদের সবার পথনির্দেশ বাদ দিয়ে, কেউ যদি আল্লাহর পথনির্দেশ আঁকড়ে ধরে, সে এমন রশি ধরল যা ছিন্ন হবার নয়'। [৪৮] আল্লাহ জানাচ্ছেন, সে পাবে—

> হায়াতুন তাইয়েবা মানে পবিত্র জীবন [সূরা নাহল, ৯৭],
>
> ক্বলবুন সালীম বা সুস্থ প্রশান্ত হৃদয়-মন, [সূরা শুআরা, ৮৯]
>
> নাফসুল মুত্বমাইন্নাহ বা তৃপ্ত অন্তর, [সূরা ফজর, ২৭-৩০]

---

[৪৮] সূরা বাকারা ২ : ২৫৬ অবলম্বনে। 'দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাসস্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়।'

রিযকুন কারীম মানে প্রশস্ত অনুগ্রহ এবং [সূরা আহযাব, ৩১]

মৃত্যু-পরবর্তী নিঃসীম জীবনে রিদওয়ান, চিরসন্তুষ্টি, চিরমুক্তি। [সূরা তাওবা ৭২]

অর্থাৎ পৃথিবীর এই জীবন ও পৃথিবীর পরের জীবনে সে নিশ্চিন্ত-নির্ভাবনা-ফুরফুরে। আর যদি না গ্রহণ করে, নিজের খেয়ালখুশি কিংবা বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ করে, তবে দুনিয়া ও পরকাল উভয় জীবনে সে সংকীর্ণ-হতাশ-দুঃখভরা-যন্ত্রণাময় জীবন কাটাবে। এই হল দীন ইসলামের বার্তা পুরো মানবজাতির কাছে।

এবং ইসলামের এই দীন, এই সিস্টেম প্রচারমুখী। ইসলাম তার প্রতিটি বিধানের দ্বারা মানুষকে আকর্ষণ করে, মানুষের মাঝে ছড়িয়ে যায়। ইসলামের মৌলিক লক্ষ্য মানুষকে দুনিয়াতে জুলুম থেকে রক্ষা এবং আখিরাতে দোযখ থেকে রক্ষা। এর মধ্যে সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনে অনন্ত শাস্তি থেকে রক্ষা করা। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী দুঃখকষ্টের বদলে হলেও পরকালের অসীমগুণ তীব্র যন্ত্রণা থেকে বাঁচানোটাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। এজন্য ইসলাম চায়, একজন মানুষ যে কোনো প্রকারেই হোক, যেন ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে। এজন্য যত উপায় সৃষ্টি করা দরকার সে করে, যতভাবে ইসলামের বার্তা পৌঁছানো যায় সে পৌঁছায়, যতভাবে মানুষের ইসলাম গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব সে করে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জোর করা ইসলামে নিষেধ, সেজন্য ইসলাম পরিবেশ তৈরি করে। এমন পরিবেশ তৈরি করে, যাতে মানুষের ফিতরাত (সহজাত মানসিক প্রক্রিয়া) বিকশিত হয়, সকল আরোপিত বাধা সরে যায় এবং আল্লাহকে-সত্যকে সে চিনতে পারে। এজন্য প্রতিটি হুকুম প্রতিটি বিধানের মৌলিক লক্ষ্য থাকে দাওয়াহ এবং পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করা। রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, যুদ্ধ, জিযিয়া, যুদ্ধবন্দিকে দাস বানানো— এসবকিছুর অন্যতম লক্ষ্যই হল ইসলামকে ছড়িয়ে দেয়ার পরিবেশ তৈরি করা। ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হবে যদি আমরা ইসলামে যুদ্ধের ধারণাটা একটু দেখে নিই। সামনে যুদ্ধ-মনস্তত্ব আলোচনার সময়ও এই আলোচনা দরকার হবে আমাদের।

ইসলাম ও যুদ্ধ

যুদ্ধের অনিবার্যতা

প্রাণিজগতে যুদ্ধ একটা ফিতরাতী বা সহজাত বিষয়— আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ, দুটোই। Abraham Maslow-র হায়ারার্কি অব নীড-এও প্রভাব বৃদ্ধি, আত্মরক্ষা বিষয়গুলো উপরের দিকে এসেছে। এবং কী আশ্চর্যভাবে ফিতরাতের দীন ইসলাম 'যুদ্ধ'-এর মত একটা ফিতরাতী বিষয়কে যুক্তি-বুদ্ধি-প্রবৃত্তি-সুকুমারবৃত্তি সবদিকেই পরিপূর্ণতা দিয়েছে, তা বিস্ময়কর। যা ইউরোপের যুদ্ধের চিত্র থেকে এতোটাই ভিন্ন, চোখে কীভাবে না পড়ে, সেটা আরও বিস্ময়কর।

যুদ্ধ যে ফিতরাত, এর উদাহরণ দিতে গেলে স্বতন্ত্র বই লাগবে। মানবেতিহাসে এমন কোন মোড় নেই, যা যুদ্ধ ছাড়া ঘুরেছে। এমন কোনো পট নেই যা, যুদ্ধ ছাড়া পরিবর্তন হয়েছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে 'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন' যেমন এসেছে, ইহুদি জাতির ইতিহাসে ও গ্রন্থে বার বার যুদ্ধের বিধান-ইতিহাস এসেছে। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-তে মার্ক্সবাদ প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট কর্মপদ্ধতি বলা আছে— শ্রমিকের রাজনৈতিক আধিপত্য, স্বৈরাচারী আক্রমণ, বিপ্লব, বিদ্রোহ। আর ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের উত্থান-লালন-আরোপ সবকিছুই যুদ্ধের মাধ্যমে। যে পুঁজিবাদের আওতার বাইরে চলে যাবার ফন্দি করবে, তার উপরেই যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হবে— কখনো সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে, কখনো আরব বসন্তের নামে, কখনও গণবিধ্বংসী অস্ত্রের নামে। এজন্য যুদ্ধ ছিল, আছে, থাকবে।

যুদ্ধের ব্যাপারে ইসলাম আশ্চর্য এক দর্শন দিয়েছে। পার্থিব কোনো লক্ষ্যে নয়, ইসলামে দাওয়াহ (আহ্বান)-এর অংশ হল যুদ্ধ। একারণে কেউ যখন বলে 'ইসলাম কেবল তরবারির দ্বারা ছড়িয়েছে', এটা যেমন সত্য নয়। কেউ যদি বলে 'ইসলাম ছড়াতে তরবারির কোনো ভূমিকাই নেই', সেটাও সত্য নয়।

ইসলামের যুদ্ধ-দর্শন

মানবেতিহাসের ভয়াবহতম যুদ্ধগুলো ইউরোপ-আমেরিকা করেছে— দুটো বিশ্বযুদ্ধ, শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ থেকে নিয়ে বিগত ৩০ বছর জুড়ে সন্ত্রাসবিরোধী অসম যুদ্ধ, স্নায়ুযুদ্ধ-কালীন আগ্রাসন (ভিয়েতনাম যুদ্ধ, রুশ আগ্রাসন ইত্যাদি)। স্রেফ প্রতিহিংসা, রাজ্যের লোভ, নারী, আন্তর্জাতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা এসবের জন্য।

ইসলামে 'জিহাদ' একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিভাষা, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন দর্শন ফলো করে। ইসলামে যুদ্ধের ধারণা হল: যুদ্ধ ইটসেলফ ভালো জিনিস নয়। যুদ্ধ সত্তাগতভাবে 'ফ্যাসাদ সৃষ্টি'। একে ফরয করা হয়েছে শুধু আল্লাহর দীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বান্দাদের দুষ্কৃতি রোধ করার জন্য [৪৯]। এবং এটাই ইসলামে যুদ্ধের লক্ষ্য। না সাম্রাজ্য বিস্তার, না লুট, না নারী, না পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য। কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে কেউ জিহাদে অংশ নিলে, তা ব্যর্থ বলে পরিগণিত হবে [৫০]।

রিবঈ ইবনে আমের রা. যে উত্তর দিয়েছিলেন পারস্য সেনাপতি রুস্তমকে, তাতে ইসলামের পরিপূর্ণ যুদ্ধ-দর্শন উঠে এসেছে। সুপারপাওয়ার Persian Empire-এর সেনাপতি রুস্তম জিগেস করলো মুসলিম বাহিনীর সৈন্য রিবঈ বিন আমের রা. কে: তোমরা আমাদের দেশে কেন এসেছো? ভেবেছিল, গরীব বেদুঈন এরা। অর্থসম্পদের লোভে আক্রমণ করেছে আমাদের। কিছু মালপানি খরচা করি, চলে যাক। কী দরকার খামোখা যুদ্ধ করার। রিবঈ রা. জবাব দিলেন: [৫১]

> “ ১. দুনিয়ার **সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার** দিকে
>
> ২. সমস্ত **বাতিল ধর্মের জুলুম থেকে দীন ইসলামের ইনসাফের** দিকে
>
> ৩. মানুষকে **'সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার দাসত্বে** নিয়ে আসতে' আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন।

কথাটা একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। 'স্বাধীনতা' শব্দটা দিয়ে পশ্চিম যা বোঝায়, তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কেউ না কেউ আমাদের কন্ট্রোল করে। সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে। সবখানেই আমরা কাউকে না কাউকে মানতে বাধ্য। **মানব-রচিত, মানুষের বানানো কোনো-না-কোনো সিস্টেমকে মেনে চলছি আমরা সবাই। দাসত্ব করছি মানুষের।** কখনও অর্থের, কখনও চাকরির, কখনও লৌকিকতার।

---

[৪৯] আল-হিদায়া, ই.ফা. ২/৪২৯
[৫০] সহীহ বুখারি ১২৩, সহীহ মুসলিম ১৯০৪
[৫১] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া ৭/৩৯

কখনও খ্যাতি-ডিগ্রি-মিডিয়ার। কখনও আধুনিকতা, খেলাধুলা, শিল্প-সংস্কৃতি, পপ-কালচারের, ফ্যাশন-ট্রেন্ডের কখনো ক্যারিয়ারের। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা এভাবেই নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের দেহ-মন। আমাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে, আমাদেরকে দিয়ে তাদের পণ্য কিনিয়ে নিচ্ছে, গরিব হচ্ছে আরও গরিব, ধনী হচ্ছে আরও ধনী।[৫২] এবং মানবরচিত ব্যবস্থার দাসত্বে আবশ্যিকভাবে কেউ জালেম হচ্ছে, কেউ মাজলুম। কেননা প্রত্যেক মানবরচিত মতবাদই অপূর্ণাঙ্গ। মানুষের মগজ থেকে আসা, মানুষের বানানো যে-কোনো সিস্টেমে একপক্ষ হয় জালেম, আরেকপক্ষ হয় মজলুম। কারণ মানুষ আত্মকেন্দ্রিক, শুধু নিজের কথা ভাবে। 'নিজেকে খুশি করা', এই 'নিজ'-কে নিয়ন্ত্রণ না করলে সে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়।

এই পুঁজিবাদী পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থার কারণে বিক্রেতার কাছে ক্রেতা, সেবাদাতার কাছে ক্লায়েন্ট, অপরাধীর কাছে ভিকটিম, আসামির কাছে বাদী, বাদীর কাছে আসামি, রাষ্ট্রের কাছে নাগরিক, প্রথম বিশ্বের কাছে তৃতীয় বিশ্ব, ক্ষমতাবানের কাছে দুর্বল মজলুম হচ্ছে। জালেম নিজেও নিজের কাছে মজলুম হচ্ছে, নিজেই নিজের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে দাসত্বের কারাগারে।

সারকথা হল, মানবরচিত সিস্টেমের দাসত্ব (ধর্ম/মতবাদ) মানুষকে জুলুম করে, এমন সিস্টেম তৈরি করে, যাতে করে কেউ জালেম হয়, কেউ মজলুম হয়। জালেম নিজেও কোথাও মজলুম হয়। সকলেরই জীবন হয়ে পড়ে সংকীর্ণ, দমবন্ধ জীবন। সেই কারাগার থেকে আল্লাহর সিস্টেম/ দীনে তাদেরকে এনে ইনসাফের স্বাদ দেয়া, প্রশস্ত ইহজীবনের খোঁজ দেয়া এবং পরজীবনে মুক্তির সন্ধান দেয়া। এটাই ইসলামে যুদ্ধ/ ক্বিতাল/ জিহাদ-এর দর্শন। নতুন নতুন এলাকায় আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করে, সেখানে মানুষকে (জালেম-মজলুম দুপক্ষকেই) ন্যায় ও মুক্তির দিকে আনা। এজন্যই রিবঈ রা. জবাব দিয়েছেন: সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে... বাতিল ধর্মের জুলুম থেকে দীন ইসলামের ইনসাফের দিকে... 'সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার দাসত্বে নিয়ে আসতে' আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। ইসলাম সুষমার ধর্ম, ভারসাম্যের লাইফস্টাইল, ন্যায়-ইনসাফের ওয়ার্ল্ডভিউ।

➡ মায়ের কোল থেকে কেড়ে কেবলমাত্র দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রতি বছর ২০

[৫২] পৃথিবীর ১% মানুষেরর হাতে পুঞ্জীভূত পৃথিবীর ৫০% সম্পদ।
Half of world's wealth now in hands of 1% of population, The Guardian (Oct 2015)
Oxfam says wealth of richest 1% equal to other 99%, BBC (Jan 2016)
তুলনা করুন কুরআনের আয়াত : "সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়"।
[সূরা হাশর : ৭]

লক্ষ শিশু পাচার [৫৩] ঠেকাতে ইসলাম দরকার,

- ইউরোপে লক্ষ লক্ষ পতিতা অনিচ্ছায় ঐ চার দেওয়ালে গুমরে মরছে, তাদের বাঁচাতে ইসলাম দরকার।
- সারা দুনিয়ায় মাদকের থাবায় ৩১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ ধুঁকছে, [৫৪] তাদের বাঁচানোর জন্য ইসলাম দরকার।
- সারা পৃথিবীতে সাড়ে ৮১ কোটি মানুষ না খেয়ে আছে, [৫৫] তাদের পেট পুরে একবেলা খাওয়াতে ইসলাম দরকার।
- ভারতে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৬ লাখ মেয়েশিশু দুনিয়ার আলো না দেখেই চলে যায়, [৫৬] এই হাজারও ভ্রূণকে আলো দেখাতে ইসলাম দরকার।
- অস্ত্রব্যবসায়ীদের মুনাফা পৌঁছাতে পৃথিবীর কোণায় কোণায় গৃহযুদ্ধ হচ্ছে, ৬ কোটি ৯০ লাখ শরনার্থীকে [৫৭] নিজ ঘরে ফেরাতে ইসলাম দরকার।
- পৃথিবীতে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে ১ জন, বছরে ৮ লাখ মানুষ মানুষ হতাশায় আত্মহত্যা করে, [৫৮] এদের হতাশা থেকে উদ্ধার করতে ইসলাম দরকার।
- তাজা থাকতে ছিলা সহজ বলে চীনে 'কুকুর খাওয়া উৎসবে' ১০-১৫ হাজার কুকুর জীবন্ত ছিলে ফেলা হয়, রোস্ট করা হয় জ্যান্ত [৫৯]। এই অবলা প্রাণীগুলোর জন্যও ইসলাম দরকার।

এজন্য দরকার ইসলামকে ছড়িয়ে দেয়া যেন ইসলাম সুরক্ষা বলয় হয়ে রক্ষাকবজের মত মানব জাতিকে রক্ষা করতে পারে এসকল জুলুম হতে। এজন্য শরী'আতে বিধান দেয়া হয়েছে الإسلامُ يعلو ولا يُعلَى। অর্থাৎ 'ইসলাম উপরে থাকবে, অধস্তন হবে না'।

---

[৫৩] Child Sex Trafficking In Latin America, United Nations Human Rights Council

[৫৪] United Nations Office on Drugs and Crime এর ২০১৫ সালের হিসাব, WORLD DRUG REPORT 2017

[৫৫] Bukar Tijani, FAO Assistant Director-General and Regional Representative for Africa-র বরাতে The number of people suffering from chronic undernourishment in sub-Saharan Africa has increased, FAO

[৫৬] গত দশ বছরে ৬০ লাখ মেয়ে ভ্রূণ গর্ভপাত করা হয়েছে শুধু ইন্ডিয়ায়।
Sarah Boseley (24 May 2011), Families in India increasingly aborting girl babies, study shows, Guardian

[৫৭] UN High Commissioner For Refugees এর সাইটে How many refugees are there around the world?

[৫৮] Suicide in the world : Global Health Estimates, World Health Organization 2019

[৫৯] https://www.youtube.com/watch?v=kEpiuASwxPM
https://www.youtube.com/watch?v=eMN9uLeq0ZY

[৬০] অর্থাৎ, ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই ইসলামকে বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দেওয়া। সকল জুলুম-অত্যাচার আর প্রতারণা থেকে মানবতার মুক্তির জন্য, আল্লাহ পাঠিয়েছেন এই সমাধানকে। এজন্য ইসলামি রাষ্ট্র সব সময় কুফফারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকবে। ইসলামি রাষ্ট্রের খলীফার জন্য ওয়াজিব বছরে একবার নতুন ভূখণ্ড আক্রমণ করা।[৬১] নতুন এলাকায় ইসলামের সমাধান পৌঁছে দেওয়া। সমাধানের আওতায় আরও নতুন নতুন মানুষকে নিয়ে আসার জন্য ইসলামে জিহাদের বিধান।

পৃথিবীর কোনো ওয়ার্ল্ডভিউ, কোনো জীবনব্যবস্থা তরবারি ছাড়া ছড়ায়নি।

- ফরাসি বিপ্লবে রাজতন্ত্র হটিয়ে গণতন্ত্র আনতে তরবারি লেগেছে।
- রুশ বিপ্লবে রাজতন্ত্র সরিয়ে সমাজতন্ত্র আনতে তরবারি লেগেছে, সমাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে তরবারি লেগেছে।
- মাও সে তুং-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবে গণতন্ত্র সরিয়ে সমাজতন্ত্র আনতে তরবারি লেগেছে, টিকিয়ে রাখতে লেগেছে।[৬২]
- লিবিয়া-ইরাকে স্বৈরতন্ত্র সরিয়ে গণতন্ত্র দিতে তরবারি লেগেছে।
- আফগানিস্তানে গণতন্ত্র সরিয়ে ইসলাম আনতে তরবারি লেগেছে, আবার ইসলামি ইমারাত সরিয়ে গণতন্ত্র দিতেও তরবারি লেগেছে।

একটা অর্থব্যবস্থা-শাসন-বিচার বদলাতে যাবেন, আর মসৃণভাবে বদলে যাবে, এটার নজির নেই ইতিহাসে। এখন পাঠক ভেবে দেখুন কারা জুলুমের উপর টিকে আছে? কারা ১% হয়ে অর্ধেক সম্পদের পাহাড়ের উপর অধিষ্ঠিত? ইনসাফ প্রতিষ্ঠা পেলে কাদের সাম্রাজ্য ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে? ইসলামের এই প্রবল রূপ নিয়ে তাদেরই এত জল্পনা-কল্পনা, এত ভয়। সমাধানকে কে ভয় পায় বলেন তো? যে সমস্যা চায়, সমস্যা জিইয়ে রেখে ফায়দা লুটতে চায়। এজন্য প্রত্যেক জালেম, প্রত্যেক লোভী, প্রত্যেক অপরাধী ভয় পায় একে, তাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। তাই তারা একে বলে 'সন্ত্রাস'। আফসোস, অনেক মুসলিমও কাফিরদের সুরে একে 'সন্ত্রাস' মনে করে।

---

[৬০] ইমাম দারাকুতনী (রাহ), আস সুনান, হা: ৩৬২০; ইমাম ইবন হাজার আসকালানীর (রাহ) মতে হাসান- ফাতহুল বারী: ৩/২২০

[৬১] মাজমু' মুহাযযাব ২৪/১৬০, মুকনা ১/৫৬৪-৬৫

[৬২] necrometrics.com সাইটটা দেখতে পারেন। বিভিন্ন ইতিহাসবিদের রেফারেন্স আছে।

ইসলামে যুদ্ধের বিধান

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

> “ তোমাদের উপর যুদ্ধ (কিতাল) ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয়, অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুত : আল্লাহই জানেন (কোনটি কল্যাণকর), তোমরা জান না। [সুরা বাকারা ২:২১৬]

এই আয়াতের দ্বারা যুদ্ধকে আমাদের শরীয়াতে 'ফরয' করা হয়েছে। তবে ফরযের রকমভেদ রয়েছে। যুদ্ধ বা জিহাদ দুই প্রকার: আক্রমণাত্মক এবং রক্ষণাত্মক। আক্রমণাত্মক জিহাদ ফরযে কিফায়া (সামষ্টিক ফরয) এবং রক্ষণাত্মক জিহাদ ফরযে আইন (ব্যক্তিগত ফরয)। এই আয়াতের যেকোনো বিস্তারিত তাফসীরেই আপনি পাবেন এই কথাগুলো: মুসলিম ভূখণ্ড এক বিঘত পরিমাণও কাফিরদের অধীনে চলে গেলে ঐ অঞ্চলের মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে আইন, বাকি মুসলিমদের জন্য ফরযে কিফায়া। তারা শত্রুর বিরুদ্ধে অপারগ হলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য ফরজে আইন, বাকিদের জন্য কিফায়া। এভাবে ক্রমান্বয়ে পাশের এলাকা, তারা না পারলে তার পাশের এলাকা, এভাবে ফরযে আইনের হুকুম বর্তাবে। এটা গেল রক্ষণাত্মক জিহাদ। কোন আলিম বলে দিক বা না দিক, কেউ যাক বা না যাক, প্রত্যেকের উপর এই হুকুম। (মাআরেফুল কুরআন, সূরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

আর নতুন এলাকা বিজয়ের জন্য আক্রমণাত্মক জিহাদ ফরযে কিফায়া। বছরে একবার বা দু’বার খলিফা যদি কাফেরদের রাষ্ট্রে মুজাহিদ বাহিনী পাঠান, তাহলে উম্মতের পক্ষ থেকে ফরয আদায় হয়ে যাবে। যদি একবারও না পাঠান তাহলে সবাই গুনাহগার হবে।

হযরত মিকদাদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

> “ দুনিয়ার বুকে এমন কোন কাঁচা বা পাকা ঘর থাকবে না, যেখানে ইসলামের প্রবেশ ঘটবে না। আল্লাহ যাদের সম্মানিত করবেন তারা ইসলাম কবুল করবে, আর যাদের লাঞ্ছিত করবেন তারা ইসলাম গ্রহণে বিমুখ থাকবে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজায় পরিণত হবে।[৬৩]

[৬৩] মুসনাদে আহমাদ ৬/৪, হাদিস নং ২৩৮৬৫; ইবনে হিব্বান ১৫/৯১, হাদিস নং ৬৬৯৯

ইমাম কুদূরী রহ. বলেন:

“ জিহাদ হল ফরজে কিফায়া (আক্রমণাত্মক জিহাদ)। একদল লোক পালন করলে অবশিষ্টদের থেকে ফরজ রহিত হয়ে যায়। কিন্তু কেউ তা পালন না করলে সকল মানুষ তা তরক করার কারণে গুনাহগার হবে, কেননা সকলের উপরেই তা ওয়াজিব। যেহেতু আয়াত ও হাদিস নিঃশর্ত ও সাধারণ, সেহেতু কাফিররা সূচনা না করলেও (প্রয়োজন হওয়া মাত্র) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরজ। অপ্রাপ্তবয়স্ক, দাস, স্ত্রীলোক, অন্ধ, প্রতিবন্ধী, কর্তিত অঙ্গ ব্যক্তির উপর ফরজ নয়। কিন্তু শত্রুপক্ষ যদি কোন শহরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন সকলের উপর প্রতিরোধ ওয়াজিব হয়ে যাবে (রক্ষণাত্মক জিহাদ)। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং দাস মনিবের অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে পড়বে। কেননা তা ফরজে আইন হয়ে পড়েছে আর ফরজে আইনের মোকাবিলায় দাসত্ব ও বিবাহ বন্ধন বিবেচিত হবে না। যেমন সালাত ও সিয়ামের ক্ষেত্রে। [৬৪]

‘যুদ্ধ’ আমাদের শরীয়া, আমাদের ইতিহাস। ‘যুদ্ধ’ আমাদের আকীদাও বটে। আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনটাই এতো বেশি যুদ্ধ-বহুল। যে সাহাবী-তাবেঈরা নবীজীর সীরাহ বা জীবনচরিতকে ‘মাগাযী’ (যুদ্ধগাঁথা) বলতেন। বড় বড় সব হাদিসের কিতাবে ‘কিতাবুল মাগাযী’ শিরোনামে সীরাহ-কেন্দ্রিক হাদিসগুলো স্থান পেয়েছে। আজ কারা একে ‘জঙ্গিবাদ’ নাম দিয়ে ঘৃণা করতে বলে? কারা ‘জিহাদ’-এর সুস্পষ্ট পারিভাষিক ব্যবহারিক অর্থকে আভিধানিক অর্থের নামে অস্পষ্ট করে তোলে? বাদ দেন জিহাদ, সূরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ (তোমাদের উপর 'যুদ্ধ' ফরয করা হলো)। আর শব্দ নিয়ে খেলার সুযোগ নেই। বলার সুযোগ নেই এর মানে দাওয়াত বা অন্যান্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা। আমল করতে পারি আর না পারি, কুরআনের আয়াতের উপর ঈমান তো রাখতেই হবে। এজন্যই বললাম, যুদ্ধ আমাদের আকীদারও অংশ।

কারা আমাদের আকীদা-শরীয়া-ইতিহাসকে ভুলে যেতে বলে? যারা মানবরচিত পাশ্চাত্য সভ্যতার (পুঁজিবাদী অর্থনীতি + ভোগবাদী জীবনধারা + হিউম্যানিজম ধর্ম + বস্তুবাদী দর্শন + ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ-রাষ্ট্র) মুখপাত্র, তারা। যে ১% মানুষ কুক্ষিগত করেছে ৫০% সম্পদ, তারা। যারা আধুনিকতার নামে নারী-পুরুষ-শিশুদেরকে বায়োলজি-বিরুদ্ধ, সাইকোলজির বিপরীত কৃত্রিম জীবনব্যবস্থায় জিম্মি করে রেখেছে, তারা ও তাদের এজেন্টরা নিজেদের পথের কাঁটা দূর করতে ইসলামের ‘যুদ্ধ’-কে ভিলেন হিসেবে প্রচার করেছে। এর প্রমাণ হল, ফিলিস্তিন-কাশ্মীর-আফগানিস্তানের

[৬৪] আল-হিদায়া ই.ফা. ২/৪২৯-৪৩০

'তাদেরই গড়া মানদণ্ডে ন্যায়সংগত' প্রতিরোধ সংগ্রামকেও নিজ স্বার্থে 'জঙ্গিবাদ' নামে প্রচার করেছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়।

এজন্য 'যুদ্ধ'-এর ব্যাপারে আমাদের আকীদা-বিধান-ইতিহাস চর্চা বাড়াতে হবে। কেননা 'ইসলামে যুদ্ধ' ধারণার অপব্যবহারও থেমে নেই। এর অপব্যবহার মূলত জিহাদ এর ব্যাপারে সালাফগণের বুঝ গ্রহণ না করে, নিত্যনতুন মনগড়া অপব্যাখ্যা করার কারণে হতে পারে। আবার একে দানবরূপে দেখানোর চাল হিসেবে পুঁজিবাদী প্রভুরাই হয়তো এর অপব্যবহার করাচ্ছে, বা সামনে আনছে, এটাও অমূলক নয়। যাতে খোদ মুসলিমরাই একে ঘৃণা করতে শুরু করে। সভ্যতার এই সংঘাতে মুসলিমরা যেন নিজেদের স্বকীয়তাকে ডিফেন্ড করতে না পারে। এজন্য 'কিতাল'-এর বিধি সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলিমের জানা জরুরি দু'টি কারণে—

এক. সে যেন ফরজ বিধানকে ভুল করে ঘৃণা বা অস্বীকার না করে।

আর দুই. যেন এর অপব্যবহারের পাল্লায় না পড়ে।

ইসলামে যুদ্ধ-প্রক্রিয়া

একটি হাদিস লক্ষ্য করি। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়িয রা. বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো বাহিনী রওয়ানা করতেন, তখন তাদেরকে বলতেন:

> "মানুষকে আপন করো, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করো। দাওয়াত না দেয়া **পর্যন্ত তাদের উপর হামলা করো না। কেননা, দুনিয়ার উপর যত কাঁচা-পাকা ঘর রয়েছে, সেসবের অধিবাসী পুরুষদেরকে হত্যা করে ও মহিলাদেরকে দাসী বানিয়ে আনার চাইতে, আমার কাছে তাদেরকে যদি মুসলিম বানিয়ে আনতে পারো, তবে তা আমার কাছে বেশি প্রিয় হবে।** [৬৫]

---

[৬৫] وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثًا قال: «تألّفوا الناس وتأنّوا بهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، فما علي الأرض من أهل بيت ولا مدر ولا وبر إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إلى من أن تأتوني بنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجالهم»

رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (4682) عن عبد الرحمن بن عائذ رضي الله عنه

হাদিসটি আব্দুর রাহমান বিন আইয [রাহ] পর্যন্ত সহিহ, তবে কেউ কেউ তাঁকে সাহাবী মনে করলেও তিনি সাহাবী নন তাবিঈ ছিলেন। উমর, আলী, মু'আয, আবু যার [রা] প্রমুখের ছাত্র ছিলেন। দেখুন- ইবন হাজার আসকালানী (রাহ), তাহযিবুত তাহযিব: ৬/২০৩; হাদিসটি মুরসাল সহিহ। ইবনে হাজার আসকালানী মাতালিবুল আলিয়া ১/২০৩৫ — শারঈ সম্পাদক।

অমুসলিমদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করা, ইসলামের একটি বুনিয়াদি উদ্দেশ্য। সমস্ত মানুষ যেন তার স্রষ্টাকে 'আসল পরিচয়ে' চিনতে পারে (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), এবং স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন করে এবং তাঁর দেয়া 'জীবনব্যবস্থা মোতাবেক' চলে (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) দুনিয়াতে প্রশান্তির জীবন এবং পরকালে অনন্ত সুখের খোঁজ পেয়ে যায়— এটা ইসলামের আগমনের মৌলিক লক্ষ্য। ইসলামে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ধারণাও এমন— বছরে একবার বা দু'বার পার্শ্ববর্তী কাফির রাষ্ট্র আক্রমণ করে সেখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করা খলিফার জন্য ওয়াজিব। [৬৬] উদ্দেশ্য: নতুন নতুন ভূখণ্ডে মানুষের হিদায়াতের পরিবেশ তৈরি করা ইসলামী শরীয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ফলে মানবরচিত ও মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া মিথ্যা সিস্টেমের জুলুম থেকে আল্লাহ-প্রদত্ত ইনসাফ ও ন্যায়ের স্বাদ মানুষ পায়, যা তাকে ইসলাম চিনতে সহায়তা করে। ইসলামী ভূখণ্ডে কাফির অবাক হয়ে দেখে:

- এ কেমন বিচারব্যবস্থা যেখানে রায় চলে যায় রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে [৬৭]। রাষ্ট্রপ্রধান নিজের হাতে জনসমক্ষে নিজ সন্তানকে দেবে ৮০ চাবুক। [৬৮]

- এ কেমন সুশাসন যেখানে ১৩০০ কিলোমিটার পাড়ি দিচ্ছে একাকী যুবতী নারী। কেউ তার দিকে চোখ উঠিয়ে পর্যন্ত তাকাচ্ছে না। [৬৯]

---

[৬৬] মাজমু' মুহাযযযাব ২৪/১৬০, মুক্বনা ১/৫৬৪-৬৫

[৬৭] তিনি প্রসিদ্ধ কাযী শুরাইহ নামে। খলীফা উমার (রা.) এর বিরুদ্ধে প্রথম ফয়সালা দেন কেনা ঘোড়া ফেরত দেবার ব্যাপারে এক বেদুঈনের দায়ের করা মামলায়। বিমুগ্ধ খলীফা বড় বড় সাহাবী বর্তমান থাকতেও তাঁকে নিয়োগ দিলেন কুফা শহরের 'চীফ জাস্টিস' পদে। প্রায় ৬০ বছর এই পদে দায়িত্ব পালন করেন উমার, উসমান, আলী, মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এই ৪ জন খলিফার যুগে।

- খলীফা আলী (রা.) এর বিরুদ্ধে রায় দেন এক ইহুদীর দায়ের করা মামলায়। বর্মের মালিকানা নিয়ে খলিফা আর ইহুদীর মাঝে বিরোধের ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ।
- নিজের ছেলের জামিনের আসামী পালিয়ে গেলে ছেলেকেই জেলে ঢুকিয়ে দেন তিনি। (দীর্ঘশ্বাস)

[আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া ই.ফা., ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫]

[৬৮] হিজরী ১৪ সালে খলীফা উমার (রা.) নিজ পুত্র উবায়দুল্লাহকে মদপানের অপরাধে বেত্রাঘাত করেন (আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া ই.ফা., ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৪) আরেক সন্তান আব্দুর রহমান ওরফে আবু শাহমাকে মদপানের অপরাধে বেত্রাঘাত করেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১ মাস পর মৃত্যুবরণ করেন। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, ১৭০৪৭)

[৬৯] আদী ইবন হাতিম থেকে তিরমিযীর বর্ণনা, নবিজিবললেন, যার অধিকারে আমার জীবন তাঁর কসম, আল্লাহ অবশ্যই এ দীনকে এমন পূর্ণতা দিবেন একাকিনী নারী হাওদার উপর চড়ে সুদূর হীরা শহর থেকে এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে। তাতে কোন লোকের আশ্রয় দানের প্রয়োজন তার হবে না। ... আদী ইবন হাতিম (রা.) বলেন, এই তো আমি দেখছি হাওয়াদানশীনা নারী কারো নিরাপত্তা সঙ্গ ছাড়াই হীরা থেকে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে যাচ্ছে। (আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া ই.ফা., ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৯-১৩০)

- এ কেমন অর্থব্যবস্থা যেখানে দারিদ্র্যসীমার অবস্থা এমন যে যাকাত নেয়ার জন্য খুঁজেও লোক পাওয়া যাচ্ছে না। [৭০]

- এ কেমন রাষ্ট্রকাঠামো, যেখানে তাকে নিয়ে সংখ্যালঘু রাজনীতি হচ্ছে না। প্রতিবার প্রতিবেশী বন্ধুদেশের নেতা আসার টাইমে সরকারদলীয় লোকেরা দিচ্ছে না আগুন সংখ্যালঘু পল্লীতে। নিজেদের অবিকল্প প্রমাণ করার জন্য।

- এ কেমন বাজার যেখানে মুসলিম দোকানী নিজের দোকান বন্ধ করে পাশে বিধর্মীর দোকান দেখিয়ে দিচ্ছে কাস্টমারকে [৭১]। বিক্রেতা নিজ মালের দোষ আগেই দেখিয়ে দিচ্ছে। [৭২]

- এ কেমন শাসন, যারা প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হবার ভয়ে ট্যাক্সের টাকাই ফিরিয়ে দিচ্ছে [৭৩]। রাষ্ট্রপ্রধান এদের সাথেই থাকে, তার ভিআইপি প্রোটোকল জনগণকে কষ্ট দেয় না। গাছের নিচে চাটাইয়ে শুয়ে কী শান্তির ঘুম তার। [৭৪]

---

[৭০] ফিকহুল যাকাত, শায়খ ড : ইউসুফ আল-কারযাভী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৬ এবং ১৪৬

[৭১]

[৭২] 'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খাদ্য স্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি খাদ্য স্তূপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁর হাত ভিজা পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! ব্যাপার কি? উত্তরে খাদ্যের মালিক বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। রাসূলুল্লাহ তাকে বললেন, তাহলে ভিজা অংশটা শস্যের উপরে রাখলে না কেন? যাতে ক্রেতা তা দেখে ক্রয় করতে পারে। যে প্রতারণা করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়' [মুসলিম ১০২; তিরমিযী ১৩১৫]

যেসব পণ্যে বিভিন্ন কারণে দোষ-ক্রটি থেকে যায় সেগুলো গোপন রেখে বা কৌশলে তা বিক্রি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হচ্ছে ক্রেতাকে উক্ত দোষ-ক্রটি সম্পর্কে জানাতে হবে। বিক্রয়ের সময় পণ্যের দোষ-ক্রটি বলে দেয়া না হ'লে তা হালাল হবে না। আর জানা সত্ত্বেও বিক্রেতা যদি না বলে তাহ'লে তা তার জন্য হালাল নয়। [ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, পৃঃ ৩৬০।]

[৭৩] আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালে আবু উবাইদাহ (রা.) ৬৩৪ সালে বাইজান্টাইন শহর হিমস জয় করলেন। জয়ের পর মুসলিমরা জিযিয়ার বিনিময়ে অমুসলিমদের সকল অধিকার নিশ্চিত করলো। বছরখানিকের মাথায় রোমান সম্রাট বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে শহর পুনর্দখল করতে আসল।

কৌশলগত কারণে মুসলিম বাহিনী হিমস থেকে পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নিল। হিমস ছাড়ার আগে মুসলিম বাহিনী বিগত সময়ের সকল জিযিয়া ফেরত দিয়ে দিল। আবু উবাইদাহ জবাবে বললেন,"তোমাদের কাছ থেকে জিযিয়া আমরা নিয়েছিলাম তোমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদানের শর্তে। আজ আমরা তোমাদের নিরাপত্তা দিতে পারছি না। আর তাই এই জিযিয়া ফেরত দিচ্ছি"। এভাবে সিরিয়ার যে সকল স্থান মুসলিম বাহিনী ত্যাগ করলো, তাদের সবার জিযিয়া ফেরত দেয়া হলো। অভিভূত খ্রিস্টানরা আফসোস করে বললো, স্বজাতি রোমানদের শাসনের চেয়ে তাদের কাছে বরং বিজাতীয় মুসলিমের শাসনই বেশী প্রিয়।

Walker Arnold, Thomas (1913), Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith, Constable & Robinson Ltd

[৭৪] উমার রা. এর সেই ঘুম দেখে রোমান দূতের সেই কালজয়ী মন্তব্য: O Umar! You ruled, you were

- এ কেমন জীবন এদের: পুরো বাজার খোলা পড়ে আছে, নেই চুরি-ডাকাতি [৭৫]। নিজে না খাইয়ে এরা আরেকজনাকে খাওয়ায় [৭৬]। দাস-মালিক-রাজা-ফকির এক কাতারে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়ায়। তমাল ভট্টাচার্যরা অবাক নয়নে দেখবে, কাবাবে গোশতের পরিমাণ গেছে বেড়ে। কী সুখ! কী প্রশান্তি সবখানে!

এসব ধীরে ধীরে তার অন্তরে ইসলামের সত্যতাকে স্পষ্ট করে তোলে। আমাদের শরীয়াহ সবচেয়ে বড় দাওয়াহ। কোনো সম্পদ, রাজত্ব, দাসদাসী ইসলামের জিহাদের উদ্দেশ্য নয়। শরীয়া প্রতিষ্ঠা করে ইসলামকে বুঝার পরিবেশ তৈরি করাই যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য, তা আরও স্পষ্ট হয় যুদ্ধের আহ্বানের পদ্ধতি দ্বারা।

১ম ধাপ

ইসলামের দিকে দাওয়াত। ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দিকে দাওয়াত না দিয়ে কোনো কওমের বিরুদ্ধে লড়াই করেননি। আল্লাহকে ইলাহ [৭৭] হিসেবে এবং নবীজীকে সেই আল্লাহর বাণীবাহক হিসেবে স্বীকৃতি দিলে আর যুদ্ধ হবে না। কেননা উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে। নবিজি বলেন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলা পর্যন্ত লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি আদিষ্ট। [৭৮] সে দেশের শাসক ইসলাম গ্রহণ করা মানে সে দেশে শরীয়া প্রতিষ্ঠিত হবে, জুলুম মিটে যাবে, মানুষ শরীয়ার পরিবেশের দ্বারা ইসলামের সত্যতা চিনে ইসলামে দাখিল হবে।

ইমাম বুরহানুদ্দিন মারগীনানী রহ. বলেন:

> " যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, তাদের ইসলামের দাওয়াত দেয়া ছাড়া লড়াই শুরু করা জায়েয নেই। ইসলামের দাওয়াত প্রদানের দ্বারাই তারা

---

just. Thus you were safe. And thus you slept.

হে উমার! আপনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাই নিরাপদে শুয়ে আছেন। অথচ আমাদের রাজাবাদশাহরা নিরাপত্তার ভয়ে নির্ঘুম রাত কাটায়। আম সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার দীন সত্য। আমি যদি দূত হিসেবে না আসতাম তবে এখনই আপনার দীন কবুল করতাম। তবে আমি পরবর্তীতে এসে ইসলাম গ্রহণ করব।

[আখবারু উমার, পৃ ৩৩২ সূত্রে উমার রা. সম্পর্কে ১৫০ টি শিক্ষণীয় ঘটনা, পীস পাবলিকেশান]

[৭৫]

[৭৬] মুসলিম মুজাহিদগণ নিজেরা খেজুর খেয়ে দিন কাটালেও বদরের যুদ্ধবন্দিদের জন্য রুটি তৈরি করেছেন। [তাবারী ১/১৩৩৭]

[৭৭]

[৭৮] হিদায়া ২য় খণ্ড ই.ফা., পৃষ্ঠা ৪৩০। হাদিসটি হল:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فمَن قالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ ومالَهُ

"মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। কাজেই যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে নিজের জান ও সম্পদকে আমার থেকে নিরাপদ করে নেবে" [ইমাম বুখারি, আস সহিহ, হা: ২৯৪৬]

জানতে পারবে, আমরা দীনের বিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। সম্পদ লুণ্ঠন ও পরিবারকে দাস বানানোর জন্য নয়। তাতে হয়ত তারা দাওয়াতে সাড়া দেবে। আমরাও লড়াইয়ের পরিশ্রম থেকে বেঁচে যাব। আর যাদের কাছে ইতিপূর্বে দাওয়াত পৌঁছেছে, তাদেরকে দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব।[৭৯]

২য় ধাপ

সকল মতবাদই তার বিপরীত মতের লোকেদের হত্যা করেছে। বিন্দুমাত্র সহনশীলতা কেউ কখনো দেখায়নি। বিপরীত মতের লোকেদের না-মানুষ মনে করেছে, নানান অজুহাতে হত্যা করেছে। আইন বানিয়ে হত্যা করেছে। ভিলেন বানিয়ে হত্যা করেছে। সমাজতন্ত্র তার বিপরীত মতের কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করেছে।[৮০] সেকুলার গণতন্ত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ফ্রান্সে [৮১] ও তুরস্কে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে [৮২] এবং মধ্যপ্রাচ্যে এখনো চালাচ্ছে।

- ১২ লক্ষ আফগানের[৮৩] রক্তের কোনো দাম নেই,
- ২৪ লক্ষ ইরাকি হত্যার কোনো জবাবদিহিতা নেই,[৮৪]
- ১০ লাখ ঘরহারা ফিলিস্তিনীর[৮৫] কোনো মানবাধিকার নেই,

---

[৭৯] হিদায়া ২য় খণ্ড ই.ফা., পৃষ্ঠা ৪৩১

[৮০] রুশ বিপ্লব ও তার পরবর্তী লেনিন যুগে (১৯১৭-১৯২৪) সবগুলো রেফারেন্স গড় করলে ৯ মিলিয়ন, স্ট্যালিন পিরিয়ডে (১৯২৪-১৯৫৩) ২০ মিলিয়ন আর চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবে ও পরবর্তী মাও সেতুং যুগে (১৯৪৯-১৯৭৫) গড়ে ৪০ মিলিয়ন [necrometrics.com]

[৮১] ফরাসী বিপ্লবের পর পর বিচার, বিচার ছাড়া ও জেলে হত্যা করা হয় ৪০,০০০, ভেন্ডি বিদ্রোহ (বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রীদের বিদ্রোহ) থামাতে ৩-৬ লাখ লোক মেরে দেয়া হয়।

[৮২] ১৯২৪ সালে খিলাফত উৎখাতের পর খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য কুর্দিরা বিদ্রোহ করে। শাইখ সাঈদ (Shaikh Said Piran) এর নেতৃত্বে এই বিদ্রোহে জাজা গোত্র ও কুরমানজি গোত্রের সাথে যোগ দেন খিলাফতের প্রতি অনুগত 'হামিদিয়া' সেনারা। ১৯২৫ সালে শাইখ সাঈদ-সহ ৬০০ জনকে ফাঁসি দেয়া হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে 'দারশিম অভিযানে'ই ৪০,০০০ কুর্দিকে হত্যা করা হয় [*The Invisible War in North Kurdistan*, Kristiina Koivunen, page. 104]। ১৯২৫-১৯৩৮ পর্যন্ত কামাল আতাতুর্ক (মৃত্যু ১৯৩৮) সরকার ২.৫ লক্ষ জনকে হত্যা করে। ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত করে ১৫ লক্ষ মানুষকে। [University of Central Arkansas, Deptt. of Political Science] তুর্কি টুপি নিষেধাজ্ঞা ও ইউরোপীয় হ্যাট চালু আইনের (Hat Reform) বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় শাইখ মুহাম্মদ আতিফ হোজ্জা (Mehmed Âtıf Hodja)-সহ প্রায় ২৫ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

[৮৩] Nicolas J.S. Davies (2018) How Many People Has the U.S. Killed in its Post-9/11 Wars? Part 1-2-3, Consortiumnews

[৮৪] 2006 Lancet study এবং 2007 Opinion Research Business (ORB) survey অনুযায়ী গত ১৫ বছরে। Nicolas J.S. Davies (2018) How Many People Has the U.S. Killed in its Post-9/ 11 Wars? Part 1-2-3, Consortiumnews/

[৮৫] United Nations Conciliation Commission For Palestine-এর প্রোগ্রেস রিপোর্ট ১৯৫১ ১৯৪৮ সালে ৭,১১,০০০

- আড়াই লাখ লিবিয়ান স্রেফ খড়কুটো;
- সাড়ে ৬ লাখ সোমালিয়ান, সাড়ে ৩ লাখ সিরিয়ান, দেড় লাখ ইয়েমেনীর বাঁচার কোনো অধিকার ছিল না। [৮৬]
- সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে ৬০ লক্ষ লোকের প্রাণ নেওয়া আমেরিকার জন্য জায়েয।
- ৩০ লক্ষ উইঘুরের নব্য দাসপ্রথার বিরুদ্ধে কোনো সোকল্ড মুসলিম দেশও কথা বলবে না।
- জর্জ বুশ বলেই দিয়েছে: তালেবান বা আল-কায়েদার জন্য কোনো জেনেভা কনভেনশন না মানবাধিকার সনদ প্রযোজ্য না। [৮৭]

কেন? এদের সবার মাঝে একটা মিল লক্ষ্য করেছেন: এরা মুসলিম। এরা আল্লাহর দেয়া দীনে, আল্লাহর দেয়া মাপকাঠিতে বিশ্বাস করে। পশ্চিমা আদর্শ, আধুনিকতা, লিবারেলিজম, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা এরা মানতে পারে না। এরা পশ্চিমা দর্শনে 'হিউম্যান' না, 'ব্যক্তি' না। ধর্মকে ঝেড়ে ফেলে নিজের নৈতিকতা নিজে ঠিক করার পক্ষে এরা না, মানে আপনি যদি ওদের চোখে 'ব্যক্তি' হন, তা হলে আপনার জন্য 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'র আলাপ হবে। আপনার অধিকার নিয়ে কথা বলবে 'হিউম্যান রাইটস' সংগঠন। কারণ আপনি ব্যক্তি হয়েছেন, হিউম্যান হতে পেরেছেন। (হেগেলের consciousness of freedom এর সাথে তুলনা করুন)

আর আপনি যদি এই 'ব্যক্তি' হতে অস্বীকার করেন, ইসলামের দেওয়া স্ট্যান্ডার্ড-কে চূড়ান্ত ভাবেন, তবে আপনি মধ্যযুগীয়-কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তা হলে আপনার কী হলো না হলো, তা নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। পাখির মতো আপনাকে গুলি করে মারা হলেও তা অপরাধ না, আপনার বাসা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেও কারও দায়বদ্ধতা নেই, আপনার মা-বোনের ইজ্জতের কোনো দাম নেই। জাতিসংঘ আপনাকে নিয়ে কথা বলবে না, সুশীলরা বলবে না, মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলবে না।

যেমন ধরুন, আমাদের দেশ ৪ টা মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা-জাতীয়তাবাদ। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই লিখিত না হলেও এই নীতি

১৯৬৭ সালে ৩,০০,০০০ (প্রায়)

[৮৬] Nicolas J.S. Davies (2018)/

[৮৭] Memorandum for Alberto R. Gonzales, Counsel to President, and William J. Haynes II, General Counsel of the Department of defence (Jan 22, 2002), US Department of Justice.

বা এর কাছাকাছি নীতিতে চলে। যারা ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী, তারা চায় এই ৪ মানবরচিত নীতির বদলে একমাত্র নীতি হবে ইসলাম।

- গণতান্ত্রিক ফরমেটের বদলে ইসলামি সরকারব্যবস্থা,
- সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বদলে ইসলামি অর্থনীতি,
- ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে সর্বস্তরে তাওহীদ, মানে এক আল্লাহর কাছে পরকালীন জবাবদিহিতামূলক চেতনা; অফিসে আদালতে, হাটবাজারে সবখানে। মানে রাষ্ট্র নিজেকে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ ঘোষণা করবে অফিসিয়ালি। রাষ্ট্রের পলিসি, আইন, অর্থ, পররাষ্ট্রনীতি সব আল্লাহর দীন অনুসারে তৈরি হবে।
- আর ছোটো ছোটো জাতীয়তাবাদী জাতিরাষ্ট্র কনসেপ্টের বদলে খিলাফত বা বিশাল পরাশক্তি ইসলামি সাম্রাজ্য কনসেপ্টে বিশ্বাসী।

এ ধরনের লোকগুলোর সাথে দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় আচরণ কেমন হয়? ভিন্নমতের দরুন এদেরকে 'জঙ্গি-সন্ত্রাসী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'খারেজী', 'দেশদ্রোহী' হিসেবে বিচার কিংবা ক্রসফায়ার দেয়া হবে। ভিন্নমত কেউই সহ্য করে না। একমাত্র ইসলামই 'মেনে নিতে বাধ্য করা' নয়তো 'হত্যা'র মাঝামাঝি আরেকটা অপশন দিয়েছে ভিন্নমতকে—জিযিয়া চুক্তি। [৮৮]

যদি ইসলামের ধর্মমতের আহ্বানে সাড়া না দাও, তাহলে জিযিয়া চুক্তিতে আসো। জিযিয়া হচ্ছে লড়াই থেকে বিরত থাকার পন্থা: তাদের ধর্ম ঠিক রেখে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের চুক্তি। এবং আনুগত্যের প্রতীক হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রকে কর প্রদান। যাকে বলা হয় জিযিয়া কর। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে শরীয়ার ন্যায়পূর্ণ আইনের ছোঁয়া সে এলাকায় পড়বে। মানুষ জুলুম থেকে বাঁচবে, মানুষের জন্য হিদায়াতের পরিবেশ তৈরি হবে।

এটা শুধু মাত্র কোনো ট্যাক্স নয় বরং এর সাথে অনেক বিষয় জড়িত, বলা যেতে পারে জিযিয়া একপ্রকার চুক্তি যার উপরে বিজাতীয়রা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের সুযোগ পায়। সে রাষ্ট্রের আদর্শ পরিপন্থী কোন কাজ (প্রকাশ্যে কুফর-শিরক-এগুলোর প্রচার) করবে না, ইসলামী রাষ্ট্রের আইন ও সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকবে, একটা অর্থ রাষ্ট্রে জমা দেবে, ইসলামী রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে কোন অপরাধকর্মে লিপ্ত হবে না এবং রাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

---

[৮৮] দেখুন ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বইয়ের 'জিযিয়া' গল্পটি

জিযিয়া করের পিছনের দর্শন যদি লক্ষ্য করেন, প্রথমত এর পরিমাণ কী হবে। প্রথমত, যদি শত্রুপক্ষ জিযিয়ার আহ্বানে সাড়া দেয়, আমাদের যুদ্ধ করতে না হয়। অর্থাৎ যুদ্ধ এড়ানোর অপশন হিসেবে যদি শত্রু রাজি হয়, সেক্ষেত্রে পরস্পর সম্মতি ও সমঝোতার ভিত্তিতে এর পরিমাণ ঠিক হবে। যেমন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানবাসীদের সাথে বাৎসরিক ১০০০ দিরহাম (বর্তমানে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মাত্র) ও ২০০ পিস পোষাকের উপর চুক্তি করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, যদি শত্রু এই প্রস্তাব না মানে, তাহলে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ করে কাফিরদের পরাজিত করে যদি ধার্য করা হয় সেক্ষেত্রে ইসলামী শাসকই ধার্য করবেন। বুখারী শরীফের বর্ণনায়, মৃত্যুকালে খলীফা উমার (রা.) বলেন,

> “ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এর জিম্মিদের (অর্থাৎ জিম্মাধীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়) বিষয়ে ওয়াসিয়াত করছি যে, তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন পুরা করা হয়। (তারা কোন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে) তাদের পক্ষাবলম্বন করে যেন যুদ্ধ করা হয়, তাদের শক্তি সামর্থ্যের অধিক জিযিয়া (কর) যেন চাপানো না হয়। [৮৯]

সেক্ষেত্রে হানাফি মাযহাব মতে, বছরে

	বছরে [৯০]	মাসে উসুল করা হবে
ধনী ব্যক্তি	৪৮ দিরহাম (৭০৩৭ টাকা)	৪ দিরহাম (৫৮৬ টাকা)
মধ্যবিত্ত ব্যক্তি	২৪ দিরহাম (৩৫১৮ টাকা)	২ দিরহাম (২৯৩ টাকা)
শ্রমে নিযুক্ত দরিদ্র	১২ দিরহাম (১৭৫৯ টাকা)	১ দিরহাম (১৪৬ টাকা)
যাদের উপর ধার্য হবে না	স্ত্রীলোক, শিশু, পঙ্গু, অন্ধ, কর্মহীন দরিদ্র, কাফিরের দাসদাসী, সন্ন্যাসী।	

এই মত উমার রা., উসমান রা. ও আলী রা. থেকে বর্ণিত। আর শাফিঈ মাযহাব মতে সকলকেই ১ দিনার (প্রায় ২১০০০ টাকা বার্ষিক) [৯১] হারে দিতে হবে। এভাবে ধনী-দরিদ্র পার্থক্য করা হবে না। নবিজি মুআয রা. কে এই হারে ইয়েমেনে আদায়

---

[৮৯] বুখারী ই.ফা., খণ্ড ৬, হাদিস নং ৩৪৩৫

[৯০] আল-হিদায়াহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৭৪

আর হিসাবটা করেছি এভাবে:

হানাফি মতে ১ দিরহাম=৩.৬১ গ্রাম রূপা (অন্য তিন ইমামের মতে ২.২০৪ গ্রাম) [মিফতাহুল আওযান, পৃ: ২৮-২৯, ইসলামী আওযান, পৃ: ১৭] ; ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে ১ গ্রাম রূপার মূল্য ০.৫৮ ইউএস ডলার, ১ ইউএস ডলার=৮০.২৫ টাকা; এ হিসাবে ১ দিরহাম = ১৪৬.৬২ টাকা আসে।

[৯১] হানাফি মতে ১ দিনার = ৪.৩৭৪ গ্রাম সোনা (অন্য তিন ইমামের মতে ৩.১৪৯ গ্রাম) [ইসলামি আওযান পৃ: ১৯, মিফতাহুল আওযান পৃ: ২১], ১ গ্রাম সোনার মূল্য (১০ জুলাই, ২০২১)= ৪৯১৫ টাকা। — শারঈ সম্পাদক।

করতে বলেছিলেন বলে। এর বিপরীতে, যারা জিযিয়া প্রদান করবে ইসলামী রাষ্ট্র তাকে নাগরিক (যিম্মী) বলে স্বীকৃতি দেবে। সে পাবে:

- যেকোনো যুদ্ধ থেকে জান-মালের অব্যাহতি
- ইসলামী রাষ্ট্র তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে
- বহিঃশত্রুর আগ্রাসনের সময় অমুসলিমরা যদি নিজেদের সম্পদ রক্ষা না করে পালিয়েও যায়, তবুও মুসলিমরা তাদের সম্পদ পাহারা দিতে এবং যেকোন মূল্যে রক্ষা করতে বাধ্য থাকবে।
- ইসলামী রাষ্ট্রে তার মর্যাদা, সুরক্ষা থাকবে নিম্নরূপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন:

> “যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। আর জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দুরত্ব থেকে পাওয়া যাবে। [৯২]

> “তোমাদের যে কেউ কোন যিম্মীর উপর অত্যাচার করবে, বা তার হক নষ্ট করবে, কিংবা তার সামর্থের বাইরে তাকে কষ্ট দিবে, অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে (জোরপূর্বক) তার কোন জিনিস নিবে, আমি কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব। [৯৩]

> “আরো বলেছেন, যে কোন যিম্মীকে আঘাত করে সে যেন আমাকে আঘাত করে, আর যে আমাকে আঘাত করে সে আল্লাহকে রাগান্বিত করে। [৯৪]

জিযিয়ার এই সামান্য অর্থ প্রদান মূলত ইসলামী শরীয়া মেনে চলার প্রতীকী আনুগত্য। নচেৎ এই সামান্য সম্পদের কী প্রয়োজন ইসলামী রাষ্ট্রের? জিযিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হল অমুসলিমরা এই ট্যাক্স দেয়ার জন্য হলেও যেন মুসলিম রাজধানীতে আসে। মুসলিমদের সাথে মেলামেশা হয়। মুসলিমদের জীবন দেখে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর ইসলাম কবুল করে মৃত্যুর পর মহাযাতনা থেকে বেঁচে যায়।

ইবনু আবেদীন রহ. বলেন:

> “যেহেতু জিজিয়ার উদ্দেশ্য হল, উত্তম ভাবে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। আর তা হল তারা মুসলিমদের সাথে বসবাস করে ইসলামের সৌন্দর্য দেখে ইসলাম গ্রহণ করবে। সেই সাথে তাদের ক্ষতি (যুদ্ধ-বিগ্রহ) থেকে বর্তমানে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। [৯৫]

---

[৯২] বুখারী, হাদিস ৩৯১; iHadith app হাদিস নং ৩১৬৬
[৯৩] আবু দাউদ, হাদিস ৩০৫২ (iHadith app)
[৯৪] তাবারানী আওসাত
[৯৫] ফাতওয়ায়ে শামী ৩/২৭৫

আল কাসানী রহ. হুবহু একই কথা বলেছেন:

> “ কাফেরদের থেকে যে সম্পদ গ্রহণ করা হয় সেটার প্রতি লোভ বা আকর্ষণের কারণে জিজিয়ার বিধান দেওয়া হয়নি। বরং জিজিয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার জন্য। যাতে তারা মুসলিমদের সাথে থেকে ইসলামী শরীয়াতের সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।[১৬]

ইবন হাজার আল আসকালানী রহ. বলেন:

> “ বলা যায় জিজিয়া গ্রহণ করার উদ্দেশ্যই হল ক্রমে ক্রমে কাফিরদের ইসলামের দিকে টেনে নিয়ে আসা যেহেতু জিজিয়া কর অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহনের কারণ হয় তাই জিজিয়া দিতে সম্মত হওয়াটাও ইসলামকে মেনে নেওয়ারই সমতুল্য তাই হাদীসের অর্থ তাদের সাথে আমি যুদ্ধ করব যতক্ষণ না তারা মুসলিম হয়ে যায় অথবা এমন কিছু করতে রাজী হয় যা তাদের আস্তে আস্তে ইসলামের দিকেই নিয়ে আসবে। এই উত্তরটিই সর্বোত্তম।[১৭]”

৩য় ধাপ

জিযিয়া চুক্তিতে আসতেও সম্মত না হলে, এবার যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ করে ঐ ভূখণ্ড দখল করে সেখানে ইসলামের ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

তাহলে বুঝা গেল, ইসলামে যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য দীনের প্রসার ও নতুন নতুন ভূখণ্ডে দীনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা, যাতে মানুষকে মানবরচিত-জুলুমবান্ধব সিস্টেম থেকে বের করে আনা যায় এবং ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা যায়। এটা বুঝা খুব কঠিন না। নতজানু হবার প্রয়োজন নেই। উপনিবেশীরা নতজানু নয়, তারা বলে: আমরা নেটিভদের ভালোর জন্য তাদের দেশ দখল করেছি। নব্য উপনিবেশীরা তাদের আগ্রাসনের জন্য নতজানু নয়। তারা কারণ দেখায়: আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি, গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। আমরা কেন আল্লাহর বিধান নিয়ে নতজানু? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে বলতেন 'নাবিউল মালহামা' (যুদ্ধের নবি) [১৮]

অসদুদ্দেশে কিছু প্রাচ্যবিদ বলেছে: ইসলাম তরবারি দ্বারা ছড়িয়েছে, যেন তরবারি গলায় ধরে ধরে কনভার্ট করা হয়েছে। আবার টমাস আর্নল্ডের মত নরমপন্থী

---

[১৬] বাদায়িউস সানায়ে' ৭/১১১

[১৭] ফাতহুল বারী ৬/২৫৯

[১৮] আবু মুসা আশয়ারী রা. বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে অনেক নামে আখ্যা দিতেন। আমরা কয়েকটি মুখস্ত করে নিয়েছিলাম। তিনি বলতেন: 'আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ, আল-মুকাফফি, আল-হাশির, রহমতের নবি'। ইয়াজিদ যোগ করেন: 'তাওবার নবি এবং যুদ্ধের নবি'। [সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদ, সহীহ]

প্রাচ্যবিদেরা একথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ইসলাম প্রচারের পিছনে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে ফেলেছেন। সত্যটা হল: ইসলাম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জায়গায় কাউকে বাধ্য করেনা। কিন্তু যুদ্ধের দ্বারা রাষ্ট্র-অর্থ-বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম; যুদ্ধের দ্বারা ইসলাম ফিতরাতের (সহজাত স্বভাব) স্বয়ংক্রিয় বিকাশের বাধাগুলো দূর করে, ইনসাফ কায়েম করে, জুলুমের অবসান ঘটায়, যাতে মানুষ ইসলামের সত্যতা নিজেই চিনে নেয়। এই পরিবেশ তৈরি করতে গিয়ে, জালেমকে জুলুম থেকে ফেরাতে প্রয়োজন পড়লে 'যুদ্ধ' দাওয়াহর একটা ধরন। ইসলামী ব্যবস্থা (শরীয়া) প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে ব্যাপক ও ফলপ্রসূ দাওয়াহ, যেখানে কাফির অটোমেটিক দাওয়াহ পেতে থাকে। তোমাদের যুদ্ধ আর আমাদের যুদ্ধ এক নয়।

দাসপ্রথা বহাল: লক্ষ্য ও উপযোগিতা

লক্ষ্য: ইসলাম গ্রহণের পরিবেশ দেয়া

দাসপ্রথা বহাল রাখার দ্বারা ইসলামের লক্ষ্য হল: হিদায়াতবান্ধব পরিবেশে রেখে কাফির যুদ্ধবন্দিদের ক্রমে ক্রমে ইসলামে আনা। আমরা দেখেছি, দাস হিসেবে ইসলামী শাসনে শুধু যুদ্ধবন্দিদেরই এন্ট্রি রাখা হয়েছে, আবার দাসমুক্তির এতো এতো বাহানা দেয়া হয়েছে (সামনে দেখবো) এবং মালিকদের এতোভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যার অর্থ হল— মুক্ত করেই দেয়া হবে, ছেড়েই দেয়া হবে, কিছুটা প্রসেসিং-এর জন্য দাস হিসেবে নেয়া, মুসলিম সমাজের ভিতর রাখা আরকি (তুলনীয়: হেগেল)। দাসদের সাথে সুন্দর আচরণ ও উত্তম খোরপোষের দ্বারা মুসলিম সমাজের ভিতর এমন পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, যা দাসদের ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে। যেমন:

- মুসলিম দাসদের মুক্ত করে দেয়ার জন্য মালিকদের আলাদা সওয়াব ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলে মুক্তির সম্ভাবনা বেশি। বলা হয়েছে:

> “ কেউ যদি তার মুসলিম দাসকে আজাদ করে দেয় তবে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রত্যেক অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন দাসের প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে'।[১১]

- দাসদের আমভাবে প্রহার করা তো নিষেধ করাই হয়েছে। মুসলিম দাসদের প্রহার না করতে নবিজি আলাদাভাবে বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলে আরও চমৎকার আচরণ পাওয়া যাবে।

> “ আবু উমামাহ রা. থেকে বর্ণিত, খাইবার থেকে ফেরার সময় নবীজীর কাছে

[১১] মুসলিম ই.ফা., হাদিস নং ৩৬৫৩, iHadith app ৩৬৮৭

দু'টি দাস ছিল। আলী রা. এলেন:

– ইয়া রাসূলাল্লাহ, খেদমতের জন্য আমাদেরকে কোনো খাদেম দান করুন।
– এই দুইজনের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নিয়ে যাও।
– আপনি পছন্দ করে দিন।
– (একজনের প্রতি ইশারা করে) একে নিয়ে যাও। তবে একে মারধোর করো না। খাইবার থেকে ফেরার সময় আমি তাকে নামায পড়তে দেখেছি। আর আমাকে নিষেধ করা হয়েছে নামাযীদের মারধোর করতে। [১০০]

- গরীব সাহাবীদেরকে বলা হয়েছে, দাসীদেরকে মুক্ত করে বিবাহ করে নিতে। কেননা তাদেরকে আলাদা করে মোহরানা দিতে হয় না, মুক্তিই তাদের মোহরানা। [১০১] কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে: সুন্দরী কাফের নারী অপেক্ষা মুমিন দাসী স্ত্রী হিসেবে উত্তম। [১০২]

- আর মুসলিমদের নৈতিক জীবন, সমতার শিক্ষা, ন্যায়-ইনসাফের শাসন সে তো চোখেই দেখছে।

- মুক্তির পর দাস আর বংশীয় মুসলিমদের মাঝে কোনো ফারাক নেই, বরং নিজ যোগ্যতায় সম্ভ্রান্ত মুসলিম এবং মালিকপক্ষের নেতাও হয়ে যেতে পারে মুক্তদাস। ইসলামের ইতিহাসে সেনাপতি, প্রধান বিচারপতি, অধ্যাপক, আইনজ্ঞ, সুলতান, গভর্নর, উজিরদের এক বিরাট অংশ ছিল সাবেক দাস। মিশরের মামলুক রাজবংশ, ভারতের মামলুক রাজবংশের সুলতানগণ ছিলেন সাবেক দাস, 'মামলুক' মানেই দাস। সামনে এই আলোচনাগুলো আরও স্পষ্ট হবে।

ইসলাম গ্রহণ তার সুন্দর দাসজীবন নিশ্চিত করে, মুক্তির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় এবং মুক্তির পর তার মর্যাদা আরও বেড়ে যায় ইসলামের প্রতি ডেডিকেশনের ভিত্তিতে। এভাবে দাসদেরকে ইসলামে দীক্ষিত হবার দিকে চালিত করা হয়। সুতরাং, যুদ্ধবন্দিদের দাস হিসেবে গ্রহণের প্রধান লক্ষ্য হল: তাদেরকে ইসলামের পরিচয় দেয়া এবং ইসলামে আনা। এভাবে তাদের দ্বারা ইসলামের ক্ষতি লোপ করা।

তবে তা কখনোই জোর করে নয়। জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করানো নিষেধ দাসদের ক্ষেত্রেও। অবশ্য ধর্মে জবরদস্তি নেই, এই কথাটা ব্যাপক অপব্যবহার হয়। কথাটা মানে হল: বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জবরদস্তি নেই। ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ ইসলাম মানলো কি

[১০০] মুসনাদে আহমাদ ৫/২২০, তাবারানী ৮০৫৭, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/২৩৭
[১০১] ফতহুল বারী ৯/১২২-১২৩
[১০২] সূরা বাকারা ২২১

মানলো না, পরকাল বিশ্বাস করলো কি করলো না—এর জবাবদিহি আল্লাহর কাছে।

- **কিন্তু ইসলাম যখন রাষ্ট্র, তখন রাষ্ট্রীয় আইন তো সবাইকে মানতেই হবে, যেমন আমরা এখন দেশীয় আইন মানছি।**
- **ইসলাম যখন সমাজভিত্তি, তখন সামাজিক অংশটুকু তো সবাইকে মেনে চলতেই হবে, যেমন এখন আমরা সমাজের ভয়ে অনেক কিছুই করি না।**
- **ইসলাম যখন পারিবারিক ব্যবস্থা, তখন ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকলেও পারিবারিক ফরমেটটা সবাইকে মানতেই হবে, যেমন এখন বিভিন্ন বিষয়ে আমরা পরিবারের বাইরে যেতে পারি না।**

এখন যদি দেশে সমাজতন্ত্র থাকত, রাজতন্ত্র থাকত, বা ফ্যাসিবাদ— তাহলে কি বলা যেত জবরদস্তি নেই? নিজের ইচ্ছার বিপরীতেও তো মেনেই চলতে হয়। কোনো-না-কোনো নিয়ম-আইন মানতেই হয়। পার্থক্য হলো, এখন আমরা মানছি মানুষের বানানো ব্যবস্থা, আর ইসলামি রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবার চলে ইসলামি মূল্যবোধের উপর। ব্যস। তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে জোরপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করানো ইসলামে সবার ক্ষেত্রেই নিষেধ।

আশাক নামে উমার রা. এর এক খ্রিস্টান দাস ছিল। তিনি বলেন: আমি একসময় উমারের দাস ছিলাম। একদিন তিনি আমাকে বলছিলেন: 'মুসলিম হয়ে যাও, তাহলে মুসলিমদের প্রয়োজনে তোমার থেকে আমরা সাহায্য নিতে পারব (নেতৃত্বে নিয়োগ দেবার দ্বারা)। অমুসলিমদের কাছ থেকে মুসলিমদের কোনো বিষয়ে সাহায্য নেয়া উচিত না (অমুসলিমকে নেতা বানানো উচিত না)'। কিন্তু আমি তাতে রাজি হইনি। তিনি তখন কুরআনের আয়াত বললেন: দীনে কোনো জবরদস্তি নেই [১০৩]। এরপর মৃত্যুশয্যায় আমাকে তিনি মুক্ত করে দিয়ে বললেন: 'তোমার যেখানে ইচ্ছে চলে যাও'। অথচ তিনি চাইলে আমাকে উচ্চমূল্যে বিক্রিও করে দিতে পারতেন। (পরে আশাক ইসলাম গ্রহণ করেন) [১০৪]

নবীজীর যুগের প্রায় ১০০০ বছর পরও আমরা এই লক্ষ্য পূরণ হতে দেখতে পাই, বাস্তবতা খুঁজে পাই। প্রোফেসর ডেভিসের বই থেকে জানা যায়, উত্তর আফ্রিকাতে পাবলিক দাসেরা যে জায়গায় থাকতো তাকে বলা হত bagno, এগুলো মুসলিম অফিসারদের (দিওয়ান) আন্ডারে থাকত। কিছু আবার প্রাইভেটও ছিল, যেসব

---

[১০৩] সূরা বাকারা ২৫৬

[১০৪] নিযামুল হুকুম ফিশ শারীয়াহ ওয়াত তারিখুল ইসলাম ১/৫৮

তাফসীর ইবনে কাসীর (ই.ফা.) ২/৩৫২ [সূরা বাকারা ২৫৬ আয়াতের তাফসীর]

মালিকেরা দাসদের বাসায় রাখতো না, তারা ভাড়ার বিনিময়ে এখানে দাসদের থাকার ব্যবস্থা করত। bagno-র ভিতরে চার্চ থাকত, তাতে ফাদারও নিয়োগ দেয়া থাকত। ব্যাপক মিশনারী কর্মকাণ্ডের সুযোগ দেবার পরও ১৬০৯-১৬১৯ এর মাঝে আলজেরিয়ার ২৮% দাসই ইসলাম গ্রহণ করে। ফাদার আলফনসোর মতে, 'খৃষ্টান দাসদের অর্ধেকই মুসলিম হবার পথে (being Turks)'। মুক্ত করে দিতে হবে বলে মুসলিম দাসমালিকেরা অনেকেই চাইতো না যে, দাসরা মুসলিম হোক। আবার অনেকে চাইতোও। এরপরও আলজিয়ার্সের মোট জনসংখ্যার ৮%-ই ছিল নওমুসলিম (renegade christians)। আরেকটা বিষয় আমরা পাই, ধর্মান্তরিতদেরকে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক মনে করা হত তুর্কীদের মত। ২য় শ্রেণীতে ছিল স্থানীয় বার্বার ও স্পেন থেকে আসা মরিস্কোরা। আর ৩য় শ্রেণীতে ছিল ইহুদিরা। সুতরাং এতো সুবিধা খৃষ্টান দাসদের আকর্ষণ করত বৈকি। [১০৫] ড. মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহর মতে:

> " এটা অনস্বীকার্য যে, দাস বানানোটা অমুসলমানদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার একটি সহজ উপায় ছিল এবং এটা ছিল মুসলিম রাষ্ট্রের একটি প্রধান রীতি। [১০৬]

অন্য যেকোনো প্রক্রিয়ার চেয়ে দাসপ্রথার মাধ্যমে অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা সহজ এবং ব্যাপক। মুসলিমদের সমাজে থাকতে বাধ্য করার ফলে তার অন্তর হিদায়াতের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মামলুক বাহিনী ও জেনিসারি বাহিনী কথা। বিপুল সংখ্যক তুর্কীয় বংশোদ্ভূত পুরুষ, বলকান কিশোর-খ্রিস্টান বালককে এনে ইসলাম শিখিয়ে সেনাবাহিনীতে চাকুরীর সুযোগ করে দেয়া, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে আমলা হিসেবে নিয়োগ, পদোন্নতি দিয়ে জমিদার হিসেবে সমাজে অবস্থান গড়ে দেয়া হয়। ইসলামের পক্ষে এদের অবদান সীমাহীন। দাসপ্রথার দরুনই এই লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলামের খোঁজ পেয়েছে। উন্নত জীবন পেয়েছে, সামাজিক অবস্থান পেয়েছে। আল-সায়েগ জানান আরব আমিরাতেও একই অবস্থা ছিল :

> " কেনার পর মনিব দাসকে নিজেদের সমাজে আত্মীকরণ করা জন্য তাকে খতনা করাত, নাম বদলে দিত, আগের নাম থাকতেই দিত না, পরিশেষে ইসলামে দীক্ষিত করত। দাসের বয়স বছর পঁচিশেক হলে এটা ছিল নিয়মের মত যে, মনিব একটা দাসী কিনবে শুধু তার সাথে বিয়ে দেবার জন্য। (Hopper 2015)

দাসদের সন্তানদের বিশুদ্ধ ইসলামী পরিবেশে বড় হওয়া সম্পর্কে Morgan State University-র ইতিহাসের অধ্যাপিকা Mary Ann Fay বলেন: ইসলাম আক্ষরিক

---

[১০৫] Robert C. Davis, Christian slaves, Muslim masters

[১০৬] ড. মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ, মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা, ধারা ৪৪৭

অর্থেই দাসব্যবস্থার মাধ্যমে বংশবিস্তার করেছে। (Islam was literally being reproduced through the institution of slavery)[১০৭]

১৭৯১ সালের ৪ আগস্ট উসমানী সুলতান ৩য় সেলিম ও অস্ট্রিয়ার মাঝে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (treaty of Ziștovi)। চুক্তির শর্ত মোতাবেক সাম্প্রতিক যুদ্ধগুলোর যুদ্ধবন্দি-বিনিময়ের একটা উদ্যোগ নেয়া হয়। তুরস্কের বুর্সা (Bursa) শহরের এক কোর্ট ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে যেখানে সুলতান সেলিম বুর্সার কাযীকে (প্রধান বিচারক) আদেশ দিয়েছেন: শহরের সকল অস্ট্রীয় দাসকে আদালতে ডাকা হোক। তাদের মাঝে যারা কোনো জবরদস্তি ছাড়া ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে মনিবের কাছে রাখা হোক। আর যারা খ্রিস্টান রয়ে গেছে তাদেরকে অস্ট্রীয় কর্মকর্তাদের কাছে ফেরত পাঠানো হোক। কোর্টের কাগজে রিপোর্ট লেখা হয়েছে: ২৯ জন অস্ট্রীয় দাস ও ৩৫ জন অস্ট্রীয় দাসীকে মনিবের কাছে ফেরত দেয়া হয়েছে। মাত্র ১৯ জনকে নিজ দেশে পাঠানো হয়েছে। অর্থাৎ অস্ট্রীয় দাসদের মাঝে ইসলাম গ্রহণের হার ৭৭%, মাত্র ৩-৪ বছরের মধ্যে। তুর্কী ইতিহাসবিদগণ বুর্সা শহরের দাস রেজিস্ট্রি থেকে Random selection এর মাধ্যমে ২২১ জন দাসের তথ্য নিয়ে দেখলেন, তাদের মাঝে ১৯৯ জন (প্রায় ৯০%) ইসলাম গ্রহণ করেছে। [১০৮]

লন্ডন ভার্সিটির এরাবিক স্টাডিজের প্রোফেসর প্রাচ্যবিদ টি. ডব্লিউ আর্নল্ড তাঁর 'The Preaching of Islam' গ্রন্থে বলেন: [১০৯]

> “ অনেক ধার্মিক ক্রীতদাস স্বীকার করেন যে, **দাসত্ব তাদেরকে সত্য ধর্মের দিকে হিদায়াতের দিশাপ্রাপ্তির সুযোগ করে দিয়েছে।** নীলনদের উজানে (সাব-সাহারান) নানা দেশের অনেক নিগ্রোর সাথে Charles Montagu Doughty (১৮৪৩–১৯২৬)-এর দেখা হয়েছে আরবদেশে। তিনি দেখেছেন যে, দাসে পরিণত হওয়ায় ঐ সব আফ্রিকানের মধ্যে কোনো ক্ষোভ নেই... ... এমনকি নিষ্ঠুর দাস-শিকারীরা পিতামাতা থেকে তাদেরকে ছিনিয়ে নেবার পরও। তাদের (মুসলিম) মনিবরা তাদের মূল্য পরিশোধ করে নিজ গৃহে তাদের স্থান দিয়েছে। পুরুষদের খতনা করানো হয়েছে এবং তাদের অনেককে শেষ পর্যন্ত মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ঘরে ফেরার দীর্ঘ ব্যাকুলতায় আল্লাহ যেন তাদের দুর্ভাগ্যে সাড়া দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাদের কথা হল:
>
> “ এটা (দাসজীবন) ছিল তাঁর রহমত। কেননা এর মাধ্যমে তারা নাজাত-

---

[১০৭] Slavery in The Islamic World, Ed. Mary Ann Fay

[১০৮] Osman Cetin (2001), Slavery and Conversion of the Slaves to Islam in the Ottoman Society: According to the Canonical Registers of Bursa between XVth and XVIIIth Centuries, Uludug University İlahiyat Fakültesi Dergisi, Vol.10:1

[১০৯] দি প্রিচিং অব ইসলাম ই.ফা. পৃষ্ঠা ৪৬৫

দানকারী ধর্মে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। তারা মনে করে, এটাই তাদের জন্য ভালো দেশ। এখানে তারা এখন মুক্ত মানুষ। এদেশের সমাজ জীবন অধিক সভ্য। 'দুই পবিত্র স্থানের' দেশ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেশ। এজন্য তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে যে, কোন এক সময় দাস হিসেবে তাদেরকে এখানে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল'।[১১০]

২য় বিশ্বযুদ্ধের পর ৩ বছর ফ্রান্সে বাধ্যশ্রম দিয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ জার্মান যুদ্ধবন্দি। যার মাঝে ৪০ হাজার মারা যায় রোগে-অনাহারে। তবে কিছু ক্ষেত্রে নিজের যুদ্ধ-পর্যুদস্ত দেশের চেয়ে, আমেরিকান আর সোভিয়েত ক্যাম্পের চেয়ে কিছু জার্মান সেনা ফ্রান্সেই ভালো ছিল, এটা সত্য। যে লক্ষাধিক সেনাকে রাস্তাঘাট নির্মাণ বা শিল্প কারখানায় না খাটিয়ে কৃষিক্ষেত্রে লাগানো হয়েছিল, তারা খাবারটাবারও ভালোই পেতো, আর ফরাসি জনগণের কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেয়েছিল। ইতিহাসবিদ Fabien Theofilakis, যাঁর গবেষণাই ফ্রান্সে জার্মান যুদ্ধবন্দি নিয়ে, তিনি জানান: [১১১]

> “ যখন জার্মান বন্দিরা ফরাসি জনগণের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়ালো, তখন হঠাৎ করে একদিন তারা দেখল, তাদের আর ঘৃণ্য 'নাৎসী' হিসেবে দেখা হচ্ছিল না। তাদের পরিচয় ছিল, মর্যাদা ছিল। এটা একটা বিরাট ব্যাপার! ... ফরাসিরা সবচেয়ে দারুণ যেটা দিয়েছিল যুদ্ধবন্দিদেরকে, সেটা হল ফরাসিদের সাথে একসাথে থাকার সুযোগ। একসাথে ওঠাবসা করার সুবাদে জার্মানরা বুঝতে পেরেছিল যে, নাৎসীরা তাদেরকে মিথ্যে ভুলভাল বুঝিয়েছিল ফ্রেঞ্চদের ব্যাপারে।

আসলে মানুষের মনস্তত্ত্ব তো চিরকাল একই। ফরাসিদের সাথে এক সমাজে থাকার ফলে জার্মানদের যেমন ভুল ভেঙেছে, ঠিক একইভাবে মুসলিম সমাজে থেকে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ভাঙতো অমুসলিম দাসদের, তারা ভালো আচরণও পেত, ছিল সামাজিক অবস্থানও। ইসলামের এই প্রধান লক্ষ্যটা যুদ্ধবন্দিদেরকে ক্যাম্পে রেখে সম্ভব ছিল না। বরং ক্যাম্পে যুদ্ধবন্দিরা যে মানবেতর জীবন যাপন করেছে, তা কোনো কনভেনশন দিয়েই ঠেকানো যায়নি। কনভেনশনে দেয়া সুবিধাগুলো স্থগিত করার জন্য এসব কনভেনশনের রচয়িতাগণই আবার একাট্টা হয়ে চুক্তি করে, বাহানা করে কনভেনশন ভেঙেছে। যার মূল্য চুকিয়েছে লক্ষ লক্ষ যুদ্ধবন্দি তাদের জীবন দিয়ে। এগুলো আমরা সামনে দেখবো ইনশাআল্লাহ।

দাসপ্রথার কিছু কৌশলগত উপযোগিতা ছিল, যা ইসলাম ব্যবহার করেছে তার লক্ষ্য অর্জনে। যেমন—

---

[১১০] Charles Montagu Doughty, Travels in Arabia Deserta (1888), ১/৫৫৪-৫

[১১১] Deutsche Welle, After WWII, German POWs were enlisted to rebuild France

উপযোগিতা ১: যুদ্ধ এড়ানো

অপরাধবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের একটা পরিভাষা হল Deterrence। এর অর্থ 'শাস্তি দিয়ে বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে' সম্ভাব্য অপরাধীকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখা [১১২] (preventive effect upon potential offenders)। **আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর অর্থ হল: ভয় দেখিয়ে বড় ক্ষতি এড়ানো** (block or reduce the inflicting of serious harm) [১১৩]। 'যুদ্ধে পরাজিত হলে দাসত্ব বরণ করতে হবে'— এই ভয়টা কাজে লাগিয়ে বহু যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হত। এজন্যই আমরা দেখি আওতাসের যুদ্ধের পর আরব গোত্রগুলোর সাথে নবিজির আর কোনো যুদ্ধ হয়নি। তাবুকের অভিযানেও আয়লা, জরবা, আযরুহ, দুমাতুল জান্দালের আরব খ্রিস্টান গভর্নররা যুদ্ধ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করেছে। পরের বছর ছিল প্রতিনিধিদলের বছর, একের পর এক আরব গোত্র নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকে।

বড় বড় সাম্রাজ্য ছাড়া সেসময় ছোট ছোট দেশে বা গোত্রীয় ব্যবস্থায় আর্মি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ছিল না, মানে নিয়মিত বাহিনী বলতে আমরা যা বুঝি, ব্যাপারটা তেমন ছিল না, বা থাকলেও তার সংখ্যা সীমিত। যুদ্ধের সময় নানান শ্রেণিপেশার মানুষ যুদ্ধে যেত। এখনো অনেক দেশে সব যুবকদের বাধ্যতামূলক মিলিটারি সার্ভিস দিতে হয় কিছু সময়, যেন যুদ্ধের সময় যে কেউ অংশ নিতে পারে। একে বলে কন্সক্রিপশন (conscription/draft)। বাংলাদেশ সহ ১০৫ টা দেশে এই নিয়মটা নাই। বাকি দেশগুলোতে বিভিন্ন মেয়াদে এই বাধ্যতামূলক সামরিক সার্ভিস দিতে হয়। [১১৪]

- যেমন রাশিয়া, সুইডেন, মঙ্গোলিয়া, তুরস্ক, গ্রীস, ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলোতে ১ বছর
- কম্বোডিয়া, লাওস, জর্জিয়া, কুয়েত, মিশরে দেড় বছর
- আফ্রিকার দেশগুলোতে ২ বছর
- ইসরায়েলে পুরুষের ৩২ মাস মেয়েদের ২ বছর
- উত্তর কোরিয়ায় পুরুষের ১১ বছর মেয়েদের ৭ বছর

---

[১১২] John C. Ball (1955), The Deterrence Concept In Criminology And Law, Journal Of Criminal Law And Criminology, vol 46, p347 [north-western university school of law]

[১১৩] Morgan, P. (2017, July 27). The Concept of Deterrence and Deterrence Theory. Oxford Research Encyclopedia of Politics.

[১১৪] Wikipedia contributors. (2021, July 1). Military service. In Wikipedia, The Free Encyclopedia.

- দক্ষিণ কোরিয়ায় ৬ বছর

তো সেসময় সামন্তরাজারা নিজ নিজ প্রজাদের ভিতর থেকে বাহিনী গঠন করে রাজাকে সাপ্লাই দিত। 'দাস হবার ভয়ে' (Deterrence) নিয়মিত বাহিনী ছাড়া অন্য পেশাজীবী সক্ষম পুরুষদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধে আসবে না। নিয়মিত বাহিনীর সদস্যও না এসে পালিয়ে যেতে পারে। ঝামেলায় যাওয়ার চেয়ে বেসামরিক হয়ে থাকাই নিরাপদ। এখানে একটা পয়েন্ট হল, যারা সিভিলিয়ান মানে বেসামরিক বিধর্মী তাদের জান-মাল-পরিবার কিন্তু ইসলামী যুদ্ধনীতিতে মোটাদাগে নিরাপদ। শহর অবরোধের ক্ষেত্রে কিংবা মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হলে ভিন্ন কথা। কুরআনের এই আয়াত এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য:

> “ আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। [সূরা বাকারা ২: ১৯০]

সুতরাং বিভিন্ন পেশাজীবী যারা যুদ্ধ করতে চলে আসতো, এই Deterrence-এর ফলে অনেক কাফিরের যুদ্ধে না যাবার একটা সুযোগ ছিল। সুতরাং দাসপ্রথা ইসলামে একটি চমকপ্রদ যুদ্ধনীতি। যুদ্ধ করব একজনের সাথে, অন্য দশ জন যুদ্ধ করার ইচ্ছে ত্যাগ করবে। যুদ্ধ এড়ানোর কৌশল— যুদ্ধ হবে একটা, কিন্তু ভয় পাবে আরো যারা যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করতো সবাই। যুদ্ধের মত একটা ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটার চেয়ে ভয় দেখিয়ে যদি ঘটনাটা এড়ানো যায় তাহলে বেশি ভালো না? একই প্রতিবিধান ইসলাম অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রেও করে থাকে— জনসম্মুখে শিরশ্ছেদ, ব্যভিচারের শাস্তি রজম বা লোকসম্মুখে চাবুকপেটা। উদ্দেশ্য হল Deterrence বা ফিরিয়ে রাখা।

উপযোগিতা ২: প্রাণক্ষয় কমানো

যুদ্ধের সময় মানুষের সাইকোলজি বদলে যায়। স্বাভাবিক সময়ে একজন মানুষ যেভাবে চিন্তা করে, মানবযুক্তি যেভাবে কাজ করে, যুদ্ধের ময়দানে এড্রেনালিন রাশের সময় তা করে না। চিন্তাগুলো, যুক্তিগুলো, অনুভূতিগুলো বদলে যায়। বাস্তবজীবনেও আপনি বুঝতে পারবেন। হাড্ডাহাড্ডি উত্তেজনাপূর্ণ খেলার সময় একটুতে একটু হলেই মারপিট বেধে যায়। ঝগড়ার সময় মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। এগুলো এড্রেনালিন রাশের হরমোনগত কারণে। যুদ্ধের সময়ও ঠিক তাই।

যুদ্ধে যে মানুষগুলো বন্দি হতো, তাদের সাথে ইতিহাসে কেমন আচরণ করা হয়েছে,

তা আমাদেরকে বুঝতে হবে। তাহলে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জয়ী এবং পরাজিতের সাইকোলজিটা (War Psychology) আমরা ধরতে পারব। যুদ্ধবন্দিদের সাথে যা যা করা হত—

১. গণহত্যা

বন্দিকে হত্যা করা হতো নির্বিচারে, যোদ্ধা-অযোদ্ধা-নারী-শিশু-বৃদ্ধ সবাইকে। একটা শহর দখল করে পুরো শহরই হত্যা করা হত। এটা করতো মোঙ্গলরা (তাতারী)। এটা শত্রুর মনে ত্রাস সৃষ্টির জন্য করা হত। এটাও Deterrence সৃষ্টির একটা কৌশল, লোমহর্ষক কৌশল। University of Maryland-এর প্রফেসর এমিরেটাস George H. Quester লেখেন:

> “ যুদ্ধবাজ হিসেবে এবং সেইসাথে নিষ্ঠুর হিসেবেও মোঙ্গলরা কুখ্যাত ছিল। অবরোধের পর দুর্বল শহরগুলোতে ম্যাসাকার চালানো হত। খুব যে শক্ত প্রতিরোধ শহরগুলো করতে পারত, তা না। মনে হয়, ত্রাস থেকে এক রকম অসাড় ও অবশ হয়ে পড়ত তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা। অসফল প্রতিরোধ শহরের পুরো আবাদী শেষ করে দেবে, এই ভয়টা থেকেই তারা বাধা দেবার সাহস পেত না। মোঙ্গলরাই এভাবে পেয়ে যায় আক্রমণের সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্রটা— কেবল ত্রাস সৃষ্টি করে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ (psychological warfare). [১১৫]

Edward Gibbon এর মতে [১১৬], চেঙ্গিস খানের আমলে (১২০৬-২৭) মাত্র ২১ বছরে শহরপ্রতি হত্যা করা হয়েছে:

শহর	নিহতের সংখ্যা
মধ্য এশিয়ার ৩ শহরে	সাড়ে ৪৩ লক্ষ
মার্ভ শহরে	১৩ লক্ষ
হেরাত শহরে	১৬ লক্ষ
নিশাপুর শহরে	সাড়ে ১৭ লক্ষ
খাওয়ারিজম রাজ্যে	দেড় লক্ষ
বাগদাদ শহরে	৯০ হাজার খুলি দিয়ে পিরামিড বানানো

অন্যান্য ইতিহাসবিদদে মতে, মোট দেড় কোটি থেকে ৬ কোটি লোক নিহত হয়

[১১৫] Quester (2003), Offense and Defense in the International System, p43
[১১৬] Edward Gibbon, Decline & Fall of the Roman Empire, vols.3 & 6

মোঙ্গলদের হাতে [১১৭]।

২. দাস বানানো

পরাজিত সেনাদের আটক করা হতো। এরপর হয় দাস বানিয়ে বিজয়ী সেনাদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া (Enslavement) হতো। নয়তো মুক্তিপণ (ransom) নিয়ে ছেড়ে দেয়া হতো, কিংবা বন্দি বিনিময় করা হতো। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের জনক Hugo Grotius ১৬২৫ সালে একটা কথা বলেছেন:

> " The victor has the right to enslave. [De jure belli ac pacis (1625; On the Law of War and Peace)] [১১৮]

অর্থাৎ, বিজয়ীর অধিকার আছে দাস বানানোর। তিনি একথা বলছেন ১৭শ শতকে, আমেরিকা দাসপ্রথা এবোলিশ করেছে ১৯শ শতাব্দীতে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টরা ছিলেন বড় বড় দাসমালিক। হেগেলরা বলেছেন ১৮৩০ সালে। ধরেই নিচ্ছি ইসলামের দাসপ্রথা বহাল রাখার পিছনে কোনো ঐশী প্রজ্ঞা নেই, নিরেট বস্তুবাদী ইতিহাস পাঠের নিরিখে দেখলেও এটা কীভাবে আশা যায় যে, ১৭ শ শতকে যে ধারণা টিকে আছে, ৭ম শতাব্দীতে বসে অর্থাৎ ১০০০ বছর আগে ইসলাম তা বিলোপ করবে? ইসলামবিদ্বেষীরা যখন বলে, ইসলাম কেন দাসপ্রথা এবোলিশ করলো না— এটা কি ইতিহাসের সাথে তামাশা ছাড়া আর কিছু? এই ফাতরামিকে বলে Presentism, মানে হল বর্তমানের খাপের ভিতরে অতীতকে বিচার করা। যাই হোক, ইসলাম আমাদের কাছে অতীত না, ইসলাম আমাদের কাছে বর্তমান এবং ভবিষ্যত, কিয়ামত অব্দি।

যা হোক, ইতিহাসে এই দুটো আচরণই হয়ে এসেছে যুদ্ধবন্দিদের সাথে। আধুনিক সভ্যতা যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ যে অর্জন দেখিয়েছে, তা হল 'জেনেভা কনভেনশান'। কেমন আচরণ বিজয়ী করবে পরাজিতের সাথে যুদ্ধের মাঠে, সেটার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এতে। প্রথম দুটো কনভেনশন (১৮৬৪ ও ১৯০৬) ছিল মূলত যুদ্ধকালীন কিছু নৈতিক মূল্যবোধকে সামনে নিয়ে, যেমন যুদ্ধবন্দিকে হত্যা না করা, রোগী-আহতদেরকে 'নিরপেক্ষ' মনে করা ইত্যাদি। ১৯২৯ সালে ৩য় জেনেভা কনভেনশান প্রধানত prisoners of war (POW) বা যুদ্ধবন্দিদের বিষয়ে কিছু

[১১৭] necrometrics.com

[১১৮] Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2018, December 11). Prisoner of war. Encyclopedia Britannica.

rules & regulations তৈরি করে ১ম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে নতুন করে ৪র্থ কনভেনশন বানানো হয়। ১৮০টি দেশ এতে স্বাক্ষর করে। তাও হয় না, ১৯৭৭ সালে আরও দুটো ধারা যুক্ত করা হয় যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের আওতায় আনার ব্যাপারে। [১১৯]

এখন আমরা দেখবো, একের পর এক এসব কনভেনশন যুদ্ধবন্দিদের রক্ষা করতে পেরেছে কি না। যদি না পারে, তাহলে কেন পারেনি।

[১১৯] Malcolm Shaw (March 04, 2020). Geneva Conventions 1864–1977. Encyclopedia Britannica [Sir Robert Jennings Professor of International Law, University of Leicester, England]

জেনেভা কনভেনশন ১৯২৯

জেনেভা কনভেনশন পড়লে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবেন— আহ! কী মহান। এরা তো মানুষ না, সাক্ষাৎ ফেরেশতা। ইউরোপের রাষ্ট্রদর্শন, অর্থদর্শন পড়লে দেখবেন বলা হচ্ছে: মানুষ স্বার্থপর ও বদ, তাই শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রয়োজন। যে রাষ্ট্র তাদের স্বেচ্ছাচারিতা দমন করে বিকাশ নিশ্চিত করবে। অর্থদর্শনে বলা হচ্ছে: মানুষকে নিজ সীমাহীন চাহিদা পূরণের সুযোগ দিতে হবে, মানুষ স্বার্থপর ও ভোগমনা। কিন্তু যুদ্ধে এসে আপনি দেখবেন উল্টো, যেন যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ আর স্বার্থপর নেই, আর টিকে থাকার প্রতিযোগিতা নেই, এখানে সবাই সাধু, সবাই পরোপকারী-সৎ-নিষ্ঠাবান। নিজে যা খায়, অপরকে তাই খাওয়ায়।

পরিশিষ্ট-১ এ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রতিটি ধারার সারমর্ম বা মূল বক্তব্য দেয়া রইল। বাস্তবতা হল, কোনো রাষ্ট্রই এই রুলস মানে নি। খাতাকলমে মুখরোচক আইন হিসেবে রয়ে গেছে। ইতিহাসের দিকে তাকালেই আমরা দেখবো জেনেভা কনভেনশান এ অংশ নেওয়া রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধবন্দিদের উপর কতটুকু কনভেনশন মেনেছে। চলুন নিয়ে যাই আপনাদের।

১. যুদ্ধবন্দিদের কাজে নিয়োগ (forced labour)

আটককারী রাষ্ট্র যুদ্ধবন্দিদের দ্বারা কাজ নিতে পারবে। কাগজ কী বলছে দেখুন।

পর্ব ৩: যুদ্ধবন্দিদের কাজ

২৭. অফিসার ছাড়া বাকিদেরকে কাজে নিয়োগ করা যাবে। শুধু দেখভাল-টাইপ কাজে (supervisory) বাধ্য করা যাবে। কাজ করতে গিয়ে আহত হলে, ক্ষতিপূরণ পাবে।

২৮. বন্দিদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হলে, সকল দায়দায়িত্ব বহন করবে বন্দিকারী বাহিনী।

২৯. সাধ্যাতীত কাজে লাগানো যাবে না।

৩০. বেসামরিক লোকদের মত কর্মঘণ্টা। সপ্তাহে রবিবার ছুটি।

৩১. সামরিক যেকোনো কাজে লাগানো যাবে না।

৩২. অস্বাস্থ্যকর বা ঝুঁকিপুর্ণ কাজে লাগানো যাবে না।

৩৩. ক্যাম্পের মতই স্বাস্থ্যকর ও ফ্যাসিলিটি থাকতে হবে শ্রমিক-ক্যাম্পে। বন্দি ক্যাম্পের কাছাকাছি হতে হবে।

৩৪. ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের কোনো কাজে লাগালে বেতন পাবে না। অন্যান্য কাজে যুদ্ধরত উভয় পক্ষ ঠিক করবে যুদ্ধবন্দিদের বেতন। যতদিন ঠিক না হচ্ছে, ততদিন বন্দিকারী বাহিনীর সমানই বেতন পাবে।

- ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুদ্ধবন্দি-কেন্দ্রিক সব সিদ্ধান্তগুলো আমেরিকা একাই নিত, বাকিরা কেবল তামিল করত। কেবল ৩টা সিদ্ধান্ত ছিল সম্মিলিত, ৩টাই জেনেভার লঙ্ঘন। জেনেভার মূল কুশীলবরাই একাট্টা হয়ে নিজেদের করা কনভেনশন ভেঙেছে—

  ১. রেডক্রস প্রতিনিধিদের আমেরিকা-বৃটিশ-কানাডীয় ক্যাম্পে ঢুকতে না দেয়া।

  ২. ইউএস-ইউকে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, দেশ পুনর্গঠনে খাটানোর জন্য ফ্রান্সকে যুদ্ধবন্দি দেয়া হবে (reparation labour)

  ৩. বন্দিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বন্দি দেয়া হবে সোভিয়েতকে (একই উদ্দেশ্যে)। অথচ সোভিয়েত জেনেভায় সই করেনি, আমেরিকা জেনেভা কনভেনশনের উদ্যোক্তাদের একজন। এই আশায় বহু জার্মান বন্দি সোভিয়েত রেড আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ না করে ইস্টার্ন ফ্রন্ট থেকে পালিয়ে এসে আমেরিকানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। জেনেভা কনভেনশনের ৩(৮) ধারায় ছিল অন্যত্র সরাতে হলে বন্দিদের সম্মতি ছাড়া সরানো যাবে না। কোথায় নেয়া হচ্ছে, কেন, এসব জানাতে হবে। অসুস্থ হলে সরানো যাবে না। আমেরিকার অধীন বন্দিরা অধিকাংশই ছিল অসুস্থ। সামনে দেখব আমরা।

- ১৯৪৪ সালে মিত্রপক্ষীয় 'ইয়াল্টা কনফারেন্স'- অনুসারে মিত্রপক্ষ জার্মান বন্দিদের দিয়ে দেশ পুনর্গঠন করবে। এবং ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত এদেরকে বাধ্যশ্রমে (slave labour) লাগানো হয়েছিল [১২০]। কাজ করানো হয়েছে খনিতে, শিল্প

[১২০] Eugene Davidson "The death and life of Germany: an account of the American occupation". p.121

"In accordance with the Yalta agreement, the Russians were using slave labor of millions of Germans and other prisoners of war and civilians'".

স্থাপনা নির্মাণে ইত্যাদি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে। অথচ কনভেনশনে ছিল সশস্ত্র মোকাবেলা শেষ হওয়া মাত্র দ্রুত নিরপেক্ষ ভূমিতে বন্দিদেরকে সরানো হবে। তারাই এসব কনভেনশন করে, তারাই চুক্তি করে একসাথে মিলে ভাঙে। তাদের স্বার্থে যা যা করা দরকার তা-ই করে, এসব কনভেনশনটন তাদের জন্য না।

সোভিয়েতনামা

১৯৪৫ সালে সোভিয়েতের হাতে ছিল ২৮ লক্ষ জার্মান যুদ্ধবন্দি। এদের লাগানো হয়েছিল বিধ্বস্ত সোভিয়েত পুনর্গঠনে। যার মাঝে মরে গেছে সোভিয়েত রেকর্ড মতেই সাড়ে ৪ লাখ [১২১]। জোয়ান সেনা ৪ লাখ মরা মানে বুঝে নিতে হবে। শুধু তাই নাকি? পূর্ব ইউরোপের জাতিগত জার্মান সংখ্যালঘু সিভিলিয়ানদেরও জোরপুর্বক তুলে এনে সোভিয়েতে খাটানো হয়, আর দখলকৃত পূর্ব জার্মানির সিভিলিয়ানদেরকেও, এমনকি নারীদেরকেও। রাশিয়ান আর্কাইভ-ই বলছে: [১২২]

কোন দেশ থেকে	কত জন সিভিলিয়ান	
	রাশিয়ান আর্কাইভ অনুসারে	Schieder commission-এর মতে
পোল্যান্ড	১,৫৫,২৬২	২,১৮,০০০
রোমানিয়া	৬৭,৩৩২	৭৫,০০০
হাঙ্গেরি	৩১,৯২০	৩০-৩৫ হাজার
যুগোশ্লাভিয়া	১২,৫৭৯	২৭-৩৫ হাজার
দখলকৃত জার্মানি	৪,৫৭৯	
মোট	২,৭১,৬৭২ জন	
১৯৪৯ সালে ফেরত	২,০১,৮৬৪	
মৃত	৬৬,৪৫৬	১, ২০,০০০
১৯৪৯ ডিসেম্বর অব্দি রয়ে গেছে	৩,৭৫২	

আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন: তুলে এনে এভাবে কাজে লাগানো-কে কী বলে?

[১২১] G. I. Krivosheev. Soviet Casualties and Combat Losses. Greenhill 1997 ISBN 1-85367-280-7 Pages 276-278

[১২২] Pavel Polian-Against Their Will: The History and Geography of Forced Migrations in the USSR Central European University Press 2003 Pages 293-295

দাসপ্রথার সাথে এর পার্থক্যগুলো কী কী? তাহলে আমরা কেন বলছি যে, পশ্চিমা সভ্যতা দাসপ্রথাকে বিলোপ করেছে? আচ্ছা সোভিয়েত বাদ দেন, সোভিয়েত সই করেনি জেনেভা কনভেনশনে, তাদের মানারও অত দায় নেই। কিন্তু ফ্রান্স?

ফ্রান্স-নামা

পুরো ফ্রান্স জুড়ে ১০০-এর বেশি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। ১০ লক্ষ জার্মান যুদ্ধবন্দি যুদ্ধশেষে ৪-৫ বছর ফ্রান্সে বাধ্যশ্রম দিয়েছে, যদিও কনভেশন মোতাবেক যুদ্ধ থামলেই তাদের হস্তান্তর করার কথা। বেশিরভাগই এসেছে আমেরিকান ক্যাম্পগুলো থেকে। ফ্রান্স চেয়েছিল ১৭ লাখ। আরেক হিসেব বলছে, আমেরিকা দিয়েছে ১৩ লাখ। সিপাহী Heinz T. ছিল তাদের একজন। সে বলছে:

> “ চারপাশে দেখছি হাড় জিরজিরে লোকজন, ক্ষুধার কারণে শরীরে পানি এসে গেছে কারও কারও, শতচ্ছিন্ন কাপড়, নোংরা, পাংশু চেহারা, টলমল পা ফেলছে... ফরাসিদের দেবার জন্য আজীব গিফট।

ইতিহাসবিদ Fabien Theofilakis, যাঁর গবেষণাই ফ্রান্সে জার্মান যুদ্ধবন্দি নিয়ে, তিনি জানিয়েছেন: ৪০ হাজার বন্দি মারা যায় অনাহারে-অর্ধাহারে। [১২৩] খুব কনভেনশন হয়েছে।

১৯৪৭ এর দিকে আমেরিকা খুব চাপ দিচ্ছিল এদের ছেড়ে দেবার জন্য, কেননা স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সোভিয়েত পূর্ব জার্মানি প্রতিষ্ঠার জন্য বন্দিদের ছেড়ে দিচ্ছে। একটা অংশকে কম্যুনিস্ট বানিয়ে। এখন এদেরকে ছেড়ে দিয়ে পশ্চিম জার্মানি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ১৯৪৮ এর শেষাশেষি সবাইকে পাঠিয়ে দেবার কথা থাকলেও এই সস্তা শ্রম কি হাতছাড়া করা যায়? ফ্রান্স বলল এখন থেকে তোমাদের পারিশ্রমিক দেয়া হবে, কে কে থাকবা বল। ১,৩৭,০০০ বন্দি পেল সিভিলিয়ান শ্রমিকের মর্যাদা। তাহলে এতোদিন (৩ বছর) কী ছিলো এরা? কী ছিল এদের সামাজিক মর্যাদা? রাষ্ট্রীয় দাস? তাহলে কনভেনশন যে বলল সমান বেতন দেবে?

২. যুদ্ধবন্দিদের ভরণপোষণ

কনভেনশনের ধারা অনুসারে:

---

[১২৩] Deutsche Welle, After WWII, German POWs were enlisted to rebuild France

৯. বন্দিদেরকে বন্দিকারী পক্ষ ভরণপোষণ দেবে। অফিসারদের, নারীদের, অসুস্থদের, টেকনিক্যালদের আলাদা সুবিধায় রাখতে হবে।

১০. তাদের আবাসন মান, জনপ্রতি স্থান সংকুলান, বিছানাপত্র হতে হবে হেফাজতকারী বাহিনীর মতোই।

১১. বন্দিকারী বাহিনীর সমান খাদ্য বরাদ্দ থাকতে হবে। পর্যাপ্ত পানি ব্যবহার, ধূমপানের সুযোগ।

১২. বন্দিকারী পক্ষ বন্দিদেরকে পোশাক, জুতো, অন্তর্বাসের ব্যবস্থা করবে। রেগুলার সেগুলো পরিবর্তন করবে। ক্যান্টিন থাকতে হবে, ক্যান্টিনের লাভও বন্দিদের জন্য ব্যয় হবে।

২২. অফিসার বন্দিদেরকে ভাতা দেবে বন্দিকারী বাহিনী।

২৩. বন্দি অফিসাররা বন্দিকারী বাহিনীর একই র‍্যাঙ্কের সমান বেতন পাবে। মাসের বেতন মাসে দেয়া। কোনো কাটা যাবে না নিজেদের খরচ বাবদ। এটা যুদ্ধ শেষে বন্দির পক্ষ পরিশোধ করে দেবে। (কিন্তু সে পর্যন্ত তো খরচ করতে হবে। আর যদি ভূখণ্ড একীভূত করে নেয়া হয়, সেক্ষেত্রে বন্দির নিজ দেশ বলে আর কোনো অথোরিটি থাকে না, যারা তাকে বুঝে নিবে একদিন)

তাহলে বলা হল যে: যুদ্ধবন্দিদেরকে ডিটেনশান ক্যাম্পে রাখা হবে, যাতে তারা আবার আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে (regroup) না পারে। তাদেরকে এখানে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা দেওয়া হবে। যতদিন না যুদ্ধ শেষ হয়। বিবেক দিয়ে একটু চিন্তা করেন তো, এটা কি আদৌ লজিক্যাল আর বাস্তবসম্মত? যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধ করতে এসেছে, সেই রাষ্ট্র এদেরকে অর্থ খরচ করে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে? তাও আবার যতদিন না যুদ্ধ শেষ হয়, ৫ বছর লাগলে ৫ বছরই খাওয়াবে? এর চেয়ে তো মেরে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত, পয়সা বেঁচে যেত। বাস্তবেও ঠিক সেটাই হয়েছে।

- ২য় বিশ্বযুদ্ধে জাপান তো গোপন সরকারি আদেশই দিয়ে দিয়েছে: সব যুদ্ধবন্দিদের হত্যা করে গার্ডদের পালিয়ে যাবার বৈধতা দিয়ে। [১২৪]

- কানাডার মিলিটারি হিস্টরি ম্যাগাজিন Legion অকপটে স্বীকারই করেছে:

> “যুদ্ধক্ষেত্রে সেনারা বন্দিদের হত্যা করেই থাকে, হয়ত তার কোনো সতীর্থ নিহত হবার রাগে, কিংবা বন্দিকে টানার ঝামেলামুক্ত হতে। এসব যুদ্ধে সবসময়

[১২৪] Taiwan Documents, Order Telling Guards to Flee to Avoid Prosecution for War Crimes Order to Kill All POWs.

হয়েই থাকে। অবশ্যই কানাডীয় বাহিনীও আত্মসমর্পণের পরও জার্মান সেনাদের হত্যা করেছিল। [১২৫]

- আর আমেরিকা খোদ ৫০ লক্ষ জার্মান সেনাদেরকে PoW স্ট্যাটাসের বদলে Disarmed Enemy Forces (DEF) স্ট্যাটাস দিয়েছে, যাতে খাওয়ানোর ঝামেলা আমেরিকার উপর না বর্তায়। PoW বললে তো জেনেভা কনভেনশন মানতে হবে, নিজ সেনাদের সমান ফ্যাসিলিটি দিয়ে রাখতে হবে। বলা হল, এদেরকে খাওয়াবে জার্মান অথোরিটি (?)। ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষে জার্মান অথোরিটি-টা কে ভাই? ফলস্বরূপ নিদারুন অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পদ্ধতিগত গণহত্যার (methodological genocide) দ্বারা নিহত হল ১০ লাখ জার্মান যুদ্ধবন্দি। সামনে আরও বিস্তারিত আলোচনা আমরা করব, এবং ইসলামী দাসপ্রথার সাথে তুলনা করবো।
- মে, ১৯৪৩-এ যখন উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের হাতে লক্ষ লক্ষ জার্মান সেনা বন্দি হয়, তখন আইজেনহাওয়ারের অভিযোগের জবাবে আমেরিকার আর্মি চীফ George C. Marshall মন্তব্য করেছিলেন: আফসোস! আরও কিছু মেরে দিতে পারতাম। [১২৬]
- যে দেশ যুদ্ধবন্দিদের পালবে, তার নিজেরও তো সক্ষমতা থাকতে হবে। সে নিজেও তো যুদ্ধবিধ্বস্ত। নিজের সেনাদের পেলেপুষে আবার শত্রুসেনাদেরকেও সমান সুবিধা দিয়ে অনির্দিষ্টকাল পালো! একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের পক্ষে কীভাবে সম্ভব শত্রুপক্ষের লাখো সেনাকে নিজ সেনার মত প্রিমিয়াম সেবা দেয়া। এটাই কাগজ আর ময়দানের পার্থক্য। বললেই হলো? নিজের জনগণ সামলাতেই যে হিমশিম খাচ্ছে। ইতিহাসবিদ Fabien Theofilakis, যাঁর গবেষণাই ফ্রান্সে জার্মান যুদ্ধবন্দি নিয়ে, তিনি জানিয়েছেন: ৪০ হাজার বন্দি মারা যায় অনাহারে-অর্ধাহারে। যদিও প্রতিশোধ ইত্যাদির চেয়ে **যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সের সক্ষমতাই ছিল না এদেরকে কনভেনশন অনুযায়ী রাখার।** গরুর বগিতে করে আনা হত ওদের [১২৭]। ১৯৪৪

[১২৫] Legion Magazine (Canadian military history magazine) Was it right to commute Kurt Meyer's death sentence for killing Canadian PoWs? March 16, 2021

"Soldiers kill prisoners on the battlefield because they are angry a friend was killed or feel they can't escort a PoW to the rear. Such acts have always occurred in war. Certainly Canadian soldiers have killed surrendering Germans."

[১২৬] James Bacque, The Other losses

[১২৭] Deutsche Welle, After WWII, German POWs were enlisted to rebuild France

এর মার্চে অধিকাংশ বগি খুলে জার্মান বন্দিদের মৃত পাওয়া যেত, দমবন্ধ হয়ে। জি, এটাই হচ্ছে যুদ্ধের বাস্তবতা। এসিরুমে বসে জেনেভার মত বাফার শহরে বড় বড় তত্ত্ব কপচানোই যায়।

মাতবরনামা

যুদ্ধ তো আসলে বিজয়ীর জন্যও একটা অর্থনৈতিক চাপ। আমেরিকা নিজে যুদ্ধবিধ্বস্ত ছিল না, মূল ফ্রন্ট থেকে হাজার মাইল সাগর পেরিয়ে আমেরিকা। সেই আমেরিকাই যে ন্যাক্কারজনকভাবে জেনেভা কনভেনশন এড়িয়ে যাবার কায়দা করেছে, সেখানে ফ্রান্সের কাছে তো আশাই করা যায় না। পাঠক, এখন আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি এক অজানা ইতিহাসে। সভ্যতার আর কাগুজে মানবতার মুখোশের আড়ালে এক চেপে রাখা ইতিহাস।

১৯৮৯ সালে কানাডীয় গবেষক James Bacque লিখলেন *'The Other losses'*. সাত জন দুঁদে আমেরিকান ইতিহাসবিদ এর প্রতিবাদ করলেন, খণ্ডন লিখলেন। কিন্তু একজন সম্মতি দিলেন তাঁর দেয়া তথ্যগুলোয়। সেই একজন হলেন United States Army Center of Military History-এর সাবেক সিনিয়র ইতিহাসবিদ Colonel Ernest F. Fisher, যিনি ১৯৪৫ সালে জার্মানিতে আমেরিকান সেনাদের কীর্তিকলাপের তদন্তে জড়িত ছিলেন। তিনি লিখলেন এই বইয়ের ভূমিকা। পাঠক, ভয়ের জগতে প্রবেশ করছেন আপনি। Col. Fisher বলছেন ভূমিকাতে:

> “
> ৫০ লক্ষ জার্মান সৈন্য বন্দি ছিল আমেরিকা ও ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পগুলোয়, কাঁটাতার-জড়ানো খাঁচায়, গায়ে গায়ে লেগে... খোলা আকাশের নিচে, ন্যূনতম পয়ঃনিষ্কাশন ছাড়া, অনাহার-অর্ধাহারে শীঘ্রই মরা শুরু হল রোগে-ক্ষুধায়। ১৯৪৫ এর এপ্রিল থেকে আমেরিকান ও ফরাসি বাহিনী পদ্ধতিগতভাবে নির্বিচারে নিধন করল ১০ লক্ষ মানুষ, আমেরিকান ক্যাম্পেই বেশি। ৪ দশক ধরে আর্কাইভের ধুলোয় চাপা পড়ে আছে এই নজিরবিহীন ট্র্যাজেডি।

বইয়ের মূল বক্তব্যগুলো সংক্ষেপে আপনাদের সামনে পেশ করছি।

- ৪-১২ অব্দি রেডক্রসকে ঢুকতেই দেয়নি, যেটা কনভেনশন মোতাবেক হওয়ার কথা ছিল। রেডক্রস তাদের ওয়েবসাইটে লিখেই রেখেছে:

> “
> **মিলিয়ন মিলিয়ন** জার্মান সেনা বন্দি হয় জার্মানি আত্মসমর্পণের পর (৮ মে, ১৯৪৫)
>
> সেপ্টেম্বরের দিকে আমরা এসব ক্যাম্পে যাবার আবেদন করলাম। ফরাসি ও বৃটিশ

নিয়ন্ত্রিত অংশে আমাদের ঢুকতে দিল।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ এ ঢুকলাম আমেরিকান জোনে (৯ মাস পর)।

এপ্রিলে ঢুকলাম সোভিয়েত জোনে (১ বছর পর)।

আমরা যখন ঢুকলাম, তখন অল্প বন্দিকেই পেয়েছিলাম। যাই হোক, তাদেরকে রাখা হয়েছিলো ভয়াবহ অবস্থায়। [১২৮]

- লেখক বলছেন, ফ্রান্সে আমাদের রিসার্চ শেষে আমেরিকা ফিরলাম, পেনসিলভ্যানিয়ার আমেরিকার জাতীয় আর্কাইভে ঢুকলাম। সেখানে Weekly PoW and Disarmed Enemy Forces Report- শিরোনামে বেশ কিছু নথি পেলাম। প্রত্যেকটি রিপোর্টে 'Other Losses' নামে একটা শিরোনাম ছিল, যার নিচে আমেরিকা ও ফ্রান্সের পরিসংখ্যান পাশাপাশি। এই 'Other Losses' মানে কী? কে বলবে এর মানে কী? অনেকে বললো এর মানে হল: বন্দি ট্রান্সফার ও মুক্তি।

পেয়ে গেলাম মিত্রপক্ষের Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Forces (SHAEF)-এর Chief of the German Affairs কর্নেল Philip Lauben-কে, যিনি সেই সময় যুদ্ধবন্দি ট্রান্সফার ও ফেরতেরই দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বললেন:

– এর মানে হল 'মৃত্যু এবং পলায়ন'।

– কত জন পলায়ন করেছে?

– 'খুব, খুব সামান্য'। পরে আমি হিসেব করে দেখলাম ১ পার্সেন্টের ১০ ভাগের ১ ভাগ। অর্থাৎ other loss মানে পুরোটাই মৃত।

- ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫ এ ব্রিগেডিয়ার ডেভিস সতর্ক করেন মিত্রপক্ষের সর্বাধিনায়ক আইজেনহাওয়ারকে: 'বন্দিদেরকে PoW স্ট্যাটাস দেবার ফলে যে ব্যাপক সাপ্লাই চাহিদা দেয়া হচ্ছে, সেটা পূরণ করা সম্ভব হবে না'। [১২৯] মার্চের ১০ তারিখ আইজেনহাওয়ার উপরে অনুমতি চেয়ে চিঠি লেখেন যে, VE day (Victory in Europe, 8 May 1945) এর পর যত বন্দি আসবে সবাইকে (২০ লাখ) জেনেভা কনভেনশন বাইপাস করা যায়, এমন কোনো ক্যাটাগরিতে দেবার। প্রস্তাব অনুমোদন হয় এপ্রিল, ১৯৪৫-এ। শুধুমাত্র আমেরিকার হাতে বন্দিদের জন্য

[১২৮] ICRC in WW II: German prisoners of war in Allied hands, 02-02-2005

[১২৯] James Bacque, The Other losses , p24

'যুদ্ধবন্দি' (PoW) এর পাশাপাশি নতুন একটা ক্যাটাগরি করা হয়— Disarmed Enemy Forces (DEF)। এদের ব্যাপারে নীতিমালা হল:

...খ) DEF-দের খাদ্য ও ভরণপোষণের দায়িত্ব আমেরিকার না, জার্মানদের।

গ) শুধু যুদ্ধাপরাধী বা সন্দেহজনক যুদ্ধাপরাধীদের আমেরিকা রাখবে।

ঘ) DEF স্ট্যাটাসের ব্যাপারে কোনো প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়া হবে না।

বৃটিশরা এটা প্রত্যাখ্যান করে। এবং জানিয়ে দেয়, যাদেরকে 'জেনেভা কনভেনশন' মোতাবেক রাখতে পারবে না, তাদের রাখার জন্য এই টার্ম তারা ব্যবহার করবে না [১৩০]। আমেরিকা এই ক্ষেত্রে ব্রিটেনের সাপোর্ট চাচ্ছিল, কেন না তারা উভয়েই জানতো: এই স্ট্যাটাসের অধীনে বন্দি যারা হবে, তাদের পরিণতি মৃত্যু। তারা জেনেভা কনভেনশনকে এড়ানোর উপায় খুঁজছিল। General Hughs বলেছেন: 'আমার ধারণা, সবাই জেনেভা কনভেনশনের ভয়ে আছে'।

- অথচ ওদিকে আইজেনহাওয়ার বার বার দাবি করেছে যে,

> “ জার্মানদের যদি বোধবুদ্ধি থেকে থাকে, তাদের বোঝার কথা যে, ব্রিটেন ও আমেরিকার পুরো ইতিহাসই পরাজিত শত্রুর সাথে মহানুভবতার ইতিহাস। আমরা জেনেভা কভেনশনের সব আইন মেনে চলছি।

কেমন মেনে চলছে যে, ৩টার কোনোটাই দেয়া হয়নি।

১. বন্দিদেরকে ইউএস আর্মি ক্যাম্পের মত এক মানসম্পন্ন খাদ্য ও আশ্রয় দেয়া হবে।

২. তাদেরকে চিঠিপত্র আদান প্রদান করতে দেয়া হবে।

৩. রেডক্রসের প্রতিনিধিরা তাদেরকে ভিজিট করতে আসবে। কোনো অব্যবস্থা পেলে তা জার্মান বা আমেরিকান কর্তৃপক্ষকে নোটিশ করবেন। ৯ মাস অনুমতি দেয়া হয়নি।

চলুন পাঠক আপনাদের নিয়ে যাই, আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত বন্দি ক্যাম্পে। আমেরিকান মায়ের সন্তান আধা-জার্মান Charles von Luttichau বন্দি ছিল Kripp ক্যাম্পে। তার জবানিতে:

> খাদের উপর দিয়ে গাছের গুঁড়ি ফেলে দিয়ে টয়লেট বানানো ছিল। এক ক্ষীণকায় কিশোর তার ভিতর দিয়ে গলে পায়খানায় ডুবে মরেছে। হাত দিয়ে মাটিতে গর্ত করে তার ভিতর গাদাগাদি হয়ে ঘুমাতে হত। কেউ কেউ বেশি দুর্বলতার দরুন টয়লেট অব্দি যেতে পারতো না, কেউ কেউ তো প্যান্টও খুলতে পারতো না। কাপড়চোপড়, এমনকি মাটি পর্যন্ত দূষিত হয়ে ছিল। বৃষ্টি ছাড়া পানির আর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। একটা পাইপ দিয়ে পানি আসত, সেখান থেকে কয়েক ঢোক পেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকি সারা রাতও দাঁড়িয়ে

[১৩০] ibid, p27

থাকা লাগত। বৃষ্টি লাগাতার চলতো, আমার অবস্থানকালের অর্ধেকই কেটেছে বৃষ্টিতে ভিজে আর খাবার ছাড়া। বাকি দিনে খাবার পেতাম তাদের নিজেদের সেনা বরাদ্দের ১/১০ অংশ। আমি ক্যাম্প কমান্ডারকে বলেছিলাম যে, আপনারা তো জেনেভা কনভেনশন ভঙ্গ করছেন। সে আমাকে জবাব দিল:

> কনভেনশনের কথা ভুলে যাও, কোনো অধিকার নেই তোমাদের। [১৩১]

কয়েকদিনের মাঝেই দেখলাম সুস্থ-সবল যারা ঢুকেছিল, লাশ হয়ে বেরোচ্ছে। ট্রাকে ভরে লাশগুলো নিয়ে যেতো। ১৭ বছরের এক ছেলে কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে নিজের গ্রামের দিকে চেয়ে কাঁদত, একদম কাছে তার গাঁ, চোখে দেখা যেত। এক সকালে দেখি তার গুলিবিদ্ধ দেহ বেড়ার গোড়ায় পড়ে আছে। গার্ডরা লাশটা বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে রাখল সতর্কবাণী হিসেবে, যাতে আর কেউ পালাবার চিন্তাও না করে [তুলনীয়: কনভেনশন নীতি: পালানোর চেষ্টা কোনো অপরাধ বিবেচিত হবে না। শাস্তি হিসেবে শুধু নজরদারি বাড়ানো হবে, কোনো সুবিধা হরণ করা যাবে না]

সিপাহী Heinz-কে আমেরিকান সেনারা হাসপাতাল থেকে ধরে নিয়ে আসে Bad Kreuznach ক্যাম্পে। সেখানে লক্ষাধিক বন্দী ছিল with no roof, almost no food, little water, no mail... শীত থেকে বাঁচতে গর্ত খোঁড়া বা আগুন জ্বালানোর অনুমতি ছিল না। খাবার বলতে সহজলভ্য ছিল ঘাস। কেবল জার্মান সেনারাই না; ৬ বছরের শিশু, ৬০ বছরের বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারী। ফরাসিদের এক রিপোর্টে এসেছে রেজিস্টার্ড হয়েছে, আমেরিকা ১ লাখ লোক হস্তান্তর করেছে ফরাসিদের কাছে, তার মধ্যে ৩২৬৪০ জন নারী-শিশু-বৃদ্ধ।

আরেক বন্দি George Weiss জানিয়েছেন: এত গাদাগাদি, পা মেলে শুতে পারতাম না। সারে ৩ দিন অব্দি এক ফোঁটা পানি মেলেনি, নিজের পেশাব খেয়েছি আমরা। কেউ মাটি চেটেছে পিপাসায়। অথচ কাঁটাতারের ওপাশেই রাইন নদী।

Reinberg ক্যাম্পে বন্দি Wolfgang Iff-এর সেকশনে ছিল ১০ হাজার বন্দি। তার দেখা, প্রতিদিন ৩০-৪০ জনের লাশ বের হত। কোনো কোনোদিন ২০০ জন পর্যন্ত উঠত।

অথচ সে সময় খাদ্যের অপ্রতুলতা ছিল না। আমেরিকা চাইলে এই লক্ষ লক্ষ বন্দিকে খাওয়াতে পারত। এপ্রিলের রিপোর্টে ছিল : ইউরোপে এই পরিমাণ খাবার আছে আমাদের হাতে যে, ৫০ লাখ লোককে দিনে ৪০০০ ক্যালরি করে খাওয়াতে পারব। অথচ ইচ্ছে করে এদের খেতে দেয়া হয়নি। ২৩ মে কোয়ার্টার মাস্টার মেজর জেনারেল

১38

লিটলজন তার বন্ধু সহকারী চীফ অফ স্টাফ Bob Crawford-কে জানিয়েছেন : আমি জানি যে আমার পক্ষে ৩০ লাখ বন্দিকে খাওয়ানো সম্ভব না। আমার চাহিদাপত্র বার বার যুদ্ধদপ্তর প্রত্যাখ্যান করছে।

৩. যুদ্ধবন্দিদের হত্যা

১৯২৯ সালে ৩য় জেনেভা কনভেনশানে (Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva July 27, 1929) সোভিয়েত ও জাপান সম্মতি দিয়েছিল, কিন্তু অফিসিয়ালি সই করেনি। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই কনভেনশন চলছিল। কে কার কত যুদ্ধবন্দির কত পার্সেন্ট হত্যা করেছে [১৩২] নিচের চার্টটা থেকে ধারণা পাওয়া যায়। এরাই চুক্তি করে, এরাই সম্মতি-সই দেয়, এরাই ভাঙে। আর আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ডের মিসকিনরা মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকি: আহা, এরা কত সভ্য, কত আধুনিক।

কাদের সেনা	মোট বন্দির কত পার্সেন্ট মেরেছে	কারা মেরেছে	সংখ্যাটা কত
		মিত্রশক্তির হাতে নিহত	
জার্মান সেনা	৩২.৯%	পূর্ব ইউরোপ	
জার্মান সেনা	৩৫.৮%	সোভিয়েত	৩,৬৩,০০০ মরে গেছে কনফার্ম করেছে Deutsche Dienststelle (WASt) [১৩৩]। সোভিয়েত হেফাজতে থাকা ৭ লাখ সেনা নিখোঁজ। মোট ১০ লাখ। [১৩৪]
ইতালীয় সেনা	৭৯%	সোভিয়েত	
জার্মান সেনা	০.০৩%	বৃটেন	
জার্মান সেনা	০.১৫%	আমেরিকা	ভাইয়ারা ভালো
জার্মান সেনা	২.৫৮%	ফ্রান্স	

[১৩২] Ferguson, Niall (2004). "Prisoner Taking and Prisoner Killing in the Age of Total War: Towards a Political Economy of Military Defeat". War in History. 11 (2): 148-92

[১৩৩] German government agency based in Berlin which maintains records of members of the former German Wehrmacht who were killed in action, as well as official military records of all military personnel during World War II

[১৩৪] Rüdiger Overmans. Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. (German military losses in World War II) Oldenbourg 2000.Page 286-289

অক্ষশক্তির হাতে নিহত			
মার্কিন-বৃটিশ সেনা	৪%	জার্মানি	
সোভিয়েত সেনা	৫৭.৫%	জার্মানি	
ইতালীয় সেনা	৬- ৮.৪%	জার্মানি	ইতালি আত্মসমর্পণ করে মিত্রপক্ষে যাবার পর
মিত্র সেনা	২৭%	জাপান	১০-১৯ হাজার

সোভিয়েত আর জাপান সইসাবুদ করেনি বুঝলাম। আর জার্মানি তো জংলী, অসভ্য। কিন্তু আমেরিকা? আর সব দেশের অসভ্যতা মেনে নেয়া যায়, আমেরিকারটা কীভাবে মানবেন? অনেকে বলবেন এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা যুদ্ধের মাঠে হয়েই থাকে।

- যুদ্ধের পর ৩২৮ তম ইউএস পদাতিক রেজিমেন্ট হেডকোয়ার্টারের একটি লিখিত আদেশ উদ্ধার হয়: কোনো জার্মান সেনাকে বন্দি হিসেবে নেবে না, দেখামাত্র গুলি।

- মেজর জেনারেল Raymond Hufft এর নির্দেশ ছিল, রাইন নদী পার হবার পর আর কাউকে বন্দি করবে না (সব ভোগে চলে যাবে)। ঐতিহাসিক Stephen Ambrose বলেন, এনাকে যখন জিগ্যেস করা হল এইসব আদেশের ব্যাপারে, তিনি বললেন: 'জার্মানরা জিতলে আজ আমার বিচার করতো ন্যুরেমবার্গে নিয়ে'।[১০৫] হয়ে গেল জাস্টিফিকেশন।

- ঐতিহাসিক Peter Lieb-এর রিসার্চে এসেছে, বহু আমেরিকান ও কানাডীয় ইউনিটকে বলাই ছিল: D-Day তে নরম্যান্ডিতে নামার পর কাউকে বন্দি যেন না করা হয় (কুল্লু খালাছ) [১০৬]।

- Biscari গণহত্যার বিচারে সার্জেন্ট West (যিনি ৭৫ জনের মাঝে ৩৭ জনাকে একাই হত্যা করেন) কারণ হিসেবে বলেছেন: উপরের অর্ডার মেনেছি। জেনারেল Paton তাঁর ব্রিফিং স্পীচে বলেছেন:

> " যখন আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে নামবো, তাকে আঘাত করতে ভুলো না, জোরে আঘাত কোরো। আমরা তাকে হত্যা করবো, কোনো দয়ামায়া নয়। সে তোমাদের

[১০৫] Bradley A. Thayer, Darwin and international relations p.186 p.189 p.180
[১০৬] The Horror of D-Day: A New Openness to Discussing Allied War Crimes in WWII, Spiegel Online, 05/04/2010, (part 1- Part 2).

হাজারো সাথী হত্যা করেছে। মরতে তাকে হবেই। [১৩৭]

বিচ্ছিন্ন ঘটনা তো যুদ্ধে হয়েই থাকে। তাহলে এই সুপ্রীম কমান্ডগুলোকেও কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা যাবে?

সামনে আমরা জেনেভা কনভেনশন ১৯৪৯ দেখবো। এসব আলোচনা এজন্য করছি, যাতে যুদ্ধকালীন সাইকোলজিটা আমরা বুঝতে পারি। কাউকে আমরা দায়ী করছি না। যুদ্ধের সময় স্বাভাবিক মানবীয় সুকুমারবৃত্তিগুলো কাজ করে না। এখন এই মুহূর্তে আপনি যা ভাবছেন, যেভাবে একটা বিষয়কে দেখছেন, শত্রুর মুখোমুখি ব্যাপারগুলো এমন থাকে না। যত কনভেনশনই আপনি তৈরি করেন, যত কাগুজে নিয়মই আপনি বানান। দেখুন, যারা কনভেনশন বানিয়েছে, তারাই মানতে পারেনি, আইন বানিয়ে ভেঙেছে (আমেরিকা), যোগসাজশ করে চুক্তি করে ভেঙেছে (ইয়াল্টা চুক্তি), যারা ভাঙতে চায়নি, তারা দায় এড়িয়েছে (বৃটেন)। কেননা এই কাগুজে চুক্তি শুনতে শোনা যায় ভালো, কিন্তু মানব প্রবৃত্তির বিপরীত। যুদ্ধকালে মানুষের মন এভাবে কাজ করে না।

[১৩৭] George Ducan's, Massacres and Atrocities of World War II.

জেনেভা কনভেনশন ১৯৪৯

পাঠক, আমরা দেখলাম ৩য় জেনেভা কনভেনশনের এসব কাগজীয় নীতিমালা কী প্রচণ্ডভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে ২য় বিশ্বযুদ্ধে। ফলে যুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে নতুন করে ৪টি কনভেনশন (সমঝোতা) যোগ করা হয়—

১. ময়দানের অসুস্থ ও আহত সেনাদের উন্নয়ন
২. সমুদ্রে আহত-অসুস্থ-জাহাজডুবি হওয়া সেনাদের উন্নয়ন
৩. যুদ্ধবন্দিদের সাথে আচরণ সম্পর্কিত
৪. যুদ্ধকালীন বেসামরিক লোকের সুরক্ষা সম্পর্কিত

১৮০টি দেশ এতে স্বাক্ষর করে। কিন্তু ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দশকগুলোতে উপনিবেশের স্বাধীনতাযুদ্ধগুলোতে এই কাগুজে বাঘ আবারও অকর্মণ্য সাব্যস্ত হয়। কোরিয়া যুদ্ধ (১৯৫০-১৯৫৩), ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৫-১৯৭৫) ও আরব-ইসরাইল যুদ্ধে (১৯৪৮, ১৯৬৭, ১৯৭৩) প্রস্তাবকরা বা প্রস্তাবকদের সমর্থিত পক্ষ নিজেরাই এর চরম লঙ্ঘন করে। ফলে ১৯৭৭ সালে আরও দুটো ধারা যুক্ত করা হয় যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের আওতায় আনার ব্যাপারে। [১৩৮]

বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। আমরা শুধু দেখব কারা কারা ভেঙেছে, কী কৌশল করে ভেঙেছে। আর সেই লঙ্ঘন সম্পর্কিত বিধিটা একটু দেখে নিব। স্ট্যালিন, মাওসেতুং-সহ সমাজতন্ত্রীরা নিজ দেশের জনগণই মেরেছে মিলিয়ন মিলিয়ন। তাদের কাছে সভ্যতা কিছুই আশা করে না। কিন্তু যারা মানবতার বুলি কপচায়, তাদের কীর্তিকলাপ কী ছিল দেখলেই বুঝা যাবে এইসব কাগজের গুরুত্ব মাঠে কতোখানি।

[১৩৮] Malcolm Shaw (March 04, 2020). Geneva Conventions 1864-1977. Encyclopedia Britannica [Sir Robert Jennings Professor of International Law, University of Leicester, England]

১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনের পর—

ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৬৮-১৯৭৫)

ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৬৮-১৯৭৫) মার্কিন সেনারা ঠিক কী পরিমাণ যুদ্ধাপরাধ করেছিল, তার পুরো হিসাব পাওয়া যায় না। তবে একটা ধারণা করতে পারবেন।

- দক্ষিণ কোরীয় গবেষক Ku Su-jeong PhD এর মতে, আমেরিকা সমর্থিত দক্ষিণ কোরীয় সেনারা নিজেদের পক্ষের এলাকা দক্ষিণ ভিয়েতনামেই প্রায় ৮০টি গণহত্যায় ৯০০০ সিভিলিয়ানকে হত্যা করেছে। [১৩৯]

- নিজ পক্ষের দক্ষিণ কোরিয়াতেই আমেরিকান সেনারা My Lai Massacre (বা Pinkville Massacre) এ ৫০০ সিভিলিয়ান হত্যা করে। এজন্য 20th Infantry Regiment ও 3rd Infantry Regiment এর ২২ জন সেনাকে অভিযুক্ত করা হয়। তার মাঝে কেবল ১ জনের (Lieutenant William Calley Jr) যাবজ্জীবন হয়, সাড়ে ৩ বছর হাউস-এরেস্টের পর ছেড়ে দেয়া হয়।

- ২০০৩ সালে আমেরিকার ওহিও-ভিত্তিক পত্রিকা Toledo Blade তাদের সিরিজ রিপোর্টে বলে: U.S. Army's 101st Airborne Division এর Tiger Force ইউনিট ১৯৬৭ সালে ৭ মাসে ২৪২টি যুদ্ধাপরাধ করে, যার $^{১}/_{৩}$ অংশ প্রকাশিত হয়েছে। এর মাঝে আছে যুদ্ধবন্দি নির্যাতন, ধর্ষণ, ৯-১০০ পর্যন্ত সিভিলিয়ান হত্যা ইত্যাদি। এদের মাঝে ১৮ জন দোষী সাব্যস্ত হলেও কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি, বরং বহু অপরাধীকে কোর্ট মার্শাল এড়ানোর জন্য চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কলাম্বিয়া ভার্সিটির গবেষক Nick Turse বলেন, এটা জাস্ট হিমশৈলের চূড়াটা।

পাঠক, ৭ মাসে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে ৭ বছরে কী অবস্থা? কী পরিমাণ কনভেনশন করা হয়েছে ৭ বছরে। নিজ দখলকৃত নিজ পক্ষের এলাকায় যদি হয় এই অবস্থা, তাহলে শত্রুপক্ষের সাথে কী পরিমাণ কনভেনশন পোঁছা হয়েছে ভাবুন একবার।

[১৩৯] Ly Truong, 1968 - the year that haunts hundreds of women, BBC

আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ (২০০১-চলমান)

আফগানিস্তান

সোভিয়েত ইউনিয়নকে আফগান ভূমি থেকে বিতাড়ন ও দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর ১৯৯৬ সালে তালেবান কাবুল দখল করে সরকার গঠন করে। পাকিস্তান, সৌদি আরব তাদেরকে স্বীকৃত দেয় ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ৯/১১ এর টুইনটাওয়ার হামলার পর হামলার মূল হোতা উসামা বিন লাদেনকে দাবি করে আমেরিকা। তালেবান সরকার জানায়, যেহেতু তিনি আমাদের রাষ্ট্রীয় অতিথি, তাঁকে আমেরিকার হাতে তুলে দেবার আগে আমেরিকাকে তাঁর জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে। এই যৌক্তিক দাবির প্রেক্ষিতে আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলা করে।

রেডক্রসের আইন উপদেষ্টা ও আইন বিভাগের প্রধান Dr Knut Dörmann বলেন: 'সব দখলদার দেশই 'আন্তর্জাতিক দখলদারি আইন' অস্বীকার করে থাকে'। কী কার্যকারিতা এসব আইনের কে জানে। একই পুনরাবৃত্তি আমরা ইরাকেও দেখতে পাই। আমেরিকাও দখল করতে নয়, বরং আফগানিস্তানকে 'স্বাধীন' করতে এসেছিল বলে দাবি করে হামলা করে। একটা আন্তর্জাতিক ক্রাইসিসে জাতিসংঘের কোনো ভূমিকাই যদি না থাকে, তবে কেন এই কাকতাড়ুয়া?

এবার দেখুন কাগুজে বাঘ জেনেভা কনভেনশন ও মানবাধিকার আইনের কেরামতি। স্থান বাগরাম এয়ারবেইস, আফগানিস্তান। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ Vol.16 No.3(C) থেকে তুলে দিচ্ছি—

- স্যান্ডোগেঞ্জি-জাঙ্গিয়া পরিয়ে বা উলঙ্গ রাখা হত।
- উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়ে এবং ৫-১০ মিনিট পরপর গরাদে লাঠি দিয়ে শব্দ করে ঘুমাতে দেয়া হত না কয়েক সপ্তাহ অব্দি।
- জিজ্ঞাসাবাদের সময় উজ্জ্বল স্পটলাইট একদম চোখে মেরে ঘন্টারপর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হত।
- শক্ত করে শিকলে বেঁধে রাখা হত। উলঙ্গ রাখা হত, ঘুমাতে দেয়া হত না, মাঝে মাঝে পেটানো হত।
- পানিতে ভিজা অবস্থায় উলঙ্গ করে ফ্রিজিং সেলে বেঁধে রাখা হত।
- শিকলে বেঁধে ঘন্টার পর ঘন্টা হাত মাথার উপরে তুলে রাখতে হত।
- মাথা ঢেকে যন্ত্রণাদায়ক পজিশনে ঘন্টার পর ঘণ্টা রাখা
- ক্ষুধার্ত রাখা

বাগরামের একজন মুখপাত্র Roger King ২০০৩ সালে স্বীকার করেছেন:

> “ আমরা তাদেরকে অনেক লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করি। নিজেদের মাঝে কথা বলতে দেখলে তাদেরকে লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়। ...তারা যেন নিজেদের মাঝে কথা না বলে এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় কথা সহজে বের করা যায়, এজন্য ঘুমাতে না দেয়াটা দারুণ কার্যকর একটা পদ্ধতি। এজন্য কমন টেকনিক হল লাগাতার উজ্জ্বল বাতি জ্বালিয়ে রাখা এবং ১৫ মিনিট পর পর জাগিয়ে দেয়া।

মিলিটারি তদন্ত কর্মকর্তারা ওয়াল স্ট্রীট জার্নালকে জানিয়েছেন:

> “ জিজ্ঞাসাবাদের সময় ইঁদুর-কুকুর দিয়ে ভয় দেখানো যায়। বন্দিদের উলঙ্গ রাখা, দাড়ি শেভ করে দেয়া, ধর্মীয় জিনিস ও টয়লেট সুবিধা না দেয়া এসব করা যায়।

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বলেই দিয়েছেন: আল-কায়েদা ও তালেবান বন্দিরা জেনেভা কনভেনশনের আওতায় পড়বে না। অর্থাৎ যুদ্ধবন্দিরা কনভেনশনের আওতায় যে যে অধিকার পাবে তা, এদের দেয়া হবে না। কেন? প্রেসিডেন্টের এই কথার ব্যাখ্যা দিয়েছে আমেরিকার Department of Justice. তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

- গুয়ানতানামোতে স্থায়ী বন্দিক্যাম্প তৈরি হবার আগে আপনারা যে অস্থায়ী ক্যাম্পে তাদেরকে রেখেছেন, সেখানে তো ৩য় জেনেভা কনভেনশন মোতাবেক যুদ্ধবন্দি রাখার ব্যবস্থা নাই।
- প্রেসিডেন্ট বুশের আদেশে যে এদের বিচারের জন্য মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল করা হল, এটা কি জেনেভা কনভেনশনের বিরুদ্ধে গেলো কি না। জেনেভা মোতাবেক এভাবে বন্দিদের কোর্ট মার্শাল কি করা যায়?

US Department of Justice নিম্নোক্ত জবাব দিয়েছিল ২২ জানুয়ারি, ২০০২-এ [১৪০]:

১. আল-কায়েদা হল Non-state Actor, একটা 'সন্ত্রাসী' সংগঠন, তাই তারা যুদ্ধবন্দি (PoW) স্ট্যাটাস পাবার অধিকার রাখে না। ৩য় কনভেনশন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না।

---

[১৪০] Memorandum for Alberto R. Gonzales, Counsel to President, and William J. Haynes II, General Counsel of the Department of defence (Jan 22, 2002), US Department of Justice.

২. আর তালেবান যদিও আফগান সরকার। কিন্তু আমেরিকার সংবিধান মোতাবেক, **প্রেসিডেন্ট চাইলে যেকোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাপারে আমেরিকার বাধ্যবাধকতা স্থগিত রাখতে পারেন (!)** সঙ্গত কারণে। যুক্তিসঙ্গত কারণ যেমন: আফগানিস্তান Functioning State ছিল না, একটা Failed State এর সরকার হিসেবে তালেবান বৈধ-রাষ্ট্র না। এসব কারণ দেখিয়ে **প্রেসিডেন্ট চাইলে তালেবানকে PoW স্ট্যাটাস থেকে বঞ্চিত করতে পারেন (!)**। সেক্ষেত্রে ৩য় জেনেভা ভঙ্গ হলে তা আমেরিকার যুদ্ধাপরাধ হবে না (!)

৩. **আমেরিকার নিজস্ব আইনের দ্বারা জেনেভা কনভেনশনের কিছু কিছু টেক্সট স্থগিত হতে পারে (!)।**

৪. **তালেবান যদি ৩য় জেনেভার যোগ্যও হয়, তবু প্রেসিডেন্টের এই ক্ষমতা আছে যে তিনি তাদের PoW মর্যাদা না-ও দিতে পারেন চাইলে (!)।**

৫. ৩য় জেনেভার বাধ্যবাধকতা না থাকলে প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা আল-কায়েদা-তালেবান কোনো স্ট্যান্ডার্ড আচরণ পাবে কিনা। না, পাবে না। **প্রেসিডেন্ট বা আমেরিকা সেনাবাহিনী প্রথাগত সদাচরণের আইন দ্বারা বাধ্য না (!)।**

তাহলে এইসব আইনের উদ্দেশ্য কী? কে যেন বলেছিল: আইন করাই হয় ভাঙার জন্য। এতো হুবহু সেই কাণ্ডই দেখা যাচ্ছে। আইন বানিয়েছে, নিজেদের হাতে সেই আইন ভাঙার বৈধ ক্ষমতা রেখেছে। জাতিসংঘ বানিয়েছে, সেই জাতিসংঘের সিদ্ধান্তকে বুড়ো আঙুল দেখাবার জন্য ভেটো ক্ষমতা রেখেছে নিজেদের কাছে। এসবের উপর ৩য় বিশ্বের মিসকীনরা আবার ভরসা করে বসে আছে। বিস্তারিত আলাপের সুযোগ নেই, কেবল আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় নিউজ হেডলাইনগুলো তুলে দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি। সব নিউজ নাও পেতে পারেন নেটে। বিস্তারিত জানতে একটি ভিডিও লিংক দিচ্ছি [১৪১]।

২০১৭ সালে মার্কিন সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে বিমান হামলার নীতিমালা শিথিল করে দেয়। ফলে বহুগুণে বেড়ে যায় বেসামরিক নিহতের সংখ্যা, প্রায় ৩৩০%। [১৪২] গত ১০ বছরে ৭৭৯২ জন শিশু নিহত হয়েছে যার সরাসরি কারণ পশ্চিমা দখলদারি। অপুষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারিতে আরও কত মারা গেছে তার কোনো নিকেশ নেই। আরও কত হাজার পঙ্গুত্ব বরণ করেছে তারও কোনো ইয়ত্তা নেই। কত লক্ষ শিশু পিতামাতা

[১৪১] Daniel Haqiqatju, 20 Years in Afghanistan: The Untold Story, YouTube, uploaded by The Muslim Skeptic (Sep 9, 2021) https://youtu.be/TSpWJw6HfyY

[১৪২] Costs of War (June 2021), WATSON INSTITUTE FOR INTERNATIONAL AND PUBLIC AFFAIRS, Brown University, USA

হারিয়ে অনাথ হয়েছে তারও হিসেব চাইবেন না। [আল-জাজিরা] ১০ লক্ষ শিশু রয়েছে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে [UN News 29 AUG 2021]

মার্কিন যুদ্ধাপরাধ	আন্তর্জাতিক মিডিয়া
আমেরিকার বিমান হামলায় ৭ আফগান শিশু নিহত	রয়টার্স জুন ১৮, ২০১৭
কান্দাহারে মাদ্রাসায় বিমান হামলায় ১১ শিশু নিহত	বিবিসি ২২ অক্টোবর ২০২০
কুন্দুজে হিফজ সমাপনী অনুষ্ঠানে মার্কিন বিমান হামলায় ২০০ জন শিশু-অভিভাবক নিহত।	বিবিসি ৭ জুন ২০১৮
বিবাহ অনুষ্ঠানে মার্কিন বিমান হামলা	সিএনএন ৩০ জুন' ২০০২
কনে সহ ৪৭ জন নিহত। ৩৯ জন নারী-শিশু।	গার্ডিয়ান ৬ জুলাই' ২০০৮
মার্কিন বিমান হামলায় বিবাহ অনুষ্ঠানে ৪০ জন নিহত। ২৩ জন শিশু।	ফক্স নিউজ, ১৩ জানুয়ারি' ১৫
কান্দাহারে মার্কিন বিমান হামলায় বিবাহ অনুষ্ঠানে ৪০ জন নিহত, ৭০ হন আহত	UN News 10 JUN 2010
বিবাহ মিছিলে বিমান হামলা: ৪ জন নিহত, আহত ৮ জন	রয়টার্স ৫ অক্টোবর ২০১৮
বিবাহ অনুষ্ঠানে মার্কিন বিমান হামলা। নিহত ৪০	CBS News 23 SEP 2019
মার্কিন বিমান হামলায় নিহত ৯ বেসামরিকের জানাযায় ফের বিমান হামলা। নিহত আরও ২৫।	রয়টার্সের বরাতে World Socialist Website 10 JUL 2007
মার্কিন বোমা হামলায় নিহত ২৭ জন সিভিলিয়ানের জানাযায় বোমা হামলা। অগণিত নিহত	UN News 5-7 JUL 2007
3 October 2015 কুন্দুযে MSF পরিচালিত হাসপাতালে বিমান হামলায় ৪২ জন রোগী নিহত [www.msf.org]	বিবিসি ২৯ April ২০১৬
মার্কিন ড্রোন হামলায় ৩০ জন বাদাম কৃষক নিহত	রয়টার্স ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯
আফগানিস্তানে বন্দি নির্যাতনে ইউরোপীয় দেশগুলোর ন্যাটো সেনাদের নৈতিকতা প্রশ্নবিদ্ধ	অ্যামনেস্টি ১৩ নভেম্বর ২০০৭
আফগান ও গুয়ানতানামোতে বন্দিদের সাথে আমেরিকার আচরণ মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে।	অ্যামনেস্টি ১২ এপ্রিল ২০০২
অস্ট্রেলিয়ার এলিট বাহিনী 'খেলাচ্ছলে হত্যা'র প্রতিযোগিতা করে। কে কতজন হত্যা করেছে, সেটা সেলিব্রেট করে ইউনিটের ভিতর।	টাইমস ১৬ নভেম্বর ২০২০
সিভিলিয়ান হত্যা করে স্মারক হিসেবে তাদের আঙুল কেটে সংগ্রহ করায় মার্কিন সেনারা অভিযুক্ত।	ডেইলি নিউজ ৯ সেপ্টেম্বর ২০১০

নিহত তালিবান সেনাদের উপর প্রস্রাব করায় কয়েকজন মার্কিন মেরিনসেনা অভিযুক্ত।	গার্ডিয়ান ১২ Jan ২০১২
মজাচ্ছলে তালিবানদের মৃতদেহ পোড়ানোর ভিডিও প্রচারে অভিযুক্ত মার্কিন সেনারা।	২০ অক্টোবর ২০০৫

শুধু অপরাধের খতিয়ান দেখলে তো হবে না। এর বিপরীতে আমেরিকা কী জবাব দিয়েছে, সেটা না জানলে তো আলোচনাটা নিরপেক্ষ হল না। চলুন দেখা যাক:

- পেন্টাগন বলেছে: কুন্দুজে হাসপাতালে বম্বিং যুদ্ধাপরাধ নয়। যেহেতু অনিচ্ছাকৃত ছিল। [বিবিসি 29 April 2016]

- সকল বিমান হামলায় নিহতদের জীবনের দাম আমেরিকা চুকিয়ে দিয়ে মার্কিন মুখপাত্র জালমে খলিলজাদ বলেন: সেনা অভিযানে নিরপরাধ মানুষ মারা যাওয়াটা দুঃখজনক, কিন্তু আমরা কখনোই নিরপরাধকে টার্গেট বানাইনা। [ওয়াশিংটন পোস্ট April 25, 2019]

- তালেবানের মৃতদেহের উপর প্রস্রাবকারী মেরিনসেনা Sgt. Joseph Chamblin বলেছে ABC News-কে: আমি কখনোই অনুতপ্ত নই। সুযোগ পেলে আবার করব। [ABC News 17 JUL 2013]। শেষমেশ সে মামলা জিতেও যায়। [মেরিনটাইমস ১০ নভেম্বর ২০১৭]

- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বলেছে, আমেরিকা আফগানিস্তানে যুদ্ধাপরাধ করে থাকতে পারে। [France24 15 NOV 2016] ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের প্রধান প্রসিকিউটর Fatou Bensouda সিদ্ধান্ত দেন: আমাদের কাছে যথেষ্ট তথ্য আছে যে, মার্কিন সেনারা টর্চার, নির্মম আচরণ, মারাত্মক অপমান, ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতন করেছে আফগানিস্তানে ২০০৩ ও ২০০৪ সালে। এবং পরবর্তীতে পোল্যান্ড-রোমানিয়া-লিথুয়ানিয়ার CIA অফিসে। এবং তিনি এর তদন্ত করেই ছাড়বেন। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও জানালেন: আমরা নিজেরাই যথেষ্ট। Fatou Bensouda ও তাঁর সাহায্যকারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা দেবার ঘোষণা দেন তিনি। তাঁর ভিসা বাতিল করে দেয়া হয় [নিউইয়র্ক টাইমস ৫ এপ্রিল ২০১৯] এবং বলা হয়: মার্কিন বাহিনীর যুদ্ধাপরাধ তদন্তকারীদের শাস্তি আমেরিকাই দেবে।

পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের প্রোফেসর William W. Burke-

White বলেন: এই নিষেধাজ্ঞা হুবহু একই নিষেধাজ্ঞা যা আমেরিকা সন্ত্রাসী গ্রুপ ও স্বৈরশাসকদের উপর জারি করে। তদন্তের কথা উঠতেই সেটাই জারি করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক আদালতের উপর। মজার ব্যাপার কি জানেন? সকল আন্তর্জাতিক আইনের উদ্যোক্তা, সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোক্তা আমেরিকা নিজেই 'আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের স্বাক্ষরকারী না' [১৪৩]। আদালত প্রতিষ্ঠায় (Rome Statute) সবচেয়ে সক্রিয় ছিল আমেরিকাই, কিন্তু নিজেই সই করেনি। কোন দুনিয়ায় আছেন?

ইরাক যুদ্ধ

একটি একটি করে বলতে গেলে সম্ভব নয়। খুব সংক্ষেপে কয়েকটি নিউজ হেডলাইন তুলে দিচ্ছি।

মার্কিন যুদ্ধাপরাধ	আন্তর্জাতিক মিডিয়া
November ১৯, ২০০৫ ইরাকের হাদিসা গ্রামে ২৪ জন নারী-শিশু নিহত।	NBC News (May 30, 2006)
১২ মার্চ ২০০৬ মাহমুদিয়া গ্রামে আল-জানাবি পরিবারে পিতামাতা ও ৫ বছরের শিশুহত্যা। ১৪ বছরের আবীর কাসিম আল-জানাবীকে ধর্ষণ-হত্যা ও লাশ পোড়ানো।	Associated Press (July 3, 2006)
ইসহাকী গ্রামে ৫ শিশুসহ একই পরিবারের ১১ জনকে গুলি করে হত্যা।	Daily Mirror. Sep 1, 2011.
বাজি গ্রামে ফার্মহাউসে বিমান হামলা। নিহত একই পরিবারের ৯ জন।	New York Times (Jan 4, 2006)
২০০৫ এর ১মে-১২ জুলাই আড়াই মাসে শুধু বাগদাদে মার্কিন বাহিনী ৩৩ নিরস্ত্র সিভিলিয়ানকে হত্যা ও ৪৫ জনকে আহত করেছে।	Los Angeles Times (July 25, 2005)
বাগদাদে বিমান হামলা। ৩ নারীসহ ৮ সিভিলিয়ান নিহত।	Washington Post Sep 20, 2008
হাতকড়া ও চোখবাঁধা অবস্থায় ৪ ইরাকি বন্দিকে গুলি করে হত্যা। দুই মার্কিন সেনার স্বীকারোক্তি।	International Herald Tribune August 27, 2008
কারবালায় ১ জন, বাগদাদ এয়ারপোর্টে ৩ জনকে গুলি করে হত্যা	New York Times June 30, 2008
ইরাকি সিভিলিয়ান হত্যার ২২ টি ঘটনা নিয়ে ডকুমেন্ট প্রকাশ।	Associated Press Sep4, 2007
সেনারা যেসব মরদেহ দাফনের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে তাদের চোখ উপড়ানো, লিঙ্গে আঘাত, দমবন্ধ ও ফাঁসির আলামত।	Guardian Oct18, 2007
মার্কিন বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তারের পর ১৭ জন তরুণের লাশ মিলেছে। আনবার প্রদেশে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে ১০০ মানুষ।	Inter Press Service Mar 30, 2007

---

[১৪৩] Michael Crowley (June 11, 2020) White House correspondent, U.S. to Penalize War Crimes Investigators Looking Into American Troops, The New York Times

সদর শহরে একটি গাড়ির দিকে মার্কিন বাহিনীর গুলি। ২ শিশু কন্যা সহ এক ব্যক্তি নিহত।	New York Times Mar 10, 2007
১২ July ২০০৭ বাগদাদে হেলিকপ্টার থেকে গুলির ভিডিও ফাঁস করেছে উইকিলিক্স। রয়টার্স সাংবাদিক সহ ১২ জন নিহত।	
মার্কিন সেনা অভিযানে ৩ নারীহত্যাকে ধামাচাপা দিতে দেহ থেকে বুলেট খুঁটিয়ে বের করেছে।	Guardian Apr 5, 2010
আবর্জনার ট্রাকে মার্কিন বাহিনীর গুলি। ৭ জন নিহত।	Christian Science Monitor June 22, 2006

এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও যুদ্ধে স্বাভাবিক বলে দাবি করেছে মার্কিন বাহিনী। তাই কি?

- ইরাকে মার্কিন দখলদারি থেকে অক্টোবর'২০১৯ সাল অব্দি হিসেবভেদে ন্যাটো ও তাদের মদদপুষ্ট ইরাকী বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে ১৮৪৩৮-২০৭১৫৬ জন সিভিলিয়ান। Hopkins mortality study-মতে ন্যাটো বাহিনীর বিমান হামলায় জুন ২০০৬ পর্যন্তই নিহত হয়েছে ৭৮ হাজার সিভিলিয়ান। [১৪৪]

- Staff Sgt. Frank Wuterich আদালতে স্বীকার করেছে যে সে আদেশ দিয়েছিল, 'আগে গুলি করবে, পরে প্রশ্ন করবে'।

- ঘরে ঘরে অভিযান চালানর সময় মার্কিন বাহিনীর কৌশল হল "prepping the room"। মানে হচ্ছে ঘরে ঢোকার আগেই গ্রেনেড চার্জ করে ঘর প্রিপেয়ার করা। গার্ডিয়ান পত্রিকা দুটো ঘটনা উল্লেখ করেছে এই আর্টিকেলে [১৪৫]। একবার ৪ বছরের শিশুসহ একই পরিবারের ৮ জন নিহত। আরেকবার ৫ শিশুসহ ৮ জন নিহত। এই কৌশলের দরুন এমন কত ঘটনা ঘটেছে তার কোনো হিসেব আছে?

- অফিসারেরা "kill counts"-কে উৎসাহিত করত বলে তদন্তে এসেছে। ইচ্ছাকৃত হত্যা, বর্বরতা অনুমোদন এবং এন্টি-আরব বর্ণবাদ অফিসারে অনুমোদন দিত। 1st Lt. Justin Werheim জানিয়েছেন, প্রত্যেক সৈনিক-বয়সী ইরাকিকে হত্যা করাটাকে খুব পজিটিভলি দেখা হত। Pfc. Jason R. Joseph জানান, সৈনিক-

[১৪৪] Nygaard, op. cit. For commentary on the Hopkins study, see chapter 8.

[১৪৫] Gary Younge (June 26, 2006) If Wanton Murder Is Essential to the US Campaign : The Reported Atrocities by American Soldiers Are Not Isolated Incidentsbut the Inevitable Offshoots of Occupation, Guardian

বয়সী কেউ হাত উপরে না তুললেই গুলি করার আদেশ ছিল। [১৪৬]

- বিচার? ইরাকি হত্যায় অভিযুক্ত অধিকাংশ মার্কিন সেনাকে অন্যান্য ছোটখাট অভিযোগ দেখিয়ে বিচার ছাড়াই ডিপার্টমেন্টাল সাজা দেয়া হয়েছে। কিছু অভিযোগ তো বিচার ছাড়াই খালাস দেয়া হয়েছে। [১৪৭] হাদিসা গণহত্যায় অভিযুক্ত কোম্পানির কমান্ডিং অফিসার Captain Lucas McConnell-এর আইনজীবী বলেছেন, আমরা প্রত্যেক কর্নেল ও জেনারেলকে এই ঘটনায় টেনে আনব। অর্থাৎ সিনিয়র পর্যায়ের যেসব অফিসারেরা এসব নির্দেশ দেয়, তাদেরকেও কাঠগড়ায় উঠতে হবে। [১৪৮] এগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা কীভাবে বলা যায়?

এসব উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হবার কথা যে, যুদ্ধপরবর্তী মীমাংসা-সালিশের জেনেভা কনভেনশনের ভূমিকা থাকলেও (আমেরিকা ও তার মিত্র ছাড়া অন্যদের বেলায়), যুদ্ধের ফিল্ডে এর ভূমিকা ইতিহাসে বার বার ব্যর্থ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ সিভিলিয়ানের আত্মা প্রতিমূহূর্তে ব্যঙ্গ করছে সভ্যতার অহংকার এইসব কাগজকে। যুদ্ধের সময় কেন কাজ করছে না এসব? কেননা মানব মনের সাথে এসব কাগজ 'যায় না'। যুদ্ধকালীন এড্রেনালিন রাশের তোড়ে ভেসে যায় সব মিষ্টিমধুর কনভেনশন, মুখরোচক সব পরিভাষা। যুদ্ধের মাঠ আর সুইজারল্যান্ডের এসিরুম ভিন্ন, এদের বাস্তবতা ভিন্ন। এজন্যই প্রতিটি যুদ্ধে এই কনভেনশনটন মুখ থুবড়ে পড়ে।

---

[১৪৬] Borzou Daragahi and Julian E. Barnes (August 3, 2006) Officers Allegedly Pushed 'Kill Counts', Los Angeles Times

[১৪৭] Josh White, Charles Lane and Julie Tate (August 28, 2006) Homicide Charges Rare in Iraq War : Few Troops Tried For Killing Civilians, Washington Post

James Palmer (MAY 21, 2019) America Loves Excusing Its War Criminals, Foreign Policy.

[১৪৮] Andrew Gumbel (December 24, 2006) Iraq Massacre: US Marines 'Will Point the Finger of Blame at Senior Officers', Independent

যুদ্ধকালীন মনস্তত্ত্ব (WAR PSYCHOLOGY)

এবার আমরা দুটো এক্সপেরিমেন্ট দেখবো। যদিও এগুলো যুদ্ধকালীন নয়, কিন্তু অসহায়ের প্রতি সবলের আচরণ কেমন হয় সেটার একটা ধারণা আমরা নিতে পারব। বন্দি পরাজিত সেনাদের প্রতি বিজয়ী সেনাদের আচরণ কেমন হতে পারে, কেন এমন হয়, তার একটা চিত্র পাঠক পাবেন।

স্ট্যানফোর্ড প্রিজন এক্সপেরিমেন্ট

একটা বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্ট এই Stanford prison experiment. বিস্তারিত জানতে এক্সপেরিমেন্টের নিজস্ব ওয়েবসাইটে যেতে পারেন [www.prisonexp.org]। ১৯৭১ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাটি হয়েছিল। এটা ছিল একটা সিমুলেশন (কৃত্রিম পরিবেশ), যেখানে একটি জেলখানার মতো সেট তৈরি করা হয়। পেপারে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ২৪ জন কলেজ ছাত্রকে ভলান্টিয়ার হিসবে আনা হয়। টস করে ৯ জনকে বানানো হয় কয়েদী (prisoner), আর ৯ জন রইল কারারক্ষীর ভূমিকায়, বাকিরা অন-কল। গবেষণাটি দুই সপ্তাহ চলার কথা থাকলেও ৬ দিনের মাথায় তা বন্ধ করতে বাধ্য হন গবেষকেরা। কেন? চলুন দেখি—

১ম দিন

অতর্কিতে পুলিশ গিয়ে কয়েদীদেরকে ধরে নিয়ে আসে একটা অপরাধ দেখিয়ে। জেলের সেটে এনে সবাইকে উলঙ্গ করে স্প্রে করা হয় জীবাণুমুক্ত করার ভান করে, যা কয়েদীদেরকে অপদস্থ-হেয় করার বহু পুরনো পদ্ধতি। প্রত্যেককে কয়েদী-পোশাক দেয়া হয়, একটা করে নম্বর দেয়া হয়, যেটা তাদের নাম হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অপদস্থ করার জন্য মাথা মুণ্ডিয়ে দেয়া হয় সবার।

রাত ২:৩০-এ ঘুম থেকে সবাইকে তুলে নম্বর দ্বারা পরস্পর পরিচয় পর্ব করানো হল। কয়েদী-গার্ড কেউই এসময় সিরিয়াস ছিল না নিজেদের রোল প্লে করার ব্যাপারে। আদেশ না মানলে শাস্তি হিসেবে বুকডন দেয়ানো হল কাউকে কাউকে। দ্বন্দ্বের শুরুটা ছিল এখান থেকেই।

২য় দিন

সকালে কয়েদীরা বিদ্রোহ করে, অকথ্য ভাষায় গার্ডদের গালাগালি করা শুরু করে। নিজেদের নম্বরপত্র ছিঁড়ে ফেলে, দরজায় খাট দিয়ে ব্যারিকেড দেয়। গার্ডরা প্রথমে অগ্নি-নির্বাপক ব্যবহার করে তাদেরকে দরজা থেকে সরিয়ে দেয়। এরপর ভিতরে ঢুকে কয়েদীদের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে, খাট বের করে দেয়, মূল হোতাকে জোর করে নিঃসঙ্গ কারাপ্রকোষ্ঠে (solitary confinement) নিয়ে যায়, খাবার বন্ধ করে দেয়, এমনকি টয়লেটে যাওয়াও সীমিত করে দেয়।

এরপর গার্ডরা যা করল, ৩টা প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটাকে বানালো 'আরামের সেল' (privilege cell)। যারা বিদ্রোহে সবচেয়ে কম অংশ নিয়েছে, তাদেরকে এখানে খাটে রাখা হয়, খাবার দেয়া হয়, ব্রাশ করা ও মুখ ধোবার ব্যবস্থা দেয়া হয়, পোশাক ফেরত দেয়া হয়। বাকিরা চেয়ে চেয়ে দেখল। কয়েদীদের সংহতি এভাবে ভেঙে দেয়া হল।

আধা বেলার পর আরামের ঘরের কাউকে দিয়ে দেয়া হল কষ্টের ঘরে, কষ্টের ঘরের কাউকে আনা হল আরামের ঘরে। ফলে পরস্পর পরস্পরকে স্পাই ভাবতে লাগল। কয়েদীদের মাঝে জন্ম নিল অবিশ্বাস। ওদিকে গার্ডদের মাঝে ঐক্য বাড়িয়ে দিল এই বিদ্রোহ।

৩য় দিন

কয়েদীদের অনেকের মাঝেই ডিপ্রেশন ও স্ট্রেসের লক্ষণ দেখা গেল। একজন কয়েদীর অবস্থা বেশি খারাপের দিকে চলে গেলে (কান্না, চিৎকার) ডাক্তারের পরামর্শে তাকে এক্সপেরিমেন্ট থেকে ছেড়ে দেয়া হল।

৪র্থ দিন

গার্ডদের মাঝে একটা গুজব ছড়িয়ে গেল যে, আজ রাতে কয়েদীরা পালাবে। যাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, সে লোকজন নিয়ে এসে বাকিদের উদ্ধার করবে। যা পরে গুজব প্রমাণ হয়ে যাবার পর, গার্ডরা আরও কঠোর হয়ে গেল। শারীরিক শাস্তি (বুকডন, ফ্রগজাম্প ইত্যাদি), খালি হাত দিয়ে কমোড সাফ করা ইত্যাদি হীন কাজে তাদেরকে বাধ্য করল।

৫ম দিন

একজন পাদ্রী এসে সবার সাথে দেখা করল। সবাই নিজের নাম বলার বদলে নম্বর বলে নিজ নিজ পরিচয় দিল, তারা মেনে নিয়েছে নতুন পরিচয়, নতুন নিয়তি। পরিচয়ের কাল্পনিকতা ও বাস্তবতা তাদের কাছে আর আলাদা নেই। #৮১৯ নং কয়েদী খুবই ভেঙে পড়ল। ডাক্তার দেখাতে চাইল, তার শেকল খুলে রেস্ট নিতে পাঠানো হল। যখন তাকে বুঝানো হল: এটা আসল জেলখানা নয়, সেও বন্দি নয়; সে দুঃস্বপ্ন ভেঙে ছোটশিশুর মত চেয়ে রইল।

প্যারোলে মুক্তির জন্য একটা সাক্ষাৎকার নেয়া হল সবার। সকলেই নিজেদের এই ক'দিনে আয় হওয়া সম্মানীর বিনিময়ে রাজি হয়ে গেল। সবাই আশ্চর্যরকম বাধ্য, অনুগত, যেন এই জেলখানাকেই নিজেদের নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়েছে। (Their sense of reality had shifted, and they no longer perceived their imprisonment as an experiment.) যখন জানানো হল যে, তারা ছাড়া পাচ্ছে না; তখন ৪ জন ইমোশনালি ভেঙে পড়ল, ১ জনের সারা শরীরে র‍্যাশ দেখা গেল (psychosomatic rash), বাকিরা গার্ডদের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে 'ভালো কয়েদী' হবার চেষ্টা করল। এক্সপেরিমেন্ট শেষে দেখা গেল, গার্ডরা পুরোপুরি কন্ট্রোল নিয়ে ফেলেছে, আর কয়েদীরা দলগতভাবে ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে (bunch of isolated individuals), নিজের ভেতরে ভেতরেও ভেঙে পড়েছে।

নতুন একজন কয়েদীকে (#৪১৬) আনা হয়েছিল স্ট্যান্ডবাই থেকে। নতুন নতুন এসে, সে মুক্তির দাবিতে অনশন শুরু করেছিল। বাকি কয়েদীরা তাকে 'হিরো' হিসেবে না দেখে 'উৎপাত' (troublemaker) হিসেবে দেখল। তাকে নিঃসঙ্গ কারাপ্রকোষ্ঠে (solitary confinement) রাখা হল।

৬ষ্ঠ দিন

সকালে এক্সপেরিমেন্ট বাতিল করতে হল। মাঝপথেই থামিয়ে দিতে হল। প্রধান

গবেষক অধ্যাপক Philip G. Zimbardo বলেন: মূলত দুটো কারণে আমরা গবেষণাটি থামিয়ে দিলাম—

১.

গার্ডদের নির্যাতন বেড়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। মাঝরাতে যখন তারা নিশ্চিত যে কোনো গবেষক তাদেরকে দেখছে না, তখন কয়েদীদের উপর পর্নোগ্রাফিক ও আরো অপমানজনক নির্যাতন তারা করছিল, মূলত একঘেঁয়েমি কাটাতে। (Their boredom had driven them to ever more pornographic and degrading abuse of the prisoners.)

২.

Christina Maslach, Ph.D ভিডিওটেপে দেখেন যে, কয়েদীদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মাথায় ব্যাগ পরানো, শেকলবন্দি— তিনি বলেন যে, 'ছেলেদের সাথে যা আপনি করছেন, তা ভয়াবহ'। ৫০ জন ভিজিটরের মাঝে তিনিই একমাত্র পরীক্ষার নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাই আমরা বাধ্য হয়ে ২ সপ্তাহের পরীক্ষা ৬ দিনে বন্ধ করে দিই।

তবে এক্সপেরিমেন্টটা যে প্রশ্নটা রেখে গেল তা হচ্ছে: বুদ্ধিমান, সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ এত তাড়াতাড়ি কীভাবে জালেম অত্যাচারী হয়ে যায়? যেখানে তারা জানে যে, তারা কেউই আসল কয়েদী-গার্ড নয়, সবাই কলেজছাত্র। তাহলে সত্যিকার জেলখানাগুলোতে কী হয়। তাহলে যুদ্ধের সময় বিজয়ীর সাইকোলজি কী ঘটে?

অধ্যাপক Philip G. Zimbardo ব্যাখ্যা করেন যে, মানুষ যদি ক্ষমতা পায়, দুর্বল কাউকে নাগালে এনে দেয়া হয়, আইনে পাকড়াওয়ের সুযোগ না থাকে, বা আইন গলে বেরিয়ে যাবার সুযোগ থাকে, স্বাভাবিক মানুষও অত্যাচারী হয়ে ওঠে। এটার জন্য একটি factor কাজ করে যার নাম 'লুসিফার ফ্যাক্টর'। এটাকে অধ্যাপক জিমবার্ডো ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে, কোনো মানুষকে যদি আইনের আওতায় না আনা হয়, জবাবদিহিতা যদি না থাকে, তখন তার মধ্যে 'লুসিফার ফ্যাক্টর' কাজ করে এবং স্বাভাবিক সাধারণ মানুষও পশুর মতো আচরণ করে।

যুদ্ধের সময় পরাজিতের ব্যাপারে বিজয়ী সেনাদের মনে ঠিক এই সাইকোলজিই কাজ করে। ক্ষমতা পেয়ে, আইনের শিথিলতায়, শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়ে স্বাভাবিক মানুষও উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বরং জেলখানার চেয়ে যুদ্ধ-পরিস্থিতি আরও 'লুসিফার ইফেক্ট'-এর জন্য অনুকূল। যুদ্ধে কয়েদীর প্রতি প্রতিশোধ বা 'নিজের সম্ভাব্য হত্যাকারী' ভাবার

একটা জাস্টিফিকেশনের (নৈতিক দায়মুক্তি) সুযোগ থাকে। অধ্যাপক জিমবার্ডো তাঁর বই *The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil* বইয়ে ২০০৩-এ আবু গারিব কারাগারে মার্কিন সেনাদের ন্যাক্কারজনক কাজের সাথে এই প্রিজন এক্সপেরিমেন্টের সাদৃশ্য বর্ণনা করেছেন।

'রিদম-০' পারফর্মেন্স আর্ট

আমরা এ সম্পর্কে আরেকটি উদাহরণ দেখবো। সার্বিয়ান শিল্পী Marina Abramovic ইতালির নেপলস শহরে ৬ ঘন্টার একটা পারফর্মেন্স আর্ট করেন, যার নাম দেন 'Rhythm-0'। তিনি একটি থিয়েটারের স্টেজে উঠে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন: আগামী ৬ ঘন্টা আপনারা আমার সাথে যা ইচ্ছে করতে পারেন। আমি বাধা দিবো না, কাউকে পরে এজন্য দায়ীও করবো না। একটি টেবিলে তিনি গোলাপ, পালক, মধু, পাউরুটি, আঙুর, মদ, কাঁচি, ছুরি, গুলিভরা-পিস্তল সহ ৭২টি জিনিস রাখেন।

প্রথমে দর্শকরা তেমন কিছু না, শুধু হাসি-ঠাট্টা করছিল। একটু পর তারা এগ্রেসিভ হয়ে যায়। তারা ছুরি দিয়ে তার কাপড় কেটে অর্ধনগ্ন করে কোলে তুলে পুরো কক্ষ চক্কর দেয়। কেউ ছুরি দিয়ে গলার কাছাকাছি কাটে এবং রক্তপান করে। কেউ তার দুই পায়ের মাঝখান বরাবর ছুরি টেবিলে গেঁথে দেয় ভয় দেখানোর জন্য। আরেকজন পিস্তলটা তার নিজের হাতে ধরিয়ে দিয়ে গুলি করার অভিনয় করেছে, যা ছিল তার জন্য মৃত্যুবৎ

ভীতিকর। Marina বলেছিল, 'ভয়াবহ ৬ টি ঘণ্টা কাটালাম। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম মানসিকভাবে'। এরপর Marina যখন বের হয়ে যাচ্ছিল, দর্শকরা সব দৌড়ে পালাচ্ছিল এই ভয়ে যে, আবার তাদের দায়ী করা হয় কি না।

অর্থাৎ জবাবদিহিতা না থাকার কারণে তাদের মধ্যে 'লুসিফার ফ্যাক্টর' কাজ করেছে। ভরা মজলিসে যদি এগুলো করতে পারে, তাহলে যুদ্ধাবস্থায় যেখানে আইন-শৃঙখলার বালাই নেই, ধামাচাপা দেবার সুযোগের অভাব নেই, ধরা পড়ার ভয় নেই, সেখানে তাহলে মানুষ কী করতে পারে। এমন না যে, মানুষগুলোর মেন্টাল বিল্ড-আপ ভিন্ন ধরনের, আমার-আপনার মতই স্বাভাবিক, সুস্থবুদ্ধি মানুষ, যারা হয়ত নর্মালি এসব কল্পনাও করতে পারতো না।

এবার আপনি চিন্তা করুন উন্মত্ত একদল যুবকের কথা, যারা লড়াই করছে স্বদেশ থেকে শত শত মাইল দূরে। যাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে পরকাল বলে কিছু নেই, জীবন তো একটাই, যা করার করে নাও। পর্নো, মদপান, রক এন্ড রোল যাদের জীবন। হত্যা-ই যাদের লক্ষ্য, হত্যাই যাদের বীরত্ব, হত্যাই যাদের বিনোদন, হত্যাই যাদের পেশা। এক সেক্যুলার আর্মি, যারা বিশ্বাস করে এই জীবনের পর আমার আর কিছু নাই, কোনো জবাবদিহি নাই, সেই একদল উন্মত্ত যুবক অসহায় নারীর সাথে, হাতের মুঠোয় পাওয়া 'শত্রু' 'হত্যাকারী'দের সাথে কেমন আচরণ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

পরাজিত সেনার সাইকোলজি

১৭৪৮ সালে বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক মন্তেস্কু বলছেন:

> "যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধবন্দির একটাই রাইট। আর তা হলো যে, তাকে আঘাত করা হবে না। [L'Esprit des lois (1748; The Spirit of Laws)]

একটু আগেই যে লোকটা আপনাকে হত্যা করতে এসেছিল, সুযোগ পেলে করেই ফেলতো। এখন সে আশা করছে যে তাকে যেন আঘাত না করা হয়। এটাই আপনার কাছে তার সর্বোচ্চ আশা— অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা-WiFi কিচ্ছু চাই না, তুমি যা খুশি কর, শুধু আমাকে 'মেরো না'। এটাই একজন যুদ্ধবন্দির war psychology. বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল রসিকতা করে 'যুদ্ধবন্দি'র সংজ্ঞা দিয়েছিলেন:

“ যে তোমাকে মারতে এসে ব্যর্থ হয়েছে, এখন তোমাকে বলছে আমাকে মেরো না। [১৪৯] (a man tries to kill you and fails, and then asks you not to kill him)

war psychology বলে, যাকে আমি হত্যা করতে গিয়েছি তার কাছে আমার এতটুকুই চাওয়া থাকে বন্দি হবার পর যে, 'আমাকে যেন আঘাত না করা হয়'; ব্যস এতোটুকুই তোমরা করো। খাবার, পানি, বাসস্থান— ওসব তৎক্ষণাৎ দাবি থাকে না। আর স্বাধীনতা-সমতা-অধিকার তো কল্পনায়ই নেই। শুধু আমাকে মেরো না, বাঁচতে দাও আমায়।

বিজয়ীর সাইকোলজি

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক Niall Ferguson একে বলছেন: Captor's dilemma. তিনি বলেন: হাত উপরে তোলা হাঁটু গেড়ে বসা বন্দিটির সামনে বন্দিকারীর হাতে দুটো অপশন— হয় মেরে ফেলো, নয় সারেন্ডার কবুল করো।

সারেন্ডার কবুল করার পিছনে যুক্তি হল বন্দির মূল্য—	যুদ্ধবন্দিকে মেরে ফেলার পিছনে যুক্তি
■ শত্রুপক্ষের তথ্যের সোর্স হিসেবে (সবাইকে রাখার দরকার নেই। সাধারণ সৈনিকদের বাঁচিয়ে রাখার যুক্তি এটা না।)	■ ধোঁকাবাজি করতে পারে
■ শ্রমের উৎস হিসেবে (এটা ভাল যুক্তি। যেমন ফ্রান্স তাদের শ্রমের মুখাপেক্ষী হিসেবে তাদের বন্দিদের সাথে আচরণ ভালই করেছে বলা যায়। কিন্তু আমেরিকা নিজে যুদ্ধবিধ্বস্ত নয় বলে, এদের শ্রমের মুখাপেক্ষী ছিল না। যেজন্য ক্যাম্পে যাচ্ছেতাই করে রেখেছে, ১০ লাখ মরেই গেছে)	■ ঝামেলা এড়ানো (কে বাপু এদের এখন এখান থেকে সরিয়ে ক্যাম্পে নেবে। সেখানেও ফোর্স লাগবে। নিয়ে যেতেও পাহারা হিসেবে ফোর্স লাগবে। ১ম বিশযুদ্ধে বৃটেনের লেগেছে প্রতি ১০ জনের জন্য ২ জন। রিস্কি ব্যাপারটা। আবার এখানে ফ্রন্টলাইনে লোক কম পড়ে যাবে)

[১৪৯] Tsouras, Greenhill Dictionary, p380

- জিম্মি হিসেবে (এখন ধরুন, ফ্রান্স জার্মানিকে যুক্তই করে নেবে নিজের সাথে। তখন জিম্মি হিসেবে রেখে বারগেইন করবে কার সাথে? তখন এসব বন্দিদের নিজের তো কোনো অথোরিটি নেই। ফ্রান্সই তখন তাদের অথোরিটি। তখন জিম্মি ধরার দরকার আর থাকে না)
- আত্মসমর্পণ না করে যুদ্ধ করতে থাকলেও তো সে মারাই পড়ত। আমিও মেরেই ফেললাম, একই তো।
- বন্দির সহকর্মীদের কাছে উদাহরণ রাখার জন্য, যে দেখো যারা সারেন্ডার করেছে তারা ভালো আছে। (এটা remote agency-র একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে, সামনে বিস্তারিত)
- প্রতিহিংসা চরিতার্থ করণ। আমার সহকর্মী-বন্ধুকে এরা হত্যা করেছে। যেহেতু সে এতক্ষণ যুদ্ধ করেছে, আমাদের অনেককে সে মেরেছে। এটা হল self interest. এই self interest আর remote agency-র মাঝে একটা দ্বন্দ্ব আছে।

ঠিক একারণেই যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দিকারীরা বন্দিদের হত্যা করে থাকে, এবং এটা খুবই অহরহ ঘটনা। নিজের ক্ষেত্রে চিন্তা করুন। ধরেন, আপনার বাসায় ডাকাত এসেছে। আপনি একটাকে বেঁধে রেখেছেন, বাকিগুলো পালিয়েছে। আপনি নিজেও আহত, কোপ খেয়েছেন। বাসার লোকজন কমবেশি আহত, সন্ত্রস্ত। বা আপনার সন্তান নিহত (তুলনীয়: যুদ্ধক্ষেত্রে এই শত্রুদের হাতেই আপনার কলিগ-বন্ধু নিহত) আরেকটু হলেই সে আপনাকেও হত্যা করে ফেলতো, সেজন্যই সে এসেছে। আপনার স্ত্রী-সন্তানদের হত্যা করতো, আপনার সম্পত্তি লুট করতো। এখন সে আপনার হাতে বন্দি।

তার উপর আপনার কেমন অনুভূতি হবে? দরদ, মানবতা, ভালোবাসা? নাকি রাগ হওয়াটাই, প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেটাই স্বাভাবিক? আপনি কি তাকে একটা চড়ও মারবেন না? এবং আপনি জানেন, একে পুলিশে দিলে আলটিমেটলি কিছুই হবে না। হয়তো ছাড়া পাবে জেল খেটে, বা মামলা চালাতে আপনারও পয়সা যাবে। হয়তো আপনি এখন ডাকাতটাকে হত্যা করার কথা ভাবতে পারছেন না। কিন্তু নিজে আহত, প্রিয়জন-হারানো সেনার (trained to kill) থেকে এসব সুফিগিরি আশা করা উজবুকি ছাড়া কিছু না। এমন উদারতা খাতাকলমে, এসিরুমে কনফারেন্সে, কনভেনশনে পাওয়া যেতে পারে, যুদ্ধের ময়দানে এসব সুফিগিরি চলে না। একারণেই—

- Legion Magazine (Canadian military history magazine) অকপটে

স্বীকারই করেছে:

> “ যুদ্ধক্ষেত্রে সেনারা বন্দিদের হত্যা করেই থাকে, হয়ত তার কোনো সতীর্থ নিহত হবার রাগে, কিংবা বন্দিকে টানার ঝামেলামুক্ত হতে। এসব যুদ্ধে সবসময় হয়েই থাকে। অবশ্যই কানাডীয় বাহিনীও আত্মসমর্পণের পরও জার্মান সেনাদের হত্যা করেছিল। [১৫০]

- জেনারেল George Patton বলেছেন: যুদ্ধে উন্মত্ত সেনারা ভালো হেফাজতকারী না। [১৫১]

- সেদিকে খেয়াল করে Geneva Convention-ও আর্টিকেল ১২-তে বলছে:

> “ যুদ্ধবন্দিরা শত্রুপক্ষের কাছেই থাকবে, কিন্তু যে আটক করেছে বা যে সেনা ইউনিট তাদের আটক করেছে, তাদের কাছে থাকবে না। [১৫২]

বিজয়ী সেনার psychology হলো: ‘উনিশ থেকে বিশ, আর একটু হলেই সামনের এই লোকটা আমাকে হত্যা করতো’। এখন কি তাকে আমি দয়া দেখাবো? কতটুকু দয়া দেখাব? কতটুকু দয়া দেখানো সম্ভব? এই শয়তানটাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানো কতদিন সাজে? পূর্বেই আমরা দেখিয়েছি, হাতের মুঠোয় অশত্রুকে পেলেই মানুষ বদলে যায়, সেখানে শত্রুকে পেলে কেমন হবে? যুদ্ধের সময় হলে কেমন হবে? আর নিজে আহত বা বেদনাহত সেনার সাইকোলজি কেমন হবে? অন্য সময় জন্তু-জানোয়ারের জন্য চোখের জল ঝরানো দয়ালু মানুষও এসময় মানুষের প্রতি দয়ালু থাকে না। স্বাভাবিক মানবতা, সুকুমারবৃত্তি, সৌজন্য— এসব শব্দ অকেজো কিছু বর্ণ ছাড়া আর কিছুই না এসময়। যুদ্ধ এমনই বাস্তবতা।

ফার্গুসন বলেন: এতে মোটেই আশ্চর্যের কিছু নেই যে, তুমুল যুদ্ধের মাঝে ও শেষে এসব আত্মসমর্পণে কর্ণপাত করা হয় না। এটা কোনো কথা না। আমরা এটাও করাতে চাই। যেকোনো পরিস্থিতিতে নিরস্ত্র শত্রুকে রক্ষা করা প্রয়োজন, যা আপনাদের

---

[১৫০] Legion Magazine (Canadian military history magazine) Was it right to commute Kurt Meyer's death sentence for killing Canadian PoWs? March 16, 2021

"Soldiers kill prisoners on the battlefield because they are angry a friend was killed or feel they can't escort a PoW to the rear. Such acts have always occurred in war. Certainly Canadian soldiers have killed surrendering Germans."

[১৫১] Tsouras, Greenhill Dictionary, p380

[১৫২] Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, 75 U.N.T.S. 135, entered into force Oct. 21, 1950.

Prisoners of war are in the hands of the enemy Power, but not of the individuals or military units who have captured them.

জেনেভা কনভেনশন করতে ব্যর্থ হয়েছে, মি: ফার্গুসন।

শেষরক্ষা

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বলেছেন ফার্গুসন সাহেব, যুদ্ধের পলিটিক্যাল ইকোনমি বুঝতে হলে স্মরণ রাখা দরকার: soldiers in combat have abnormally short time horizons— they discount the future steeply. (যুদ্ধরত সৈনিক 'অস্বাভাবিকভাবে স্বল্পমেয়াদী' চিন্তা করে এবং ভবিষ্যতের চিন্তা তৎক্ষণাৎ বাদ দিয়ে দেয়) তিনি বলেন:

> "The captors dilemma outlined here is really just a variation on the familiar 'agency problem': the 'proprietors', who want prisoners, cannot get their 'remote agents' to override their individual self inerest ie. to kill prisoners.

অর্থাৎ, মারবো নাকি মারবো না— এই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে বন্দিকারী Agency Problem-এ ভোগে: আমার ক্রোধের প্রশমন হবে একে হত্যা করলে (আমার স্বার্থ), যারা চায় (remote agents) যে আমি এদের হত্যা না করে বন্দি করি (তাদের স্বার্থ)। আমার স্বার্থ আমি কেন ছাড়বো? এবং ফলস্বরূপ 'অস্বাভাবিকভাবে স্বল্পমেয়াদী' চিন্তার সৈনিকটি নিরস্ত্র বন্দিকে হত্যা করে ফেলে। এই পয়েন্টে কোনো কনভেনশনই কার্যকর না। এমনিতেও কার্যকর না, সেটা আমরা আগেই দেখেছি। আর এই ক্রিটিক্যাল মুহূর্তে তো কল্পনাই করা যায় না।

আচ্ছা মি: ফার্গুসন, কেমন হয়, যদি এই স্বল্পদর্শী সেনাটিকে তার self inerest হিসেবে 'হত্যার বিকল্প' কিছু দেয়া দেয়া যায় এই মারাত্মক শর্ট টাইমে? সেটা এমন কিছু যাতে সে Agency Problem-এ না ভোগে। সেনাটি যেন নিজের এজেন্সির (কর্তৃত্ব) ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে। এই রাস্তাটা কিন্তু রয়ে গেছে, যেই সময়ে জেনেভাও নিশ্চয়তা দিতে পারে না, সেই সময়ে এই সাইকোলজি তাকে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। এই একটাই পন্থা আছে বিজয়ীর প্রতিশোধের war psychology থেকে শত্রু বন্দিকে রক্ষা করার। যদি ব্যবস্থাটা এমন হয় যে, তাকে মারলে উল্টো 'আমারই লস' হবে? এমনটা কখন হবে? এটা শুধু তখনই সম্ভব, যখন 'তার বেঁচে থাকা' বা 'তার অক্ষত থাকা' আমার জন্য লাভজনক হবে? বন্দির একমাত্র চাওয়া-টা (আঘাত না পাওয়া) তখনই বিজয়ী দ্বারা পূরণ হবে, যদি এর সাথে অর্থের প্রাপ্তিযোগ থাকে। একমাত্র

এর সাথে পার্থিব লাভক্ষতি শামিল থাকলে, বন্দির বাঁচার সম্ভাবনা বাড়ে। এটাই পরস্পরের war psychology-র মিলনবিন্দু (merging point)। বন্দি তখনই পূর্ণ নিরাপত্তা ও মৌলিক সকল রসদ পাবে, যখন তাকে নিরাপত্তা প্রদান 'বন্দিকারীর জন্য হবে লাভজনক'। তখন সে বন্দিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, ভালো রাখার জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি থাকবে। আর সেই লাভগুলো কী?

১. নিরাপদ রাখলে, অক্ষত রাখলে, স্বাস্থ্যবান রাখলে ভালো মুক্তিপণ চাওয়া যাবে।

২. যখন সে আমার possession (সম্পত্তি) হবে অর্থাৎ, তার ক্ষতি মানে আমার ক্ষতি। আর তাকে বাঁচিয়ে রাখলে, ভালো খাওয়ালে আমারই লাভ। হয় কাজ নিতে পারা যাবে, নয়তো ভালো দামে বেচা যাবে।

এ কথাটাই প্রোফেসর ডেভিস বলেছেন:

> “ সেসময়কার ও পরবর্তী গবেষকদের মতে, **দাসমালিকেরা এতটুকু জ্ঞানসম্পন্ন ছিল যে, মূল্যবান সম্পদের কোনো ক্ষতি যেন না হয়...** [কুরআনের] তাগিদের চেয়ে **স্রেফ নিজ স্বার্থরক্ষার মানসিকতাই** তাদেরকে দাস-পরিচর্যায় উৎসাহিত করত, যে মানসিকতাটা নিজের মূল্যবান সম্পদ নিজেই ধ্বংস করতে আমাদের বাধা দেয়। কিছু দাস এটাই বিশ্বাস করত যে, কোনো মহানুভবতা নয়, বরং মালিকের 'ভালো দাম পাবার লোভ'ই তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে'। [১৫৩]

আর পূরণ হবে বন্দির একমাত্র চাওয়া: আমাকে আঘাত করা না হোক। সোকল্ড সমতা-স্বাধীনতা তার মাথায়ই নেই তখন। ইনফ্যাক্ট এসব কাগুজে মৌলিক অধিকার তাদেরকে দেয়াও হয়নি বাস্তবে, যা আমরা আগে দেখে এসেছি। আমরা নীতিবাক্য আউড়াচ্ছি না, আমরা ব্যবহারিক বাস্তব সাইকোলজির কঠোর ভাষায় কথা বলছি। লোকটা আমাকে হত্যা করতে এসেছিল, এখন সে বন্দি। কখন তাকে আমি মারবো না, কখন আমার প্রতিশোধস্পৃহাকে দমিয়ে তাকে আমি আঘাত করবো না? কী চিন্তা আমার মাথায় এলে আমি 'আমার ক্ষতিকারক'কে কোনো ক্ষতি করব না, তার কোনো ক্ষতি হতেও দেবো না? war psychology অনুসারে ঠিক এই কারণেই তাকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারি, যদি সে আমার জন্য নগদ লাভজনক সাব্যস্ত হয়। নয়তো তাকে হত্যা করাই উত্তম ছিল— বসিয়ে খাওয়ানোর পয়সা বেঁচে যেত, মনের ঝালও মিটতো। ইসলাম 'এসিরুমে বানানো গালভরা totally impractical কিছু ধারা-উপধারা'র নাম না। মানুষের বায়োলজি-সাইকোলজির স্রষ্টার বানানো জীবন-দর্শনের নাম, জীবন-বিধানের নাম ইসলাম। মাঠে আসলেই যে সমস্যা হয়, সেটা সমাধানের

---

[১৫৩] Robert C. Davis, Christian slaves, Muslim masters, p69, 94

জন্য কোন সময়ে সাইকোলজির গতিপথকে কীভাবে সরিয়ে নিতে হবে, কোনদিকে নিতে হবে— সেভাবে ইসলাম তার নির্দেশনা ঠিক করে। আজ ইসলামে দাসপ্রথা আছে বলেই লোকটা প্রাণে বেঁচে গেল। নয়তো war psychology অনুযায়ী তাকে হত্যাই করা হতো, যেটা মোঙ্গলরা করেছে, আধুনিক কালেও প্রতিটা যুদ্ধে এমন ঘটনা ঘটেছে, কারও কোনো দায় নেই।

বন্দি শত্রুকে সম্পত্তিতে পরিণত করাই রক্ষা করেছে তার জীবন। ইসলামের দাসপ্রথা বহাল রাখা কাফিরদের জন্য এক রহমত। তাই যুদ্ধবন্দিদেরকে ডিটেনশান ক্যাম্পে মানবেতর জীবনের দিকে না ঠেলে দিয়ে দাসপ্রথার উপযোগিতাকে ইসলাম ব্যবহার করেছে। করার পর তাদেরকে social reintegration করা, সামাজিক একটা স্ট্যাটাস দিয়ে productive মানুষে পরিণত করে ইসলাম তার লক্ষ্য অর্জন করেছে। একটা সময় এই দাসেরা মুক্ত হয়েও আর ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ তো করেইনি, বরং জ্ঞান-শাসন-যুদ্ধের দ্বারা ইসলামের পক্ষে অসামান্য অবদান রেখেছে, যা স্বাধীন মুসলিমরাও পারেনি। এর চেয়ে বেস্ট সলিউশান আর কী হতে পারে, যা ইসলাম করেছে। যা আজকের সভ্য সভ্য কনভেনশনও পারেনি।

দাসপ্রথার অপকার

আগে আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, সারা পৃথিবী জুড়ে সর্বযুগে দাস বানানোর ৫টি সোর্স ছিল:

	দাসের উৎস	ইসলামের সিদ্ধান্ত
১.	দেনার দায়ে নিজেকে বিক্রি	যাকাতের দ্বারা এসব লোকের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।
২.	অভাবের ফলে সন্তানকে বিক্রি	
৩.	অপহরণ করে বিক্রি	দণ্ডনীয় অপরাধ
৪.	দাসীর সন্তান	দাসীর গর্ভে মালিকের সন্তান স্বাধীন ও ওয়ারিশ। দাসীর গর্ভে দাসের সন্তান দাস।
৫.	কাফির যুদ্ধবন্দি	বহাল রেখেছে

১-২-৩ ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো কাফিরও নিজেকে বা তার সন্তানকে বিক্রি করতে পারবে না, কিংবা কাফিরকে অপহরণ করে বিক্রয় করা যাবে না। কাফির সেনা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বে ছিল না। যুদ্ধের সুযোগে (হারবী কাফির) ইসলাম তার 'লক্ষ্য' অর্জনের উপযোগিতায় তাকে দাসত্বে আবদ্ধ করেছে, উপকারটুকু গ্রহণ করেছে—

– ইসলামকে প্রবল করা
– কুফরকে হীন করা
– মুমিনদের উপকৃত করা
– কাফিরের প্রাণ বাঁচিয়ে হিদায়াতের পরিবেশে রাখা
– কাফিরের ভরণপোষণের ব্যবস্থা

ইসলামের লক্ষ্যের সাথে ১-২-৩ সম্পর্কহীন। উপযোগিতাহীন বলে দাসপ্রথার অপকারগুলোই কেবল পুরোমাত্রায় ১ম ৩টিতে বিদ্যমান। আর কেবল অপকারগুলো দিয়েই আমরা দাসপ্রথাকে চিনি।

দাসপ্রথাকে আমরা কীভাবে চিনি?

আমরা যারা সাধারণ মানুষ, 'দাসপ্রথা' শব্দটা শুনলেই আমাদের মনে ফুটে ওঠে একটা গা-শিউরানো চিত্র। কালো কালো মানুষ... শেকলে বাঁধা, বেড়ী পরা... বন্দি... চাবুক দিয়ে পিটিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। গরু-ছাগলের মতো তাদের দেহে গরম ধাতু দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। বিটিভিতে একটি ড্রামা সিরিয়াল হতো— *The Queen*, যা এলেক্স হ্যালির বিখ্যাত উপন্যাস *Roots: The Saga Of An American Family* অবলম্বনে বানানো হয়েছিল। দাসদের প্রতি আমেরিকায় যে অমানবিক

নির্যাতন করা হত, তা এতে ফুটে উঠেছে। আবার হ্যারিয়েট বিচার স্টো-র *Uncle Tom's Cabin* উপন্যাসেও আমরা আমেরিকান দাসপ্রথার ভয়াবহ চিত্রটি পাই— যেখানে তুলোর ক্ষেতে তাদেরকে দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করান হচ্ছে, দাসমালিক মিস্টার লেগ্রি টার্গেট পূরণ না করার দোষে অসুস্থ দাসদাসীদের চাবুকপেটা করছে, আংকেল টমের শিশু সন্তানকে দেনার দায়ে মালিক বিক্রি করে দিচ্ছে, মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে বাচ্চাকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে ক্রেতাপক্ষ।

দাস বলতে যতগুলো চিত্র আমাদের মনে ভেসে ওঠে, এই সবগুলো চিত্রই ইউরোপ-আমেরিকার দাসপ্রথার চিত্র। ৩০০ বছর ধরে আটলান্টিক মহাসাগরে ৩৬,০০০ বার জাহাজ আসা-যাওয়া করেছে শুধুমাত্র দাস আনা নেওয়ার জন্য এবং প্রায় ১২.৫ মিলিয়ন (১ কোটি ২৫ লাখ) আফ্রিকানকে আমেরিকাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে 'অপহরণ' করে [১৫৪]। এটাকে বলে 'Transatlantic Slave Trade'। ইতিহাসের
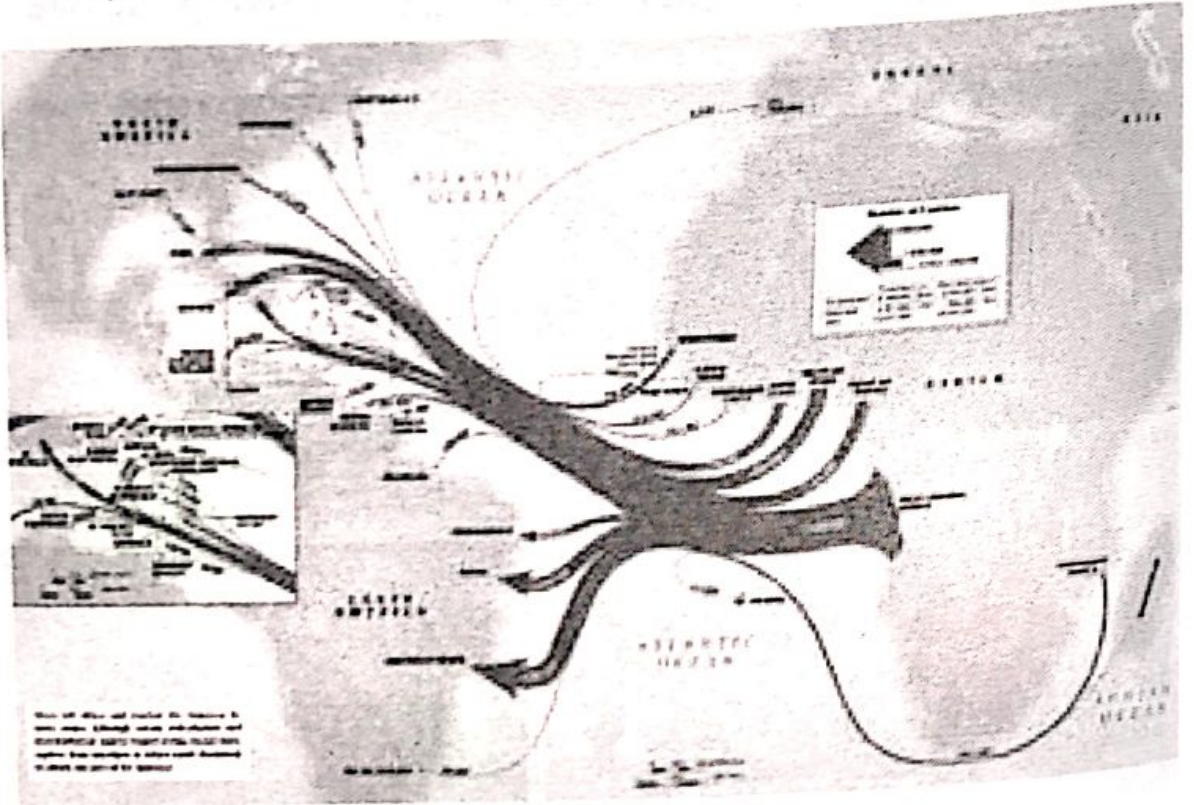
[১৫৪] আফ্রিকা থেকে ইউরোপ আমেরিকায় এই দাসব্যবসাকে বলা হয় 'ট্রান্স আটলান্টিক দাসব্যবসা'। এই সাইটে বিস্তারিত সব তথ্য পাবেন http://www.slavevoyages.org/ এই সাইটের পার্টনারদের তালিকা দেখলেই গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে না।

> The Trans-Atlantic Slave Trade Database has information on almost 36,000 slaving voyages that forcibly embarked over 10 million Africans for transport to the Americas between the sixteenth and nineteenth centuries. The actual number is estimated to have been as high as 12.5 million.

ওদের ডাটাবেসে রেকর্ড করেছে ৩৬০০০ বার দাস শিপিং হয়েছে। যাতে নেয়া হয়েছে ১০ মিলিয়ন বা সাড়ে ১২ মিলিয়ন দাস, জোরপূর্বক জাহাজে তোলা হয়েছে তাদেরকে।

অন্যান্য দাসপ্রথা থেকে আলাদা করতে এই আটলান্টিক দাসপ্রথাকে বলা হয় Chattel Slavery, যেখানে মালিকই দাসের জীবন-মৃত্যুর কর্তা। পশ্চিমের অভিজ্ঞতায় দাসপ্রথা মানেই Chattel Slavery. বৃটিশ পর্যটক Eldon Rutter সেটাই লিখেছেন:

> “ মূল পয়েন্ট থেকে সরে না গিয়ে আমি এটুকু স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি, 'দাসপ্রথা' শব্দটা আমাদের কানে একটা বিশেষ অর্থের দ্যোতনা দেয়। আমরা Olmstead-এর Journey through the Sea-board Slave States পড়েছি, কিংবা আমেরিকার দক্ষিণী রাজ্যগুলোতে দাসদের কৃষিজীবনের (plantation life) আরও ভয়াবহ বিবরণ হয়তো পড়েছি। ফলে 'দাসপ্রথা' শব্দটা শুনলেই আমরা কেঁপে উঠি— দাসদের উপর যে দৈহিক নিষ্ঠুরতা চালানো হয়েছে তার দরুন। [১৫৫]

দাসপ্রথার এই চরম স্বেচ্ছাচারী রূপটিকেই আমরা 'দাসপ্রথা' নামে চিনি। অথচ একই সময়ে সারা পৃথিবীতে নানান মাত্রার দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। নানান মাত্রার মনিব-দাস সম্পর্ক, নানান কিসিমের বাধ্যশ্রম ছিল নানান সমাজে। [১৫৬]

- ১৪০০-১৯০০ এর মাঝে মালয় উপদ্বীপে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের ৫টি প্রকার বা স্তর ছিল। বৃটিশরা যখন সেখানে গেল, এই ৫টি শব্দের একটাই অনুবাদ তারা করতে পেরেছিল— slave। এবং মালয়ে 'Free' এর সমার্থক কোনো শব্দই ছিল না, সবাই এই ৫ প্রকারের কোনো না কোনো লেভেলে পড়ে যেত [১৫৭]।
- অটোমান দাসপ্রথা বিশেষজ্ঞ Nur Sobers Khan দেখান যে, শুধু ইস্তাম্বুল শহরেই দাসপ্রথার এতো প্রকার যে, এটাকে একক কোনো ধারণায় আবদ্ধ করা যায় না একটা শহরেই, পুরো সাম্রাজ্যে তো দূরে থাক।
- দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ Anthony Reid বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কীভাবে শুরু থেকেই slavery studies ফিল্ডে এই দাসপ্রথার সংজ্ঞা নিয়ে হিমশিম চলছে। এর মধ্যে এমন দাসত্বও আছে যা গা শিউরে তোলে, আবার এমন ক্যাটাগরিও আছে, যাকে আসলে দাসত্ব বলাই যায় না। [১৫৮]

---

[১৫৫] Eldon Rutter (1933) Slavery in Arabia, Journal of The Royal Central Asian Society, 20:3, 315-332

[১৫৬] Jonathan Brown, Slavery & Islam.

[১৫৭] Reid, 21; V. Matheson and M. B. Hooker, 'Slavery in the Malay Texts: Categories of Dependency and Compensation,' 184-86.

[১৫৮] Anthony reid, introduction: slavery and bondage in south-east Asian history, p1

- স্কটিশ Economic Historian জন মিলার বলেন:

> “ দাসপ্রথার ধারণাটা এক কথায় সংজ্ঞায়িত করাটা অসম্ভব, কেননা ঠিক কতটুকু অধীনতাকে আপনি দাসপ্রথা বলবেন, এটা অস্পষ্ট। নানান দেশে দাসপ্রথার নানান রকম অর্থ। [১৫৯]

- Yale University-র ইতিহাসের প্রফেসর Robert Harms এর মতে : ইসলামে মনিব-দাস সম্পর্কটা ভালো বুঝা যায় অভিভাবক সম্পর্ক থেকে (patron-client relationship)। যদি আমেরিকান দাসপ্রথার সাথে তুলনা দেন, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দাসপ্রথায় দাসত্বের সংজ্ঞাই ঠিক করা যায় না।

- বৃটিশ পর্যটক Eldon Rutter-এর মন্তব্য:

> “ আমেরিকার দক্ষিণী রাজ্যগুলোতে দাসদের কৃষিজীবনের (plantation life) আরও ভয়াবহ বিবরণ হয়তো পড়েছি। ফলে ‘দাসপ্রথা’ শব্দটা শুনলেই আমরা কেঁপে উঠি— দাসদের উপর যে দৈহিক নিষ্ঠুরতা চালানো হয়েছে তার দরুন। [১৬০] তাই যদি হয়ে থাকে, তবে **আমাদের আসলেই একটা নতুন শব্দ খুঁজে নিতে হবে তুলনামূলক লঘু ‘আরবীয় দাসপ্রথা’ (riqq) বুঝাতে, এবং 'দাস' এর বদলে আরেকটা শব্দ নিতে হবে ‘আরব দাস’ (‘abd) বুঝাতে।**

তাহলে বুঝা গেল পুরো দুনিয়ায় পুরো মানবেতিহাসে দাসপ্রথাকে যে একটাই চিত্রে চিত্রিত করা হচ্ছে, এটা একাডেমিয়াতে চলে না। দাসপ্রথাকে 'Free-Slave' Binary তে, মানে কেবল এই দু'টি প্রকারে সীমাবদ্ধ রেখে বুঝাটা বাস্তবতা-বিবর্জিত। বরং বাস্তবতা এটাই যে, পুরো মানবেতিহাস ও পুরো দুনিয়া জুড়ে দাসপ্রথার নানান স্তর, নানান মাত্রা, নানান রকম-সকম ছিল। যার সবগুলোকে এক সংজ্ঞায় আনা যায়নি, আনা যায় না। বিষয়টি সামনে আরও স্পষ্টতর হতে থাকবে। পর্যটক Eldon Rutter কথাটি নেগেটিভলি বললেও, তা খুব বুঝার দাবি রাখে:

> “ [এতে] কোনোই সন্দেহ নেই যে, **দাসপ্রথার ‘মুহাম্মদীয় সহজ ধরন’ তৈরি করে তোলে ‘সন্তুষ্ট দাস’**। এবং ঠিক এ কারণেই আমি একে দাসপ্রথার আর সব ধরন থেকে বেশি খারাপ মনে করি, **যা দাসদেরকেও নিজেদের অধীনতার ব্যাপারে সন্তুষ্ট করে তোলে।** আর মালিকদেরকেও এমন করে ফেলে, যেন মানুষ কেনাবেচা কিছুই না। [১৬১]

---

[১৫৯] John w. cairns, the definition of slavery in eighteenth century thinking, p64

[১৬০] Eldon Rutter (1933) Slavery in Arabia, Journal of The Royal Central Asian Society, 20:3, 315-332

[১৬১] ibid.
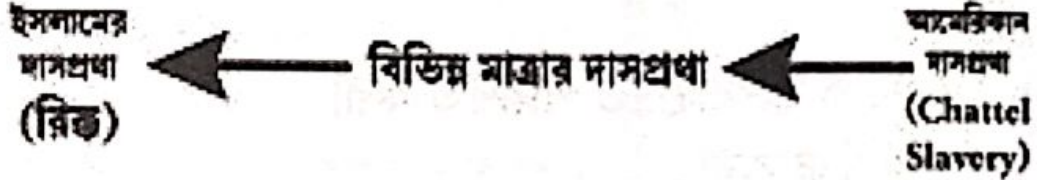
এ কেমন দাসপ্রথা, যা দাসকে পরাধীনতায় সন্তুষ্ট করে ফেলে? তাহলে এই চিত্র কি মিললো আমাদের চশমা আঁটা ইউরোপীয় দাসপ্রথার সাথে? একাডেমিকরা 'দাসপ্রথা'র কোনো নির্দিষ্ট চিত্রকে সার্বজনীন করতে না পারলেও, আমরা কিন্তু ঠিকই এই বর্বর চিত্রগুলোকে সার্বজনীন ধরে নিয়েছি, যেন ইসলাম ঠিক ঐ দাসপ্রথাকেই বজায় রেখেছে। সুতরাং লট ধরে দাসপ্রথাকে না বুঝে বরং একে একটা স্পেকট্রাম হিসেবে বুঝাটাই ন্যায়সঙ্গত ও সত্যের কাছাকাছি। যার চরম প্রান্তে থাকবে আমেরিকান Chattel Slavery, যেখানে মালিকই দাসের জীবন-মৃত্যুর কর্তা। আর বিপরীত প্রান্তে থাকবে ইসলামের দাসপ্রথা, যা নানান অধিকার-আইনের বেড়াজালে এক সামাজিক সম্পর্ক, যা দাসকে করে ফেলে সন্তুষ্ট। আর মাঝে থাকবে নানান মাত্রার পরাধীনতা সম্পর্ক।

তেল-আবিব ইউনিভার্সিটির প্রফেসর Ehud Toledano বলেছেন :

> “ slavery as practiced in this part of the world can best be understood as existing on a continuum rather than as a dichotomy of “slave” and “free,” [১৬২]

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপিকা Shaun Marmon ইসলামে দাসের অবস্থানকে বলেছেন 'hybrid status' যা তাদেরকে নানান ভূমিকা রাখার সুযোগ দিত, যা প্রায়শই দাসত্ব-স্বাধীনতার সীমা বজায় থাকত না। এই অস্পষ্ট সীমারেখার দরুন আমীর থেকে নিয়ে ফকীর– অত্যাশ্চর্য সব সামাজিক ভূমিকায় দাসদের অবতীর্ণ হতে দেখি আমরা। [১৬৩]

এরপরও দাসত্ব ইসলামের লক্ষ্য না, যার দরুন দেখা যায় ইসলাম ব্যাপক হারে

[১৬২] Slave Elites, 159–175.
[১৬৩] Shaun Marmon (1999) Slavery in Islamic Middle East

দাসমুক্তি-কে প্রোমোট করেছে। ইসলামের লক্ষ্য অর্জনে দাসত্ব একটা টুল বা মাধ্যম, যার উপকারিতা নেয়া হবে, অপকারিতাকে হ্রাস বা বিলোপ করা হবে। এবং লক্ষ্য অর্জনের পর মুক্তি দেয়া হবে। দাসপ্রথার অপকার বা ক্ষতিগুলো ইসলাম কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে, আলোচনা হোক চলুন।

১. মানুষকে সম্পত্তিতে পরিণত করা ও বেচাবিক্রি করা

মালিকানা কী? মালিকানা হল একগুচ্ছ অধিকার: ব্যবহারের অধিকার, বাদ দেবার অধিকার, ধ্বংস করবার অধিকার, বিক্রয় করার অধিকার। দাসত্বের ধারণাটা পশ্চিমে এভাবে বুঝা হয়ে থাকে 'মানুষকে বস্তুর মর্যাদায় নামিয়ে এনে সম্পত্তি বানানো'। এরিস্টটল বলেছেন: 'জীবন্ত সম্পত্তি'। সম্পত্তি মানে হল: একে ব্যবহার করা, বিক্রয় করা, ধ্বংস করা ইত্যাদির অধিকার রয়েছে মালিকের। আটলান্টিক দাসপ্রথা বা Chattel slavery-তে এই মালিকানা ব্যাপারটা ছিল পুরোমাত্রায়। মালিকানার সবগুলো অধিকারই, এমনকি ধ্বংসের অধিকারও। দাসপ্রথা বিশেষজ্ঞ Suzanne Miers লেখেন:

> পশ্চিমা সমাজে 'মানুষকে দাস বানানো' বলতে Chattel slavery-কে বুঝা হয়, যেখানে মালিকের পূর্ণ ইচ্ছাধীন থাকে আরেকটা মানুষ, এমনকি তার জীবন-মৃত্যুর অধিকারও মালিকের। [১৬৪]

আমেরিকার দক্ষিণ কলোনীগুলোতে 'দাস আইন' ছিল যদিও এবং নর্থ ক্যারোলিনা-ভার্জিনিয়াতে কয়েকজন দাসমালিককে কয়েদ করাও হয়েছিল এই আইনে। কিন্তু সাধারণত যেটা হত, মালিক দাসের হাত-পা কাটা, খোজা করে দেয়া এবং হত্যা করতে পারত, যদি তার কাছে মনে হত যে, দাসটি মারাত্মক কোনো অপরাধ করেছে। দাসের পক্ষে আদালতের দারস্থ হওয়াটা ছিল প্রায় অসম্ভবই।

কিন্তু মালিকানার এই একচ্ছত্র কনসেপ্টটা সবখানে একরকম না। কোথাও কোথাও মালিক সবগুলোই করতে পারে। আবার কোথাও সবগুলো করতে পারে না, তারপরও সে মালিক। যেমন: আপনি চাইলেই আপনার কুকুর বা গরুকে মেরে ফেলতে পারেন না। আবার এমন শর্তে জমি লিখে দেয়া যায় যে, জমি ভোগ করতে পারবে, কিন্তু বিক্রি

---

[১৬৪] Miers, slavery: a question of definition, p2-3

করতে পারবে না। অর্থাৎ মালিকানা মানেই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব না, এর মাঝে চুক্তি-শর্ত-বিধিনিষেধ আছে। সেক্ষেত্রে মালিকানার অর্থ সাধারণভাবে দাঁড়ায় 'সীমিত অধিকার ও ব্যবহারের ক্ষমতা'। যদি 'মালিকানা' মানে হয় মানুষের উপর 'সীমিত অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ', তাহলে তো আধুনিক পুঁজিবাদী কর্পোরেট কালচারও নানানভাবে অধীনস্থকে মালিকানায় নিয়ে আসে।

যেমন ধরুন, আপনি যে কোম্পানিতে চাকুরি করেন, মাসিক বেতনে আপনি নির্দিষ্ট একটা সময়ব্যাপী তার কাজ করতে বাধ্য। 'চাকুরি' শব্দটা এসেছে কিন্তু 'চাকর' থেকেই। অর্থাৎ 'মাসিক বেতনের শর্তে' কোম্পানি আপনার উপর অধিকার লাভ করেছে। আচ্ছা ধরেন, কোম্পানি তো আপনাকে বেতনের বদলে শুধু খাওয়া-পরা-থাকা-বাহনের শর্তেও চাকুরিতে নিয়োগ দিতে পারে। বেতন দিবে না, জাস্ট বেতন দিয়ে আপনি যা যা করতেন সেগুলো দেবে। সমস্যাটা একটাই রইল—ভোগের ক্ষেত্রে আপনার পছন্দ রইল না। সাবান যেটা কোম্পানি দেবে, সেটাই ব্যবহার করতে হবে। যেটা সমাজতান্ত্রিক দেশেও থাকে না, বা সীমিত থাকে। এই পয়েন্টটা মনে রাখা জরুরি। ভোক্তা হিসেবে স্বাধীনতা কেন ইম্পর্টেন্ট? সামনে লাগবে। তবে আমরা কিন্তু 'ইসলামের দাসপ্রথা'টার কনসেপ্টের কাছাকাছি চলে এসেছি কর্পোরেট স্লেভারির দ্বারা। ব্যক্তিসত্তার উপর অধিকার, আমার সময়ের উপর অধিকার, আমার গতিবিধির উপর অধিকার, আমার ভোগের উপর অধিকার— স্বাধীন লোক আজও এগুলো অনুমোদন দেয়। এগুলোও ইসলামের দাসপ্রথার মৌলিক সমস্যা নয়।
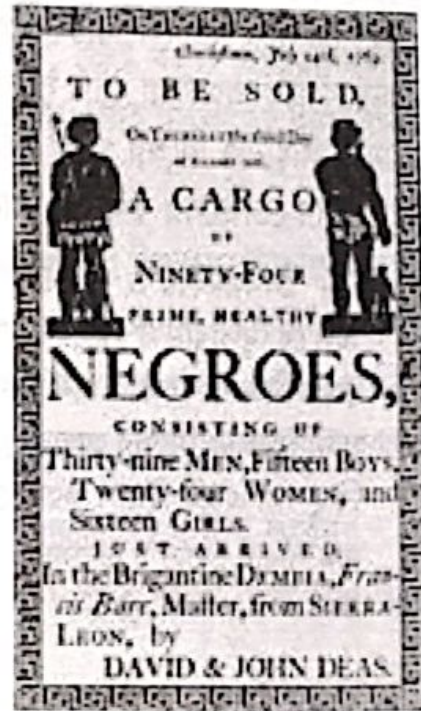
মৌলিক সমস্যা হল: মানুষকে পণ্য হিসেবে বেচাকেনা করা। অথচ এই ব্যাপারটুকুই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই Property-feeling কে কাজে লাগিয়েই ইসলাম এমন সময় তাকে বাঁচিয়েছে, যেখানে কোনো আদেশ-আইনই কার্যকর নয়। হত্যার করার সকল যুক্তিকে পরাস্ত করে ইসলাম তার জন্য সুখাদ্য, সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করেছে এই 'সম্পত্তি-করণ'কে ব্যবহার করে। যে মানবতার অপমানের কথা বলা হচ্ছে, সে মানবতার অস্তিত্বই নেই যদি এইটুকু না থাকে, তাকে হ্যান্ডস-আপ অবস্থায়ই শেষ করে দিয়ে আসা হয়েছে। মান-অপমানের আগে জীবনের নিশ্চয়তা, জীবনই যেখানে

নেই, সেখানে মান-অপমানের প্রশ্ন আসে না। সুতরাং এই সম্পত্তি বা পণ্যায়ন বা কেনাবেচাকে প্রশ্ন করা মানে যুদ্ধবন্দির বেঁচে থাকার সম্ভাবনাকে নাকচ করা। যেমনটি আমরা আধুনিক বিশ্বের পুরো ইতিহাস জুড়ে দেখলাম, কোনো কাগজই যা পারেনি। প্রোফেসর ডেভিসের কথাটিই আবার মনে করিয়ে দিতে চাই:

> " সেসময়কার ও পরবর্তী গবেষকদের মতে, **দাসমালিকেরা এতটুকু জ্ঞানসম্পন্ন ছিল যে, মূল্যবান সম্পদের কোনো ক্ষতি যেন না হয়...** [কুরআনের] তাগিদের চেয়ে **স্রেফ নিজ স্বার্থরক্ষার মানসিকতাই তাদেরকে দাস-পরিচর্যায় উৎসাহিত করত, যে মানসিকতাটা নিজের মূল্যবান সম্পদ নিজেই ধ্বংস করতে আমাদের বাধা দেয়।** কিছু দাস এটাই বিশ্বাস করত যে, কোনো মহানুভবতা নয়, বরং মালিকের 'ভালো দাম পাবার লোভ'ই তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে'। [১৬৫]

২. স্বাধীনতাহরণ

ধরুন, আপনি। নিজেকে কল্পনা করুন। আপনি শত্রুদেশে থাকেন, যাদের বিরুদ্ধে আপনি একসময় যুদ্ধও করেছেন, এমন 'at war' শত্রু। আপনাকে তারা বন্দি করে এনেছে। এখান তারা আপনাকে...

* জেলখানায় গরাদের ওপারে রাখেনি,
* ডিটেনশনক্যাম্পের মত অখাদ্য খেতে দেয় না,
* গুয়ান্তানামো-বাগরাম-আবুগারিব কারাগারের মত ইলেক্ট্রিক শক, ওয়াটারবোর্ডিং এসব টর্চারও করে না ...
* আপনি বাসায় বা জমিতে কাজ করেন-
* হাট-বাজারে যেতে পারেন-
* মনিব যা খায়, তাই আপনাকে খাওয়ায়-
* মনিব যা পরিধান করে, আপনাকে সেই কাপড়ই পরিধান করতে দেয়-
* আপনাকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়-
* আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করে-
* আপনি যোগ্য হলে শিক্ষক হতে পারেন-
* এমনকি আপনি ওদের সেনাবাহিনীর জেনারেলও হতে পারেন।

পশ্চিমের ঐ 'দাসপ্রথা'র চিত্রটা চোখ থেকে সরাবেন না। ঐ পশ্চিমা চশমা পরেই বলুন, আপনি কি নিজেকে দাস বলবেন? পশ্চিমারা কি আপনাকে দাস বলবে? এমন

[১৬৫] Robert C. Davis, Christian slaves, Muslim masters, p69, 94

একজন লোককে কেউ দাস বলবে? বর্তমানে বেতনভুক্ত কাজের লোকের সাথেও তো এতো উত্তম আচরণ করা হয় না। তাই না? জি, কেউ বলুক আর না বলুক, আপনি কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের একজন দাস। ঠিক উপরের এটাই ইসলামের অনুমোদিত দাসপ্রথার চিত্র।

David Graeber দাসের একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন যা সব কালচারেই সাথেই যায়, সব ধরনের দাসের ক্ষেত্রেই কমন ছিল। তাঁর মতে: দাস হল সে, 'যার কোনোকিছু করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে রেখেছে অন্য কেউ (যেমন: দাসমালিক)। কিন্তু মালিক যতটুকু অনুমোদন দেয়, তার ভিতর সে সবকিছু করতে পারে'। পরের কথাটুকুই বুঝার।

অক্সফোর্ডের দার্শনিক Isaiah Berlin স্বাধীনতাকে দুটো ভাগে ভাগ করেন:

- Negative freedom: বাধা না দেয়া। আমার যতটুকু কাজে কেউ বাধা দেবে না।
- Positive freedom: করতে দেয়া। আমাকে যতটুকু করতে দেয়া হবে [১৬৬]।

এনলাইটেনমেন্ট পরবর্তী সময়ে এই নেগেটিভ ফ্রীডমকেই ফ্রীডম-মুক্তি-স্বাধীনতা বলে সামনে আনা হয় বার বার। আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। বাধা আছে মানেই মুক্তি নাই, সকল বাধাকে ভাঙতে হবে, ন-ডরাই— এগুলো পুঁজিবাদী নিও-কলোনিয়াল কনস্ট্রাক্ট, যা অধিক ভোগে উৎসাহিত করে। পরিবারে বাবা সন্তানের মাঝে deterred gratification তৈরি করে— 'এখন না বাবা, পরে কিনে দেব'। বাবা না থাকলে সেই পরিবারের সন্তান হয়ে উঠবে compulsive consumer, মানে হলো সে পণ্য কিনতেই থাকবে, ভোগ বাড়াতেই থাকবে— এই মানসিকতার। [১৬৭] নতুন এই অর্থব্যবস্থা তো তা-ই চায়, ক্রেতা বাড়ানো। সুতরাং পরিবারকে ভেঙে দাও, নারীকে মুক্ত করো। আগে স্বামী-স্ত্রী মিলে এক ইউনিট ভোক্তা। এখন স্বামী আলাদা ভোক্তা, স্ত্রী আলাদা ভোক্তা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থ কাঠামোর পক্ষে এই Negative freedom-ই জরুরি।

আর বিপরীতে নৃতাত্ত্বিক Igor Kopytoff এবং Suzanne Miers এর মতে, যেসব সমাজে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মত শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক নেই, সেখানে স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতার ভিতরে মুক্তি নেই (freedom doesnot lie in autonomy)। বরং

---

[১৬৬] Isaiah Berlin, Two Concept Of Liberty

[১৬৭] Aric Rindfleisch et al. (1997). *Family Structure, Materialism And Compulsive Consumption,* Jounal of Consumer Research, vol 23, no.4, pp. 312-325

সেখানে শক্ত, রক্ষণশীল এবং বাধা-প্রদানকারী সামাজিক স্ট্রাকচারেই মুক্তি নিহিত, যেমন পরিবার। [১৬৮] এটাই পজিটিভ ফ্রীডম। দাসপ্রথা নেগেটিভ ফ্রীডমকে সীমিত করে। কিন্তু নেগেটিভ ফ্রীডম সংকুচিত হলেও পজিটিভ ফ্রীডম বিকশিত ও ঈর্ষণীয় হওয়া সম্ভব। জোনাথান ব্রাউন এখানে সোকুলু মেহমেত পাশার উদাহরণ টেনেছেন, যিনি উসমানী খিলাফতের একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর–

- তার স্ত্রী হল সুলতানের মেয়ে
- সন্তানেরা উচপদস্থ কর্মকর্তা
- বলকানে তার নিজ এলাকায় খ্রিস্টান আত্মীয়রা উঁচু পদে।
- নিজের ভাইকে খ্রিস্টান অর্থোডক্স চার্চের বলকান এলাকার বিশপ নিয়োগ।
- তার পর প্রধানমন্ত্রী হন তারই চাচাতো ভাই।

সুতরাং স্বাধীনতার নির্দিষ্ট মাত্রার খর্বকরণ যে সবসময়ই খারাপ, ব্যাপারটা তা নয়। ইসলামের স্বর্ণযুগের প্রায় ১০০০ বছর পর ১৫শ-১৮শ শতকে উত্তর আফ্রিকার ৩টি শহরে (আলজিয়ার্স, ত্রিপোলি, তিউনিস) খৃষ্টান দাসদের অবস্থা নিয়ে Ohio state University-র ইতিহাসের প্রফেসর Robert C. Davis একটি বই লেখেন– *'Christian slaves, Muslim masters'*. এই খৃষ্টান ইতিহাসবিদ অস্বীকার করতে পারেননি—

> "যাদের ব্যক্তিমালিকানাধীন দাস (private slaves) বলা হত, তারা অনেক ভালো আচরণ পেত, যদিও কড়া নজরদারির ভিতরেই। তাদের অনেকে তো নিজস্ব ব্যবসাও চালাতো, আবার কেউ কেউ নিজেও দাস রাখত, তবে অধিকাংশই মালিকের এগ্রোফার্মে বা ব্যবসায় কাজ করতো বা অন্য কোথাও ভাড়ায় খাটতো। [১৬৯]

> "কারও কারও কাজ তো ইউরোপের বেতনভুক্ত কর্মীদের মত। পানি আনা, টয়লেট সাফ করা, দোকান থেকে গরম রুটি আনা, সপ্তাহে একবার বাসা ও উঠোন ধোয়া, চাদর-বিছানা ধোয়া, মাসে দু'বার বাসা চুনকাম করা, ঘরের বাচ্চাকাচ্চাদের খেয়াল রাখা। এমন ক্ষেত্রে বাইরে ঘুরে বেড়ানোর এবং অন্য আয়ের ধান্ধা করার বেশ সময় পাওয়া যেত।

প্রফেসর Davis ডেভিস আরও বলেন:

> "আপাতদৃষ্টে, সুবিধাপ্রাপ্ত দাসরা ইউরোপে থাকা লোকেদের মতোই সময়

[১৬৮] Igor Kopytoff এবং Suzanne Miers, African 'Slavery' As An Institution Of Marginality, p17
[১৬৯] Ibid p16

কাটায়। কেউ কেউ তো মালিকের ব্যবসা থেকে নিজেও লাভ পায়। তবে এসব তাদের আরাম বাড়ায়, স্বাধীনতা নয়। [১৭০] আশ্চর্য, স্বাধীন নয় বলেই তো সে দাস।

যে মেস-জাতীয় জায়গায় (bagno) অতিকষ্টে public slaves-রা থাকত বলে প্রোফেসর ডেভিস বলেছেন, তিনি আরেকটু সামনে এগিয়ে জানাচ্ছেন, এসব bagno-গুলো ভিতর ৩০০ জন জড়ো হবার মত চার্চ (chapel) থাকত, ১০-১৫ বেডের হাসপাতাল থাকত, মদের পানশালা ও অস্থায়ী দোকান থাকত। জোসেফ মর্গানের বর্ণনায়:

> " এটা ছিল কিছুটা public market, যাতে জরুরি সবকিছু সব সেবা পাওয়া যায়, আবার কিছুটা জেলখানা টাইপ, কমপক্ষে দিনের বেলাটা... এগুলো সন্ধ্যা অব্দি সবার জন্যই খোলা থাকতো, সবাই ঢুকতে বের হতে পারত। [১৭১]

তারা মুসলিম হলিডে-গুলোতে এবং কাজ শেষে সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত bagno ছেড়ে শহরে ঘুরে বেড়াতে পারত। Okeley বলেন:

> " আলজিয়ার্সে তো দাসেরা city wall-এর বাইরেও যেতে পারতো, দেখা গেল এক মাইল পর্যন্ত, সমুদ্র সৈকত বরাবর। সাধারণত শিকল-টিকল থাকত না, কেবল পায়ে একটা লোহার আংটা পরানো থাকত চেনার জন্য। [১৭২]

স্বাধীনতা মানে যদি হয় নিজের ইচ্ছেমতো চলা তবে মজার ব্যাপার হল, আইন-রাষ্ট্র দ্বারা স্বাধীন মানুষের কর্ম-ইচ্ছাও নিয়ন্ত্রিত। এই যুক্তিটা খণ্ডন হতে পারে এভাবে—

খণ্ডন	**পাল্টা প্রশ্ন: কিন্তু এই অধীনতা তো আমি স্বেচ্ছায় মেনে নিইনি। পশ্চিমা দার্শনিকরা বলছেন: আমি মেনে নিতে বাধ্য (political obligation)। কেন বাধ্য?**
রাষ্ট্রের অধীনতা আমরা সম্মতির সাথে মেনে নিই। [Hobbes] সম্মতি কখন দিলাম, বস?	আমার উপায় নাই বলে, তার সার্বভৌমত্বের সাথে লড়ার সামর্থ্য নেই বলে [Hobbes]

[১৭০] Ibid, p72
[১৭১] Ibid, p134
[১৭২] Ibid, p128

মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর, পরস্পরের স্বার্থ যাতে টক্কর না খায়, সেজন্য আমরা (স্বাধীন ও সমান ব্যক্তি) রাষ্ট্রের কাছে নিজ স্বাধীনতার অংশবিশেষ সমর্পণ করি। [Locke]	আমি রাষ্ট্রের সীমানায় থাকি বলে, জন্মিয়েছি বলে। এটা আমার নীরব সম্মতি (tacit consent) [Locke]
রাষ্ট্র অনেক স্বাধীন মানুষের মাঝে একটা 'সামাজিক চুক্তি' (social contract), যা আমাদের স্বাধীনতাকেই অন্যের স্বাধীনতার আগ্রাসন থেকে রক্ষা করে [Kant], কমায় না।	রাষ্ট্রের আইন কাঠামো আমার সর্বাধিক সুখ নিশ্চিত করে বলে (utility)। [হিউম] যদি আমার মনে হয়, আইনে আমার সুখ হচ্ছে না, তখন?
তাই, আইন-রাষ্ট্রের অধীনতার সাথে দাসের ব্যাপারটা ঠিক যায় না।	তাহলে জবরদস্তি, ইচ্ছের বিরুদ্ধে মানানো ব্যাপারগুলো এখানেও আছে। কম মাত্রায়।

উস্তায জোনাথান ব্রাউন বলছেন, অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়ালো— স্বাধীনতা ও দাসত্ব আসলে বিপরীত কিছু না, বরং তা অধীনতারই দুটো মাত্রা। একটা কম অধীনতা, একটা বেশি অধীনতা। বিশেষ সামাজিক ও আইনী সিস্টেমে দাসত্ব মানে হচ্ছে 'আরও বেশি অধীনতা'। [১৭৩] রুশো বলেছিলেন: Man is born free, but everywhere he is in chains. সেটাকেই ভেঙিয়ে Vaughan Lowe বলেছেন: Man in born in chains, but everywhere he thinks himself free. [১৭৪] দ্বিতীয়টাই বেশি সত্য মনে হচ্ছে, নাকি?

ইসলামও তা-ই বলে। আমরা সবাই অধীন, সবাই আমরা দাস। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> “ তোমরা এভাবে বলো না যে, আমার দাস, আমার দাস। বরং তাদেরকে এভাবে ডাকো, হে আমার যুবক, হে আমার যুবতী, হে আমার বালক, হে আমার বালিকা। [১৭৫]

অর্থাৎ আমার অধীনস্থ হলেও সে ‘আমার দাস’ নয়, বরং আমি ও সে উভয়েই আল্লাহর দাস। ‘আমার দাস’ এই দাবি কেবল আল্লাহর অধিকার। আমার অধিকার নেই তাকে ‘দাস’ দাবি করার। বরং তার সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও আমি আল্লাহর নিয়মের অধীন। এই নিয়মতান্ত্রিক দাসপ্রথাকেই ইসলাম অনুমোদন দেয়।

[১৭৩] David graeber, debt: the first 5000 years, p204

[১৭৪] Vaughan lowe, International Law: A Very Short Introduction, p1

[১৭৫] সহিহ বুখারি ২৫৫২, সহীহ মুসলিম ২২৪৯

৩. নির্যাতন

প্যাটারসন দাসপ্রথার ৩টি শর্ত দিয়েছেন, বৈশ্বিক এবং পুরো মানবেতিহাস জুড়ে দাসপ্রথাকে সংজ্ঞায়ন করার উদ্দেশ্যে : Permanent violent domination of natally alienated and generally dishonored person. অর্থাৎ—

১. নির্যাতনের মাধ্যমে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

২. ব্যাপক অসম্মান

৩. নিজ বংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা

এই ৩টি বর্তমান থাকলে তাকে 'দাসপ্রথা' বলা হবে। চলুন আমরা ইসলামের নির্দেশনার সাথে মিলিয়ে দেখি।

দাসকে হত্যা ও অঙ্গহানি

ইসলামের দাসপ্রথা হল একটি আইন দ্বারা সুরক্ষিত একটি সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে হত্যা বা কঠোরভাবে প্রহার করে শাসন করা নিষিদ্ধ। সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

> “ যদি কেউ তার ক্রীতদাসকে হত্যা করে আমরা তাঁকে হত্যা করবো, আর কেউ যদি তার ক্রীতদাসের নাক কেটে দেয়, আমরাও তার নাক কেটে দেবো। [১৭৬] যে তাদেরকে খোজা করবে, আমরাও তাকে খোজা করে দেব। [১৭৭]

অধিকাংশ উলামাগণের মতে হাদিসটি সতর্কীকরণ বা ভীতিপ্রদর্শনমূলক। দাসকে মালিক হত্যা করলে সাজা কি হবে, তা নিয়ে মতভেদ আছে, তবে মালিক গুরুতর শাস্তির সম্মুখীন হবে এ নিয়ে সকলেই একমত। (হানাফিদের মতে দাসকে হত্যা করলে মালিককেও হত্যা করা হবে) [১৭৮]

- নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়েছিলেন (১০০ চাবুক, ১ বছরের নির্বাসন, গনিমতের অংশ বঞ্চিত করা এবং আরেকটি দাস মুক্ত করা) [১৭৯]
- উমার রা. দাসকে হত্যার অপরাধে এক মালিককে শাস্তি দেন (১০০ চাবুক, ১ বছরের নির্বাসন, জরিমানা এবং একজন দাস মুক্তকরণ)। [১৮০]

---

[১৭৬] সুনান আবু দাউদ, ৪৫১৭
[১৭৭] মুসতাদরাকে হাকিম ৮০৯৮, তিরমিযি ১৪১৪
[১৭৮] আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা ২৩/৭১, আল-মুগনী ৮/২২১
[১৭৯] ইমাম বাইহাকী, সুনানুল কুবরা ৮/৩৬, ইবনে মাজাহ ২৬৬৪
[১৮০] মুসতাদরাকে হাকিম ২৮৫৬

- দাসের গায়ে ছ্যাঁকা দেবার অপরাধে আরেক মালিককে শাস্তি দেন (১০০ চাবুক ও আহত দাসকে মুক্তিদান)। তুলনা করুন, আজকের দিনে স্বাধীন কাজের মানুষকে খুন্তির ছ্যাঁকা, বিড়ির ছ্যাঁকা দিলেও এতো শাস্তি হয় না।

অন্যান্য নির্যাতন

- ইবনে উমার (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একথা বলতে শুনেছি :

> “ যে ব্যক্তি নিজ ক্রীতদাসকে চপেটাঘাত করল বা প্রহার করল, এর কাফফারা/প্রায়শ্চিত্ত হল তাকে মুক্ত করে দেয়া। [১৮১]

- রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন,

> “ তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান থেকো, একথাটি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বলেছেন। তোমরা যা খাও তাদেরও তা খাওয়াও, তোমরা যা পরো তাদেরও তা পরতে দাও। যদি তারা এমন অপরাধ করে যা তোমরা ক্ষমা করতে ইচ্ছা করো না তবে আল্লাহর বান্দাদের বিক্রয় করে দেবে, তাদেরকে কষ্ট দিবে না।[১৮২]

দাসকে শাসনের ব্যাপারে অধিকাংশ আলিমের অবস্থান হল: মালিক চাইলে দাসকে শাসন করতে পারবে যেমনটি করা যায় সন্তানকে বা স্ত্রীকে (আলিমদের একাংশ আবার এক ডিগ্রি বেশি সাজা দেয়া যাবে বলেছেন [১৮৩])। ১২০০ বছর পরেও যার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফরাসি ফটোগ্রাফার Jules Gervais-Courtellement (জুলেস জার্ভিস কোর্তোলেমোঁ) মুসলিম ছদ্মবেশে ১৮৯৪ সালে মক্কা ভ্রমণ করেন। তাঁর সেই ভ্রমণ কাহিনী *Mon Voyage à la Mecque* নামে ১৮৯৬ সালে প্যারিস থেকে ছাপে। তিনি লেখেন:

> “ সত্যি বলতে, হেজাযে এখনো দাসপ্রথা রয়ে গেছে। তবে সে বিষয়ে কারও অভিযোগ নেই। কারণ, দাসদের সঙ্গে স্বাধীন ব্যক্তিদের মত ব্যবহার করা হয়। তারা শুধু তাদের মনিবের কথা শুনতে বাধ্য। মনিব চাইলে দুয়েকটা চড়-থাপ্পড় দিয়ে তাদেরকে শাসন করতে পারেন। পিতা যেমন পুত্রকে শাসন করে, সেভাবে। তবে এর বেশি নয়। এ বিষয়ে আইন আছে। কোনো দাসকে অধিক প্রহার ও কঠিন

---

[১৮১] মুসলিম ই.ফা., হাদিস নং ৪১৫২,৪১৫৩,৪১৫৪
[১৮২] তারীখে দামেশক, ইবন আসাকির ১৯/১৬১
[১৮৩] ইবনে মুফলিহ, ফুরুউ' ৪/১৭৭-১৭৮

শাস্তি দেয়া আইনত নিষেধ। পবিত্র কুরআনেও এ সম্পর্কে নির্দেশ আছে। এমনকি কেউ কোনো দাসকে কেনার আগে তাকে একথা জিগ্যেস করতে বাধ্য যে, তুমি কি আমার সেবা করতে সম্মত? যদি সে অসম্মত হয়, তাহলে কেউ তাকে বাধ্য করতে পারবে না। শুধু হেজায ও আরবেই দাসদের প্রতি এমন ন্যায়পূর্ণ আচরণ দেখতে পেয়েছি'। [১৮৪]

প্যাটারসনের দাসপ্রথার সংজ্ঞার ১ম পয়েন্ট 'নির্যাতনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা' ব্যাপারটা ইসলামের দাসপ্রথায় 'নির্যাতন' আকারে নেই। 'নির্যাতন' বলতে আমরা যা বুঝি, তা অনুপস্থিত।

৪. ব্যাপক অসম্মান

প্যাটারসনের ২য় পয়েন্ট ছিল 'ব্যাপক অসম্মান'। শারীরিক প্রহার ছাড়াও দাস মনিবের পক্ষ থেকে ব্যাপক মানসিক নিগ্রহের স্বীকার হয়। সার্বক্ষণিক কটূবাক্য, অপমানজনক সম্বোধন, নিগ্রহ- মানসিক নির্যাতন, চড়-থাপ্পড়, শাসনের জন্য মিথ্যে দোষ তৈরি করা ইত্যাদি যেন দাসের নিয়তি। দাসদের সাথে আচরণে ক্ষেত্রেও ইসলাম এমন নজির স্থাপন করেছে, যা ইতিহাসে অনন্য।

- মুআবিয়া বিন সুওয়াইদ হতে বর্ণিত:

> " আমি আমাদের এক ক্রীতদাসকে চপেটাঘাত করি, অত:পর পলায়ন করি। আমি ঠিক মধ্যাহ্নের আগে ফিরে এলাম এবং আমার পিতার পেছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি ঐ ক্রীতদাসকে এবং আমাকে ডাকলেন এবং বললেন: 'সে তোমার সাথে যা করেছে, তুমিও পাল্টা তা-ই করো'। সে [ক্রীতদাস] আমাকে মাফ করে দিল। তখন তিনি (আমার পিতা) বললেন, রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় আমরা মুকাররিনের পরিবারভুক্ত ছিলাম এবং আমাদের একজন মাত্র ক্রীতদাসি ছিল। আমাদের একজন তাকে চড় মারলো। এই খবর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পৌঁছল এবং তিনি বললেন: **তাকে মুক্ত করে দাও**। তারা (পরিবারের লোকজন) বললেন: সে ছাড়া আমাদের আর কোন সাহায্যকারি নেই। কাজেই তিনি বললেন: তাহলে তাকে কাজে রেখে দাও। কিন্তু **যখনই তোমরা তাকে কাজ হতে অব্যাহতি দিতে সমর্থ হও, তাকে মুক্ত করে দিও।** [১৮৫]

[১৮৪] মক্কা শহরে ছদ্মবেশী এক খৃষ্টানের দিনলিপি, নবপ্রকাশ
[১৮৫] সহিহ মুসলিম ৪৩৯১

- আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত:

> “ আমি আবুল ক্বসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, কেউ যদি তার ক্রীতদাসকে অপবাদ দেয় আর সেই ক্রীতদাস যদি তা না করে থাকে, তবে তাকে (অপবাদ আরোপকারিকে) কিয়ামতের দিনে বেত্রাঘাত করা হতে থাকবে যতক্ষণ না সেই ক্রীতদাস তাই হয় যা সে বর্ণনা করেছে। [১৮৬]

- উসমান রা. একবার তাঁর দাসকে কান মলে দিলেন এবং তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস মনে পড়ে গেল। তিনি দাসকে বললেন:

  – তুমিও আমাকে কান মলে দাও নয়তো আল্লাহ আমাকে কিয়ামতের মাঠে পাকড়াও করবেন।

  – হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খলিফা, আপনি যে আল্লাহকে ভয় করেন, আমিও তো সেই আল্লাহকে ভয় করি। কীভাবে আমি একজন খলিফার কান মলে দিতে পারি!" [১৮৭]

- ইবনে মাসউদ রা. একবার তার দাসকে কটু কথা বললেন। পেছন থেকে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আওয়াজ তিনি শুনতে পেয়ে পেছনে তাকালেন। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওনাকে বললেন:

  – জাহিলিয়্যাতের অভ্যাস এখনো গেল না? তুমি আল্লাহর বান্দাকে গালি দিলে।

  – ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি তাকে আজাদ করে দিচ্ছি।

  – তুমি যদি তাকে মুক্ত না করতে তবে আল্লাহও তোমাকে মুক্তি দিতেন না। [১৮৮]

- সর্বক্ষণ দাস-দাস শুনতে শুনতে তার মনে এক ধরনের হীনম্মন্যতা সৃষ্টি হয়, যা মানসিকভাবে চাপের কারণ হয়। 'দাস' শব্দটির যথার্থ হক কেবল আল্লাহর। এই ব্যাপারটিও আবু হুরাইরা(রা.) হতে বর্ণিত: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

> “ তোমাদের কেউ যেন [এভাবে সম্বোধন করে] না বলে, ‘তোমার প্রভুকে খাওয়াও’, ‘তোমার প্রভুকে অযু করাও’, ‘তোমার প্রভুকে পান করাও’; বরং বলবে, ‘আমার মুনিব (সাইয়্যিদ)’ বা ‘আমার অভিভাবক (মাওলা)’। আর তোমাদের কেউ যেন না বলে ‘আমার দাস/বান্দা (আবদ)’ বা ‘আমার দাসী/বান্দী (আমাত)’; বরং বলবে ‘আমার বালিকা (ফাতাত)’ এবং ‘আমর বালক

[১৮৬] সহিহ বুখারি ৬৯৪৩
[১৮৭] মাওসুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া ৬/২৫০
[১৮৮] সুনানে আবু দাউদ ৫১৫৯

(গুলাম)'। [১৮৯]

এসব হাদিস যে কেবল হাদিসের কিতাবে নয়, বরং সমাজের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা আমরা জানতে পারি হাজার বছর পরেও আরব সমাজের প্র্যাক্টিস থেকে। কলোনিয়াল আলজেরিয়াতে এক ফরাসি জেনারেলকে বলেছিল এক মুসলিম দাসব্যবসায়ী ১৮৩৯ সালে :

> " শেষমেশ, যেসব লোকেরা আল্লাহকে ভয় করে, সুনিশ্চিতভাবে দাসেরা তাদের পরিবারের অংশ। [১৯০]

বিভিন্ন অমুসলিম পর্যটকের মন্তব্যে আমরা নবিজির এসব নির্দেশনাকে কার্যকর পাই, যা ইতিপূর্বে নানান স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, সামনে আরও আসবে। একটি হাদিস থেকে সেসময় দাসদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আন্দাজ করা যায়।

আবু উসাইদের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আবু সাঈদ বলেন: আমি দাস অবস্থায় বিবাহ করেছিলাম। এবং সাহাবাদের কয়েকজনাকে দাওয়াত করেছিলাম, যাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু যার ও হুযাইফা রা. (নেতৃস্থানীয় সাহাবীরা) উপস্থিত ছিলেন। সালাতের জন্য ইকামত হয়ে গেল, আবু যার রা. ইমামতির জন্য সামনে এগোলেন। বাকিরা তাঁকে থামিয়ে দিলেন: সাবধান, যাবেন না। আমি ইমামতি করলাম (সাহেবে দাওয়াত বলে), অথচ তখনও আমি দাস। সালাত শেষে তাঁরা আমাকে (নতুন বর হিসেবে) শিক্ষা দিয়ে বললেন:

> " যখন তোমার স্ত্রী তোমার কাছে আসবে তখন দু'রাকাআত সালাত পড়বে। তারপর তার জন্য মঙ্গলের দুয়া করবে এবং তার খারাবি থেকে আল্লাহর পানাহ চাইবে। তারপর কী করবে সেটা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপার। [১৯১]

- উমর রা. বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নরদের আন্তরিকতা যাচাইয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করতেন:

  – সে কি অসুস্থদের দেখতে যায়?
  – জি যায়।
  – সে কি অসুস্থ দাসদের দেখতে যায়?
  – জি, তাও যায়। [১৯২]

---

[১৮৯] সহিহ বুখারি ২৫৫২, সহীহ মুসলিম ২২৪৯

[১৯০] G.E. Daumas, Le Grand Désert, p219

[১৯১] মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৩/৫৬০ [১৭১৫৩]। সনদ সহিহ।

[১৯২] Dr. Ali Muhammad as-Sallabi, Umar bin Al-Khattab: His Life and Times, Volume 2,

দাসদের ব্যাপারে আলাদা করে জিজ্ঞেস করতেন। জিজ্ঞাসা করার কারণ হলো, যদি কোনো গভর্নর অসুস্থ দাসদেরকে দেখতে না যেত, তবে তিনি তাদের বরখাস্ত করে দিতেন। অর্লান্ডো প্যাটারসনের সংজ্ঞার ২য় পয়েন্টটিও ইসলামের দাসপ্রথায় আমরা পাই না।

৫. নিজ বংশ থেকে বিচ্ছিন্নকরণ

প্যাটারসনীয় সংজ্ঞার ৩য় পয়েন্ট ছিল 'নিজ বংশ থেকে বিচ্ছিন্নকরণ'। দাসপ্রথা শব্দটা যেহেতু রয়েছে, তাকে মালিকের পরিবারে থাকতে হবে, নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, এটাই বাই-ডিফল্ট। ইসলামের দাসপ্রথায় আপনি এই বিচ্ছিন্নকরণের মাঝে আর যে চিত্রটা পাবেন, তা হল-

যায়িদ ইবনু হারিসা রা. এর বাবা-চাচা যখন তাকে নিতে এসেছে, তখন তিনি নিজ পরিবারে না গিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকাকেই বেছে নিচ্ছেন। ইতিহাসবিদ Gustave le Bon তাঁর *Arab Civilization* বইয়ে বলেন:

> " আমি আন্তরিকভাবে মনে করি যে, অপরাপর যেকোনো জাতির দাসপ্রথার চেয়ে ভালো ছিল মুসলিমদের দাসপ্রথা। পূর্বের দাসরা পশ্চিমের দাসদের চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায় ছিল। পূর্বের দাসেরা ছিল পরিবারের অংশ। যারা মুক্ত হতে চাইত, তারা মুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারত, কিন্তু সেটা তারা চাইতোও না। [১১৩]

আবার উসমানী সাম্রাজ্যের প্রধান উজির সোকুলু মেহমেদ পাশার ক্ষেত্রে আমরা দেখি সে তার খ্রিস্টান আপন ভাই Makarije Sokolovic-কে সার্বিয়ার আর্চবিশপ পদে বসাচ্ছে। মামলুক সুলতানদের ক্ষেত্রেও এমন উদাহরণ রয়েছে। নিজ পরিবার বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন তারা পুরোপুরি হয়নি।

অটোমান সাম্রাজ্যে জ্যানিসারিরা যখন নিজ যোগ্যতায় গভর্নর হচ্ছে বা সরকারি উচ্চপদে যাচ্ছে, তারা একই কায়দায় নিজ জাতিগোষ্ঠী থেকে রিক্রুটমেন্ট বজায় রেখেছে। মামলুক সুলতানরাও নিজ এলাকা থেকে মামলুক দাস সেনাবাহিনীর জন্য আনার সিস্টেম রদ করেনি, বরং জিইয়ে রেখেছে। ব্যাপারটা এমন যে, আপনি আমেরিকা গেলেন উন্নত জীবনের খোঁজে, এরপর নিজের আত্মীয়স্বজনদেরকে আনার ব্যবস্থা করলেন। ঠিক একই কাহিনী আপনি অটোমান হারেমেও পাবেন, যেখানে

Page 76-77

[১১৩] Gustave le Bon, Arab Civilization, p. 459-460

উচ্চপদে আসীন দাসী নিজের খ্রিস্টান বোনকে হারেমে আনছে, হারেম ট্রেনিং শেষে পদস্থ কোনো কর্মকর্তার সাথে বিয়ে দিচ্ছে। দাসপ্রথাটা এসব ক্ষেত্রে সমাজের উঁচুতলায় যাবার সিঁড়ি। ব্রিটিশ পর্যটক Charles Montagu Doughty আরবে সাব-সাহারান ক্রীতদাসদের মনোভাব কেমন উল্লেখ করেছেন:

এটা (দাসজীবন) ছিল তাঁর (আল্লাহর) রহমত। কেননা এর মাধ্যমে তারা নাজাত-দানকারী ধর্মে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। তারা মনে করে, এটাই তাদের জন্য ভালো দেশ। এখানে তারা এখন মুক্ত মানুষ। এদেশের সমাজ জীবন অধিক সভ্য। 'দুই পবিত্র স্থানের' দেশ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেশ। এজন্য তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে যে, কোন এক সময় দাস হিসেবে তাদেরকে এখানে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল'।[১৯৪]

নিজ বংশ থেকে বিচ্ছিন্নকৃতরাই যুগ যুগ ধরে 'নিজ বংশ থেকে বিচ্ছিন্নকরণ' সিস্টেম টিকিয়ে রেখেছে, মানে বুঝতে হবে আমরা যেভাবে ব্যাপারটাকে নৃশংস মনে করছি, ইসলামী দাসপ্রথায় তারা সেটাকে কল্যাণকর মনে করতেন।

দাস-দাসীর সন্তানও কেন দাস হবে? এই প্রশ্নটা এখানে প্রসঙ্গক্রমে আসে। তার তো কোনো দোষ নেই। যাকে দাসী বানানো হচ্ছে, তারও তো কোনো দোষ নেই। সুতরাং সন্তানের উত্তরটা আমরা দাসী নিয়ে আলোচনার পরে দেব ইনশাআল্লাহ।

৬. সাধ্যাতীত শ্রম

বাধ্যশ্রম তো ইতিহাসে চিরটা কালই ছিল, কেউ নির্মূল করতে পারেনি। আমরা দাবি করছি না যে, ইসলামও করেছে। দাসপ্রথাই কেবল নয়, সামনে আমরা দেখবো আধুনিক সময়ে যুদ্ধবন্দিদের এবং পুঁজিবাদ-লালিত আধুনিক দাসদের থেকেও কীভাবে বাধ্যশ্রম নেয়া হয়। দুর্বলকে দিয়ে সবল বাধ্যশ্রম নেয়নি, এমন কাল বা এমন সমাজ পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। যেই সমাজতন্ত্র সাম্যের কথা বলে, যে পুঁজিবাদ লিবারেল ইথিক্সের ছবক দেয়, তারাও বাধ্যশ্রমকে মানুষের নিয়তি বানিয়ে রেখেছে। ইসলাম দাসপ্রথার এই দিকটিকেও নিয়ন্ত্রণ বা হ্রাস করেছে।

- রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

“ জেনে রেখো দাস-দাসী তোমাদের ভাই। আল্লাহ তায়ালা তাদের তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে সে যেন নিজে যা খায় তাকে

[১৯৪] Charles Montagu Doughty, Travels in Arabia Deserta (1888), ১/৫৫৪-৫

তাই খাওয়ায়, নিজে যা পরিধান করে তাকেও তাই পরিধান করায়। তাদের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না যা তাদের জন্য অধিক কষ্টদায়ক। যদি এমন কষ্টদায়ক কাজ করতে দাও তাকে তবে তোমরাও সে কাজে হাত লাগিও। [১৯৫]

- আরেকদিন গভর্নর সালমান ফারসী (রা.) আটার খামির মাখাচ্ছিলেন।

  – আরে গভর্নর স্যার, আপনি করছেন?

  – দাসদের কাজে পাঠিয়েছি। একসাথে দুটো কাজ দিতে চাই না। [১৯৬]

ইসলামের কট্টর সমালোচক ইহুদি প্রাচ্যবিদ Ignaz Goldziher স্বীকার না করে পারেননি:

> “ ইসলামের ব্যাপারে বার বার বলা হয়ে থাকে যে, ইসলাম দাসদের সাথে সদাচরণ করাকে কর্তব্য এবং আত্মিক কর্তব্য হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। এর পিছনে ইসলামের স্পিরিট সহায়তা করেছে। ইসলামের প্রাচীনতম টেক্সটগুলোয় এমন আচরণের উৎসাহই বিদ্যমান। এটা অনস্বীকার্য। [১৯৭]

৭. অপর্যাপ্ত জীবনোপকরণ

আমরা দেখেছি, দাসপ্রথা বিলোপের মহত্ত্বের আড়ালে সভ্যতার বুলি তুলে কী আচরণ সভ্য দুনিয়া করেছে যুদ্ধবন্দিদের সাথে। লক্ষ লক্ষ যুদ্ধবন্দিকে সভ্যতার ফেরিওয়ালারা পদ্ধতিগতভাবে না খাইয়ে মেরেছে, আইন করে হত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে। ইসলাম যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে পর্যাপ্ত খাদ্য ও সদাচরণের শিক্ষা ১৪০০ বছর আগেই দিয়েছে, যখন কল্পনায়ও আসেনি মানবভ্যতার।

- বদরের যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিয়েছেন: استوصوا بلا ساري خيرا (বন্দিদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশের ব্যাপারে সতর্ক হও)। ফলে আমরা দেখি মুসলিম মুজাহিদগণ নিজেরা খেজুর খেয়ে দিন কাটালেও বন্দিদের জন্য রুটি তৈরি করছেন। [১৯৮]

- ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন: বন্দিদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগ

---

[১৯৫] সহীহ বুখারী ৩০, সহীহ মুসলিম ১৬৬১

[১৯৬] https://islamqa.info/en/94840

Shubahaat Hawl al-Islam by Muhammad Qutub; Talbees Mardood fi Qadaaya Khateerah by Shaykh Dr. SaaliHadith ibn Humayd, the Imam of the Haram in Makkah.

[১৯৭] Goldziher, 1:117

[১৯৮] তাবারী ১/১৩৩৭

পর্যন্ত তাদেরকে সুখাদ্য দিতে হবে, সদ্ব্যবহার করতে হবে।[১৯৯]

- তাদের আহারের বিনিময়ে মূল্য নেয়া যাবে না এবং সে মূল্য বন্দিকারী মুসলিম রাষ্ট্র বহন করবে।[২০০]
- নবিজির দৃষ্টান্ত অনুসারে বস্ত্র না থাকলে তাদেরকে বস্ত্র দেয়া হবে।[২০১]
- যদি তারা কোনো কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করে, তবে তা যথাসম্ভব দূরীভূত করা হবে।[২০২]
- মাকে তার সন্তান থেকে পৃথক করা যাবে না।[২০৩]
- ব্যক্তিগত পর্যায়ে বন্দির মান-মর্যাদাকে রক্ষা করতে হবে।[২০৪]

পাঠক, মনে রাখার বিষয় হল, এই যাবতীয় হুকুম বাস্তবায়ন তখনই হবে যখন এই বন্দিদের দ্বারা পার্থিব লাভের সম্ভাবনা থাকবে। ইসলাম কেবল বিধান দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, কীভাবে চললে এই বিধানটা ফিতরাতীভাবেই বাস্তবায়ন হবে, সেই ফিতরাতী রাস্তাও দেখায়। আর সে রাস্তাটাই হল দাস হিসেবে গ্রহণের সুযোগ। এটা না থাকলে বাকি যত মানবীয় আলাপ হচ্ছে, তা জেনেভার মত কাগুজে বাঘই থেকে যাবে। মানুষের সাইকোলজি-বিরুদ্ধ বলে, মানুষ তা থেকে পালানোর উপায় খুঁজবে, যেমনটি আমরা দেখেছি জেনেভা কনভেনশনের বেলায়।

এবার এই যুদ্ধবন্দিদের যখন দাস হিসেবে বণ্টন করে দেয়া হল। এখন তার জন্য সেই ভরণপোষণের সুপারিশ ইসলাম করেছে, যা মালিক নিজে ভোগ করবেন। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন,

> “ তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান থেকো (একথাটি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বলেছেন)। তোমরা যা খাও তাদেরও তা খাওয়াও, তোমরা যা পরো তাদেরও তা পরতে দাও।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> “ জেনে রেখো দাস-দাসী তোমাদের ভাই। আল্লাহ তায়ালা তাদের তোমাদের

---

[১৯৯] আবু ইউসুফ রহ, কিতাবুল খারাজ, পৃ ৮৮
[২০০] প্রাগুক্ত
[২০১] বুখারী ৩০, মুসলিম ১৬৬১
[২০২] ইবনু আসীর, কামিল ২/৯৯
[২০৩] তিরমিযী ১৫৬৫, মুসনাদে আহমাদ ২৩৫১৩, ইমাম সারাখসী, শরহু সিয়ারে কাবির ৪/২২৯
[২০৪] আবু দাউদ ৫১৫৯

অধীনস্থ করেছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে সে যেন নিজে যা খায় তাকে তাই খাওয়ায়, নিজে যা পরিধান করে তাকেও তাই পরিধান করায়।

এক লোক খানা খাচ্ছিল। পাশে তার দাস দাঁড়িয়ে ছিল। খলিফা উমর (রা.) কঠিন ধমক দিলেন, 'দাসদের নিয়ে খানা খাও'।

আইনশাস্ত্রমতে সর্বনিম্ন রেঞ্জ হল, দাস-দাসীদের জন্য ব্যয় করা মনিবের দায়িত্বে। মনিব যদি খরচ না দেয় তবে তাকে উপার্জন করতে দিতে হবে। যদি উপার্জন করতে অক্ষম হয়, ওদিকে মালিকও খরচ দেবার সামর্থ্য নেই, সেক্ষেত্রে মালিককে বাধ্য করা হবে এদের বিক্রি করতে, যাতে সচ্ছল মালিকের হাতে গিয়ে পড়ে। [২০৫]

দাসদাসীর জন্য এই পরিমাণ খোরপোষ নির্ধারণ করবে যাতে এলাকার সাধারণ খানা-তরকারি খেয়ে জীবন নির্বাহ করতে পারে। পোশাকের ক্ষেত্রেও তাই, শুধু সতর ঢাকার মত পোশাক দিলে হবে না। মনিবের সমমানের খাবার-পোশাক দেয়া অপরিহার্য না, তবে দেয়া মুস্তাহাব। মনিব যদি নিজে কৃপণ হওয়ার কারণে নিম্নমানের খানা-পোশাক ব্যবহার করে, তবুও দাসদাসীদেরকে সাধারণ মানুষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ খানা-পোশাক দিতে হবে, অপরিহার্য। [২০৬] অর্থাৎ বন্দি ও দাস উভয় অবস্থায় তাদের জন্য যতটুকু সম্ভব উত্তম খোরাকির ব্যবস্থা ইসলাম করে দিয়েছে।

৮. বর্ণবাদ-গোত্রবাদ

পৃথিবীর ইতিহাসে দাসপ্রথার একটা অনিবার্য উপাদান হল: জাতিবাদ, গোত্রবাদ, বর্ণবাদ। প্রাচীন আরবে গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতেই লড়াইগুলো হত এবং পরস্পরকে দাসত্বে গ্রহণ করা হত। আফ্রিকান বার্বার গোত্রগুলোর ক্ষেত্রেও একই বিষয়। ইহুদিদের ওল্ড টেস্টামেন্টে অ-ইহুদি জাতিকে দাসত্বে গ্রহণের বিধান দেয়া হয়েছে। আর ইহুদিধর্ম বংশীয় ধর্ম। অর্থাৎ বনী ইসরাঈল ছাড়া বাকি জাতিরা নীচু।

Old Testament-এ রয়েছে: [২০৭]

[২০৫] হিদায়া ২/২৪৫

[২০৬] ফতোয়ায়ে আলমগিরি ২/৭১৪

[২০৭] Book of Leviticus, Chapter 25: 44-46

"Your male and female slaves are to come from the nations around you; from them you may buy slaves. 45 You may also buy some of the temporary residents living among you and members of their clans born in your country, and they will become your property. 46 You can bequeath them to your children as inherited property and can make them slaves

> “ তোমাদের চারপাশের জাতিদের থেকে পুরুষ এবং নারী ভৃত্যদের তোমরা পেতে পারো, তাদের থেকে খরিদ করতে পারো। তোমাদের মাঝে থাকতে আসা অস্থায়ী বাসিন্দাদের (ভিন জাতির) মধ্য থেকেও নিতে পারো, তারা হয়ে যাবে তোমাদের সম্পত্তি। এদেরকে তোমাদের ছেলে মেয়েদের কাছে উত্তরাধিকার হিসেবে হস্তান্তর করে দিয়ে যেতে পারো, যাতে তারা সারাজীবন তোমাদের দাসত্ব করে। কিন্তু কখনোই তোমাদের সাথি ইসরায়েলীয়দের উপর কঠোর শাসন করো না।

এই গোত্রীয় হানাহানি ইসলামের ‘উম্মাহ সৃষ্টি’ উদ্দেশ্যের বিরোধী। ইসলাম সকল প্রকার আভিজাত্যবোধের উপর উঠে তাওহীদের ভিত্তিতে এক জাতি গঠনের কথা বলে।

> “ হে কুরাইশগণ, আল্লাহ তোমাদের জাহিলি যুগের সকল হিংসা-বিদ্বেষ ও গর্ব-অহংকার এবং পৈত্রিক গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ নির্মূল করেছেন।... হে মানুষ, তোমরা সকলেই আদম-সন্তান; আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [২০৮]

একই 'উম্মাহর অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও জাতীয়তার ভিত্তিতে পরস্পর যুদ্ধ' ইসলামে হারাম, এবং ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবার কারণ।

> “ আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি লোকেদেরকে আসাবিয়্যাহর (গোত্রান্ধতা) দিকে আহ্বান করে অথবা আসাবিয়্যাহতে উত্তেজিত হয়ে ভ্রষ্টতার পতাকাতলে যুদ্ধ করে নিহত হলো, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।’ [২০৯]

আফ্রিকান নিগ্রোরা যে সাদাদের দাসত্ব করবে, এর জাস্টিফিকেশন দাসমালিকেরা নিয়েছিল বাইবেল থেকেই। এই যুক্তিটা ইতিহাসে The Curse of Ham নামে পরিচিত। ঘটনাটি উল্লেখ আছে Genesis IX, 18–27 এ: মহাপ্লাবনের পর নূহ এর ৩ ছেলে থেকে আবার বিরান পৃথিবী আবাদ হল। তিন ছেলের নাম: হাম, শাম ও ইয়াফেস। নূহ কৃষিকাজ শুরু করলেন, আঙুরের চাষ করলেন। একদিন প্রচুর মদপান করে মাতাল হয়ে গিয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। ফলে তাঁবুর ভিতর কাপড় সরে গিয়ে উলঙ্গ হয়ে গেলেন। যা দেখে ছোটোছেলে হাম বাকি দুই ভাইকে ডেকে আনলো। বাকি দুই ভাই কাপড় দিয়ে বাপের সতর ঢেকে দিল নিজেদের ঘাড় ঘুরিয়ে রেখে। যখন নেশা কাটলো, জেগে উঠে এই ঘটনা শুনে নূহ অভিশাপ দিলেন হামের ছেলে কানানকে

---

for life, but you must not rule over your fellow Israelites ruthlessly."

[২০৮] সহীহুল জামে' ৫৪৮৩

[২০৯] সুনানে আবু দাউদ ৬১২১

(মানে হামের বংশকে) এই বলে:

> "কানান অভিশপ্ত হোক, ভাইদের কাছে গোলামের চেয়েও গোলাম হয়ে থাকুক। খোদা মঙ্গল করুক শামের, আর কানান হোক তার দাস। খোদা ইয়াফেসকে বড় করুক, শামের আশ্রয়ে থাকুক সে, আর কানান তারও গোলাম হোক।

বলা হল: এই হামের বংশ হল নিগ্রোরা, শামের বংশ হল সেমিটিকরা (ইহুদি, আরব) আর ইয়াফেসের বংশ হল ককেশীয়রা। সুতরাং নিগ্রোরা সাদাদের দাসত্ব করবে, এটাই তাদের নিয়তি।

ইসলাম এভাবে বংশ পরম্পরায় অভিশাপের ভাগী হওয়া, একজনের অপরাধে আরেকজনকে ফল ভোগানো, মর্যাদার এই ফিক্সড ধারণা স্বীকার করে না। গোত্র, জাতি, বর্ণ— এগুলো অপরিবর্তনীয়, এর পিছনে ব্যক্তির হাত নেই। আমি কোন গোত্রে, কোন জাতিতে জন্ম নিলাম, এর জন্য আমি দায়ী নই। সুতরাং এগুলো শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হতে পারে না। শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হতে হবে অর্জিত কিছু, যাতে সকলেই শ্রেষ্ঠ হবার সুযোগ পায়। আর তা হল: আল্লাহকে স্মরণ রেখে জীবনকে তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক পরিচালিত করা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে জানিয়ে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড:

يا أَيُّها النّاسُ إنَّ ربَّكُمْ واحِدٌ ألا لا فضلَ لِعربِيٍّ على عجَمِيٍّ ولا لِعجَمِيٍّ على عربِيٍّ ولا لأحمَرَ على أسْودَ ولا لأسودَ على أحمرَ إلَّا بالتَّقوَى إنَّ أكرَمكُمْ عند اللهِ أتْقاكُم

> "হে লোক সকল! নিশ্চয়ই তোমাদের রব্ব এক। অনারবের উপর আরবীয়দের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আরবীয়দের উপর অনারবদের। **শ্রেষ্ঠত্ব নেই কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোনো শ্বেতাঙ্গের, আর না শ্বেতাঙ্গের উপর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের। মর্যাদার ভিত্তি হলো কেবল তাকওয়া।** আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত যে তাঁকে বেশি ভয় করে চলে, আল্লাহর কথা খেয়াল রেখে চলে। [২১০]

নবিজি আরও বলেছেন:

> "যদি তোমাদের উপর নাক-কান কাটা কৃষ্ণাঙ্গ দাসকেও আমীর বানিয়ে দেয়া হয়, যে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে পরিচালিত করে, তবে অবশ্যই তার কথা শুনবে ও মেনে চলবে। [২১১]

[২১০] আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া (৩/১০০), ইমাম বাইহাক্বী, শুয়াবুল ঈমান (৫১৩৭). আলবানি সহীহ

[২১১] মুসলিম ৪৭৬২

> “ আমীরের কথা শুনতে ও মানতে থাকো, হোক সে হাবশী (নিগ্রো) গোলাম, যার মাথা কিসমিসের মত ছোট। [২১২]

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব-নেতৃত্ব এগুলো গোত্র-বর্ণের উপর নির্ভর করে না, আল্লাহভীতি-ইলম-চরিত্র-সততা-যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। ইসলামের দাসপ্রথায় এই বর্ণবাদ-গোত্রবাদ অনুপস্থিত। **ইসলামের দাসপ্রথার ফোকাসই হল: কাফির যুদ্ধবন্দি, সে যে জাতিরই হোক।** এজন্য ইহুদি, পারসিক, রোমান, আর্মেনীয়, পূর্ব ইউরোপীয়, স্পেনীয়, তুর্কী বিভিন্ন জাতির দাসের উপস্থিতি পাওয়া যায় মুসলিম সাম্রাজ্যে। সুতরাং দাসপ্রথা বলতেই যে কালোদের উপর সাদাদের অত্যাচারের একটা বর্ণবাদী চরিত্র, সেটা থেকে ইসলামী দাসপ্রথা মুক্ত। এমনকি ১৪০০ বছর পরেও। বিখ্যাত পর্যটক Wilfred Thesiger জানানঃ

> “ গায়ের রঙের ব্যাপারে আরবদের বাছবিচার ছিল সামান্যই। কালো হলেও একজন দাসকে সামাজিকভাবে নিজেদের একজন হিসেবেই মনে করত। অভিজাত মনিবের দাসরাও ছিল দাপুটে আর বদমেজাজি। (Thesiger 1959, 71)

১২৬০-১৫১৭ সাল সিরিয়া ও মিশর শাসন করেছিল মামলুক (দাস) রাজবংশ। যাদের দাস হিসেবে আনা হয়েছিল তুর্কিক বা ককেশীয় এলাকা থেকে। সেনা ট্রেনিং-এর পর মুক্ত হয়ে যেত। এই অফিসারেরা রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর নিজেরাও দাস আমদানি ও সেনাবাহিনী গঠন অব্যাহত রাখে। এদের হাতে ইসলামের সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু মোঙ্গলরা পরাজিত হয় আইনে জালুতের যুদ্ধে। তারপর যেমন, বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উসমানী সুলতান জন্ম নেন পূর্ব ইউরোপীয় খৃষ্টান দাসীদের গর্ভে। উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ দাসই ছিল স্পেন-ইতালি-গ্রীস-ফ্রান্সের উপকূল থেকে আনা নৌযুদ্ধের যুদ্ধবন্দিরা।

৯. ব্যক্তিত্বের বিকাশে বাধা

দাসপ্রথা মানেই সামাজিক সকল সুযোগ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী। যাদের উপরে উঠার কোনো সুযোগ নেই। নিজেকে বিকশিত করে সমাজের-রাষ্ট্রের উচ্চপদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ নেই। যার যোগ্যতা না বিকশিত হয়, না মূল্যায়িত হয়। সমাজের একটা অংশ শুধু খেটেই যায়, মানুষ হিসেবে তার সক্ষমতা বিকাশের সুযোগ নেই।

---

[২১২] বুখারি ৭১৪২

ইসলামের তার দাসপ্রথায় বিকাশের এই বৈষম্য রাখেনি। এর আগে আমরা মেহমেত পাশার উদাহরণ দেখেছি। এভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যের বহু উজির-নাজির-অধ্যাপক-শিক্ষক -বিচারপতি-জেনারেল-সুলতান এমনকি পুরো রাজবংশই দাস ছিলেন।

শিক্ষাদীক্ষা

হিজরী দ্বিতীয় শতকের ইসলামী দুনিয়ার উপরই যদি একবার নজর বোলান এবং লক্ষ্য করেন কোন শহরে কে সেই সময় ইলমের ইমাম (প্রধানতম জ্ঞানী ব্যক্তি) তাহলে এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যাবে। [২৬৩] আরবীতে 'মাওলা' অর্থ আযাদকৃত দাস।

– মক্কা মুকাররমায় এখন ইলমের ইমাম কে?

– আতা ইবনে আবী রাবাহ। (মাওলা)

– একজন মাওলা কীভাবে আরবদের উপর ইমাম হয়ে গেলেন?

– ইলম ও তাকওয়ার কারণে।

– ইয়ামানবাসীদের ইমাম কে?

– তাউস ইবনে কায়সান। (মাওলা)

– মিশরের ইমাম কে?

– ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব। (মাওলা)

– সিরিয়ার ইমাম?

– মাকহূল। (মাওলা)

– জাযীরার ইমাম?

– মায়মুন ইবনে মেহরান। (মাওলা)

– খোরাসানবাসীর ইমাম কে?

– যাহহাক ইবনে মুযাহিম। (মাওলা)

– বসরা শহরের ইমাম কে?

– হাসান বসরী। (মাওলা)

– কুফা শহরের ইমাম কে?

– ইবরাহীম নাখায়ী। (আরব)

এতক্ষণ পর একজন আরবের নাম এল। ঐ সময়ে আরবেরা রাজ্যশাসনে এগিয়ে ছিলেন, ফলে মাওয়ালিরা (মুক্ত দাসেরা) এগিয়ে গিয়েছিলেন জ্ঞান-সাধনায়। শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী লেখেন—

[২৬৩] সমাজ গঠনে সীরাতের ভূমিকা, মুহাম্মাদ সিফাতুল্লাহ, মাসিক আল-কাউসার, ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সংখ্যা

> এক অমুসলিম ফরাসী লেখক বলেন, ইসলামী দেশগুলোতে 'দাস' হওয়া দোষের বিষয় নয়। এমনকি কনস্টান্টিনোপলের সকল সুলতান, যারা ছিলেন মুসলমানদের আমীর, দাসীর গর্ভে জন্ম লাভ করেছেন। ... মিসরের আমীরেরা 'দাস' কিনে আনতেন এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করে তুলতেন এরপর নিজের কন্যাদের তাদের সাথে বিয়ে দিতেন।[২১৪]

আচ্ছা, আরও আগের যুগে দেখি। ইসলামের এক্কেবারে প্রথম যুগে:

- ইবনে উমর রা. এর দাস নাফে রহ. ছিলেন সুবিখ্যাত হাদিসবিশারদ[২১৫]। মালিকী মাজহাবের ইমাম, ইমাম মালিক রহ.–এর উস্তাদ ছিলেন এই নাফে রহ.।
- উমার রা. এর দাস আসলাম রহ. বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন[২১৬]।
- ইবনে আব্বাস রা. এর দাস ছিলেন ইকরিমা রহ. যাকে 'বাহরুল উলুম' (জ্ঞানের সাগর) বলা হয়[২১৭]। তিনি বলেন:

> আমি চল্লিশ বছর ইলম অন্বেষণ করেছি। আমি দরজায় বসে ফতোয়া (verdict) দিতাম আর ইবনে আব্বাস রা. ঘরে থাকতেন। ইবনে আব্বাস রা. আমাকে বলতেন, 'যাও, মানুষকে দীনের বিষয়ে ফতোয়া দাও আর আমি তোমার সহযোগিতাকারী'।[২১৮]

একই ধারাবাহিকতা পরবর্তী যুগেও চলমান থাকে দাস-দাসী নির্বিশেষে।

- মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযীদের বাঁদী আবিদা মাদানিয়্যা। দাসী অবস্থায় মদীনার শিক্ষকদের থেকে বিপুল হাদিস শেখেন। পরে স্পেনের বিখ্যাত মুহাদ্দিস দাহহূন তাঁকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করেন ও স্পেনে নিয়ে যান। সেখানে তিনি ১০ হাজার হাদিস বর্ণনা করেন।[২১৯]
- স্পেনের খলিফা ৩য় আবদুর রহমানের দাসী রাদ্বিয়াহ।
- আরও ছিলেন আবুল মুতাররিফের বাঁদী ইশরাক আল-সুওয়াইদা। আবুল মুতাররিফ তাকে আরবি, ব্যাকরণ, সাহিত্য শিখাতেন। পরে সেই বাঁদীই সাহিত্যের বড়ো উস্তাযা হয়ে যান।

---

[২১৪] তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম ১/১৭৭
[২১৫] তারিখে কাবীর ২/৩৯১
[২১৬] আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০৭
[২১৭] আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৮ এবং সিয়ারু আলামুন নুবালা ৪/৩৭০
[২১৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৫/৫০৫
[২১৯] নাফহুত তীব ২/৯৫, মুস্তাফা আযমী পৃ. ১৪৩

- ৩য় আবদুর রহমান ও তাঁর ছেলে আল-হাকামের আমলে ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন লুবনা নামের এক সাবেক দাসী। গণিতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এবং ৫ লক্ষ বইয়ের রাজকীয় লাইব্রেরির দায়িত্বে থাকতেন। [২২০]

সামরিক নেতৃত্ব

তেমনি মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদেরকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করা হত। সুতরাং এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, দাস অবস্থায় তাদের যোগ্যতা বাধাগ্রস্ত হয়েছে বা বিকশিত হতে পারেনি। যেমন—

- রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাস যায়িদ বিন হারিস রা. ছিলেন মু'তার যুদ্ধের সেনাপতি [২২১]
- তাঁর ঔরসে আরেক দাসী উম্মে আইমান রা. এর সন্তান উসামা বিন যায়দ রা. ছিলেন নবীজীর প্রেরিত শেষ যুদ্ধযাত্রার সেনাপ্রধান, [২২২] যে যুদ্ধে উমার রা. সহ অন্যান্য বড় বড় সাহাবী ছিলেন তাঁর অধীন।
- স্পেন বিজেতা বিখ্যাত সেনাপ্রধান তারিক বিন যিয়াদ (রহ.) ছিলেন উত্তর আফ্রিকার গভর্নর মুসা বিন নুসাইরের মুক্ত দাস।
- উসমানী খিলাফতের শ্রেষ্ঠ সৈনিক ব্যাটেলিয়ন 'জেনিসারি' গঠিতই হতো পূর্ব ইউরোপের এতিম খ্রিস্টান শিশুদেরকে বা দাসদের নিয়ে।

শাসক

- হযরত হোযায়ফা রা. এর ক্রীতদাস সালেমকে রা. উমর রা. খুব স্নেহ করতেন। মৃত্যুর আগে খলিফা মনোয়নের প্রসঙ্গ এলে উমর রা. বললেন, 'সালেম যদি আজ বেঁচে থাকতো, তবে আমি তাকেই খলিফা নিযুক্ত করতাম'। [২২৩]
- 'মামলুক' শব্দের অর্থ ক্রীতদাস। মামলুক (مملوك) দ্বারা 'রাজার অধীন দাস' বোঝানো হয়। বিভিন্ন দেশ-জাতির এ ক্রীতদাসরা মুসলিম খলিফা ও সুলতানদের

---

[২২০] প্রখ্যাত আন্দালুসী আলিম ইবনু বাশকুয়াল বলেন : তিনি লেখনী, ব্যাকরণ ও কাব্যে পারদর্শী ছিলেন। গণিতে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান ছিল, অন্যান্য বিজ্ঞানেও প্রাজ্ঞ ছিলেন। উমাইয়া দরবারে তাঁর মতো শ্রদ্ধাস্পদ আর কেউ ছিল না। [Ibn Bashkuwal, Kitab al-Sila (Cairo, 2008), Vol. 2: 324].

[২২১] সীরাতে ইবনে হিশাম ই.ফা., ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২

[২২২] আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৫৩

[২২৩] তারীখে তাবারী ৩/২৯২

সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পরবর্তীতেই নিজেরাই নানাস্থানে স্বাধীন সালতানাত গড়ে তোলে। মামলুক বংশের শাসকরা অধিকাংশই ছিলেন তুর্কীয় (Turkic) ক্রীতদাস, নিবাস ককেশাস ও কাস্পিয়ান সাগরের আশপাশ। মামলুক সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. মামলুক সালতানাত (দিল্লি) (১২০৬-১২৯০)

২. মামলুক সালতানাত (কায়রো) (১২৫০-১৫১৭)

৩. ইরাকের মামলুক রাজবংশ (১৭০৪-১৮৩১, উসমানীয় ইরাকের অধীন)

৪. বুরজি ও বাহরি রাজবংশ

ভারতের মামলুক বংশের সুলতানরাও দাস ছিলেন।

➡ কুতুবুদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০): মুহাম্মদ ঘোরির দাস

➡ শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬): মুহাম্মদ ঘোরির দাস

➡ গিয়াসউদ্দিন বলবন (উজির হিসেবে ১২৪৬-১২৬৫, সুলতান হিসেবে ১২৬৫-১২৮৬): ইলতুৎমিশের দাস

শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরির কেবল একটি মেয়ে সন্তান ছিল। সভাসদদের কেউ এ ব্যাপারে আফসোস করলে তিনি বলেন: আমার এতো সংখ্যক দাস রয়েছে, যাদেরকে আমি ছেলের মতন লালন-পালন করেছি। তাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য আমি অনেক মেহনত করেছি। এরা পুত্রের মতই আমার নামকে উজ্জ্বল করবে। [২২৪]

ইলিতুৎমিশের ৪০ জন দাস ছিল, যারা ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। বাদশাহ নির্বাচনসহ সাম্রাজ্যের সকল বিষয়ে তারা হস্তক্ষেপ করত। তাদেরই একজন ছিলেন গিয়াসউদ্দিন বলবন। এই ৪০ জনকে 'চেহেলগাহ' এবং 'খাজাতাশ' বলা হত। [২২৫]

মিসরের মামলুক শাসকদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন:

➡ সাইফুদ্দিন কুতুজ (খাওয়ারিজম বংশোদ্ভূত)

➡ রুকনুদ্দিন বাইবার্স (কিপচাক বংশোদ্ভূত)

➡ শাজারাতুদ দুরর (আর্মেনীয় দাসী)

---

[২২৪] আবে কাওসার, পৃ ৯৫ সূত্রে মুহাম্মদ পালনপুরী, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন

[২২৫] প্রাগুক্ত

- ইজ্জুদ্দীন আইবেক
- মালিক-আল আশরাফ

উচ্চপদে

আমেরিকান মধ্যপ্রাচ্য গবেষক Daniel Pipes লিখেছেন:

> “ইসলামের প্রথম দুইশ' বছর দেখা যায় ক্রীতদাসেরা মুক্ত হবার পর দেহরক্ষী, সৈন্য, বিচারক, পদস্থ কর্মকর্তা এবং প্রশাসক হচ্ছে। যেমন বদরের যুদ্ধে অংশ নেয়া সাহাবাদের ১০%-ই ছিলেন মুক্ত ক্রীতদাস। আবু বকর রা. এর সময় থেকে নিয়ে প্রত্যেক অর্থসচিব (হাজিব) ছিলেন সাবেক ক্রীতদাস। প্রধান পদগুলোতে দাসেরাই থাকত। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মুসলিম রাজবংশে একই চিত্র পাবেন যে, সর্বোচ্চ সরকারি পদগুলোয় প্রাক্তন দাস, খিলাফতে রাশিদাই হোক, উমাইয়া-ই হোক, আর আব্বাসীরাই হোক। [২২৬]

এভাবে একজন কাফির would-be হত্যাকারীকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে সমাজের মূলধারায় বসবাসের সুযোগ এবং নিজের যোগ্যতা বিকাশের সুযোগ ইসলাম দিয়েছে দাসপ্রথার মাধ্যমে, যা আধুনিক কালের কোনো কনভেনশনের দ্বারাও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এবং পরিশেষে বন্দিকারীর মতাদর্শ গ্রহণ করে পরলোকের সাফল্যও নিশ্চিত করে নেবার সুযোগ মিলেছে এদের। ইসলামের জন্য তাদের ডেডিকেশন ও খিদমাতই প্রমাণ করে যে, তারা মুসলিমদের ও ইসলামের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল। আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের শুরুর তর্কে: আগে থেকেই চলে আসা দাসপ্রথাকে ইসলাম নিজ লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহার করেছে। এর উপকারগুলোকে ব্যবহার করেছে। এর অপকারগুলোকে হ্রাস বা বিলোপ করে স্বাধীনতার দিকে নতুন এক মাত্রায় একে উন্নীত করেছে। এবং পরিশেষে নানান বাহানায় মুক্তিকে মনিবদের উপর আরোপ করেছে।

ইসলামের ইতিহাসে এই নীতির ব্যত্যয়

তার মানে কি ইসলামের পুরো ইতিহাসে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দাসরা অত্যাচারিত হয়নি? সে দাবি আমরা করি না। ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করার পরও হাজার

---

[২২৬] Daniel Pipes (1980): Mawlas: Freed slaves and converts in early Islam, Slavery & Abolition: A Journal of Slave and Post-Slave Studies, 1:2, 132-177

হাজার মুসলিম মদপান করে। ইসলাম সুদকে 'মায়ের সাথে যিনা'র সমতুল্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। এতো কঠোর নিষেধের পরও লক্ষ লক্ষ মুসলিম সুদের সাথে সম্পৃক্ত। এর মানে কি এই যে, কারও কারও মদ-সুদ খাবার দোষ ইসলামের? প্রতিটি আরবী নামের মুসলিমের দায়ভার ইসলামের না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

> " ... এর অধিক তাদের উপর তোমাদের কর্তৃত্ব নাই যে, তারা যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, সত্যিই যদি তারা তাই করে, তবে তোমরা তাদেরকে পৃথক বিছানায় রাখবে এবং আহত হয় না এরূপ হালকা মারধর করবে।... [২২৭]

কেমন হালকা? আলিমগণ ব্যাখ্যায় বলেছেন: যাতে জখম হবে না, দাগ হবে না, মারের প্রতিক্রিয়া হবে না, মুখে মারা যাবে না, গালিগালাজ করা যাবে না। [২২৮] উদাহরণ দেওয়া হয় মিসওয়াক দিয়ে মারার। এখন কোন চৌধুরি সাহেব যৌতুকের জন্য চড় দিয়ে স্ত্রীর কান ফাটিয়ে দিল। বা গেরস্থ কলিমদ্দি খাবারে নুন বেশি হয়েছে বলে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে স্ত্রীর হাড়গোড় ভেঙে দিল। এজন্য কি 'ইসলাম দায়ী' না 'ইসলামি শিক্ষা না থাকা' দায়ী, বলেন?

ইসলামের নীতি ইসলামের জায়গায়, মুসলিমদের কীর্তিকলাপ ইতিহাসের জায়গায়। পুরো ইতিহাস জুড়ে সব সময়ই একই ধারায় ইসলামের নীতি প্রত্যেকেই অনুসরণ করে চলেছে, এ দাবি আমরা করি না। এজন্য পুরো ইতিহাসই মুসলিমদের অনুসরণীয়, তাও না। ইসলামে দাসপ্রথার স্বরূপ আমরা দেখবো কুরআন ও হাদিস থেকে। এরপর আমরা দেখবো সাহাবাদের রা. যুগ, তাবেঈদের যুগ,তাবে তাবেঈদের যুগ, তাঁদের পরের যুগ— প্রথম চার যুগকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'রেফারেন্স যুগ' বলে গিয়েছেন। হাদিস এসেছে 'এরপর থেকে মিথ্যা প্রকাশ পাবে' [২২৯]। এঁদের ব্যাখ্যা-কর্মপন্থা পুরো উম্মাহর জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয়। ইসলামের ইতিহাসে অনেক শাসক মদ খেয়েছে, নাচ-গান শুনেছে, অত্যাচার করেছে, খুন-জুলুমের শ্মশান কায়েম করেছে, ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে অগ্রাহ্য করেছে। একই ধারাবাহিকতায় দাস-দাসীরাও নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে, ইসলাম তো তাকে করতে বলেনি। তো এর

---

[২২৭] তিরমিযি ১১৬৩, ৩০৮৭, ইবনু মাজাহ ১৮৫১

[২২৮] হাকীম ইবনু মু'আবিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো স্ত্রীর হক তার উপর কতটুকু? তিনি বললেন, তুমি যখন আহার করবে তখন তাকেও আহার করাবে; আর যখন তুমি বস্ত্র পরবে, তখন তাকেও বস্ত্র পরাবে। মুখমণ্ডলে প্রহার করবে না। আর অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করবে না। [আবূ দাউদ ২১৪২-২১৪৪, ইবনু মাজাহ ১৮৫০]

[২২৯] সহীহ বুখারী ২৬৫২, সহীহ মুসলিম ২৫৩৩

দায়ভার ইসলাম কেন নিবে?

আমরা একটি তুলনা দিবো এই ব্যাপারে। মার্কসবাদ যখন ব্যবহারিক দিকে গেল, তখন স্ট্যালিন পিরিয়ডে রাশিয়া তে ৬০ লাখ আর চীনে ৪০ লাখ মানুষ হত্যা করা হয়। তো বলতে পারেন যে, মার্কসবাদ তো হত্যা করতে বলেনি। হ্যাঁ বলেনি, কিন্তু মার্কসবাদে এমন নির্দেশনাও দেওয়া নেই যে, একে প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে যদি তোমরা অন্যায় করো তবে তোমাদের শাস্তি হবে। দুনিয়াতে যদি না-ও হয়, মৃত্যুর পর হবে। বরং মার্ক্সবাদী বয়ানে: যুদ্ধ, সহিংসতা, শ্রেণিশত্রুদের দমন— এই কথাগুলোই বারবার এসেছে [২৩০]। তাই এই বস্তুবাদী জুলুমের দায়ভার মার্কসবাদের। কিন্তু মুসলিমদের করা অন্যায় ইসলামের উপর বর্তায় না। কারণ ইসলামে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, কেউ অন্যায় করলে তার শাস্তির বিধানও রেখেছে, পৃথিবীতে শাস্তি এড়িয়ে গেলেও হাশরের মাঠে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের রায় হবে, কেউ কোনো ক্ষমতা দিয়ে সেদিন বাঁচবে না, বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিশ্বাস হিসেবে একে প্রতিটি মুসলিম-মানসে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং ইসলামের দিকে আঙুল তোলা যায় না।

ইসলামের পুরো ১৪০০ বছরের ইতিহাসে দাসদের উপর সব নীতিই বাস্তবায়ন হয়েছে, এ দাবি আমরা করি না। ইসলামের নির্দেশনার ব্যত্যয় অবশ্যই জায়গায় জায়গায় হয়েছে, এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক। বিশাল ইসলামী খেলাফতের সবখানে সবাই সমানভাবে একই আচরণ করবে না। নতুন নতুন জাতিগোষ্ঠী ইসলামের সীমানায় এসেছে, ইসলাম গ্রহণ করেছে, দাসদের সাথে আচরণ আগে যা করত, তেমনই রয়ে গিয়ে থাকতে পারে। হার্ভার্ড, মিশিগান ও নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক Frederick Cooper-এর ভাষায়:

> “ ইসলামী আফ্রিকাতে আমরা যা দেখি (Muslim African societies), একই জিনিস আমরা আফ্রিকার অমুসলিম অংশেও দেখি। সুতরাং এর কারণ ইসলাম না, **ইসলাম অনেক স্থানে সেই সমাজের বাস্তবটাকে মেনে নিয়েছে।** ... বরং ইসলাম যে কাজটা করেছে, দাসের সাথে ভালো আচরণকে পুরস্কৃত করেছে, দাসদের ইসলাম শিখিয়েছে, এবং সবশেষে ইসলামী আইনী ছকে ফেলে তাদের মুক্তি দিয়েছে। [২৩১]

মুসলিম হবার পরও বাংলাদেশের মুসলিমরা আমরা কন্যাসন্তানকে অপয়া মনে করেছি না? ছেলে শিশু মেয়ে শিশু বৈষম্য করেছি না? করেছি তো। অথচ নবিজি

[২৩০] মার্ক্স ও এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার

[২৩১] Cooper, "Islam and Cultural Hegemony", pp. 286, 7. A fascinating and accessible firsthand account for the latter is Emily Ruete, Memoirs of an Arabian Princess from Zanzibar (Dover Publications, 2009).

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ৩টি মেয়েকে উত্তম প্রতিপালন করেছে,[২৩২] ছেলের চেয়ে কম অগ্রাধিকার দেয় না [২৩৩], তার জন্য জান্নাত। আমাদের বিধবারা সাদা শাড়ি পরেছে, পণপ্রথার নাম দিয়েছি যৌতুক, শ্রাদ্ধের নাম দিয়েছি চল্লিশা; পুরনো কালচার ছাড়তে পারিনি। একই ঘটনা দাসদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও ঘটেছে।

যেমন: স্বর্ণযুগের প্রায় ১০০০ বছর পর ১৫শ-১৮শ শতকে উত্তর আফ্রিকার ৩টি শহরে (আলজিয়ার্স, ত্রিপোলি, তিউনিস) খৃষ্টান দাসদের অবস্থা নিয়ে Ohio state University-র ইতিহাসের প্রফেসর Robert C. Davis একটি বই লেখেন— *'Christian slaves, Muslim masters'*. সেখানে তিনি খৃষ্টান দাসদের দুর্দশা উল্লেখ করেছেন গাদাগাদি করে থাকার জায়গা, শ্রমের কষ্ট, প্রহার, অপর্যাপ্ত নিম্নমানের খাবার ইত্যাদির। এবং এই অবস্থা ছিল যারা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হত নানান জাহাজে দাঁড় টানা, জাহাজনির্মাণ শিল্পে, খনিতে (public slaves) এবং রাষ্ট্রের অধীনে কর্মচারীর (দিওয়ান) নিয়ন্ত্রণে থাকত— সরকারি দাস (state slaves)। কঠিন কাজগুলো কারা করত public slave হিসেবে? যাদের অন্য কাজের যোগ্যতা ছিল না, বিক্রির সময় যাদের বিশেষ কোনো যোগ্যতার কথা বলার সুযোগ থাকত না, এবং এরাই ছিল অধিকাংশ সরকারি দাস। এদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হত জাহাজে দাঁড় টানার জন্য (galleys)। সরকারি প্রতিষ্ঠানে অব্যবস্থা একালের মত সেকালেও বাস্তব। আবার এই দুর্দশার যে কেবল দাসদের, তাও নয়। সেখানে দণ্ডপ্রাপ্ত মুসলিম স্বাধীন লোক এবং বহু সংখ্যক বেতনভুক্ত লোকও কাজ করত [২৩৪]। দুর্দশা শুধু দাসপ্রথার জন্যই খাস ছিল, এটা ভুল। আসলে ঐ সেক্টরটাই এমন ছিল, যেখানে অত্যাচার-নির্যাতন-দুর্দশা ছিল সাধারণ বিষয়। অবাধ্য দাসদের এসব জায়গায় বিক্রি করে দেয়া হত, বা বিক্রির ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে রাখা হত।

একই বাস্তবতা আরবেও ছিল। Polish Academy of Sciences এর Professor of Middle Eastern Studies জনাব Jerzy Zdanowski উল্লেখ করেন, দাস ছিল দুই প্রকার– শিল্পশ্রমিক আর গৃহস্থালি। আরবের গেরস্থালি দাসেরা কাপড়চোপড়, আচার-ব্যবহার ভালো পেত। আর বেশিরভাগই তাদের মনিবের সাথে সম্পর্কটা ছিল 'পারিবারিক আবেগিক'। এই সম্পর্কের ব্যাপারে দাসরাও যত্নবান ছিল, কেননা, মালিক তাদের জীবনোপকরণ নিশ্চিত করত, এমন এক স্থানে যেখানে তারা নিজেরা

---

[২৩২] আদাবুল মুফরাদ ৭৬ (ihadis) আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ

[২৩৩] আবূ দাউদ, হাদীস : ৫১০৩

[২৩৪] Robert C. Davis, *Christian slaves, Muslim masters,* p73-74

নিজেদের ব্যবস্থা করতে অক্ষম ছিল। বৃটিশ সরকারের ধারণাও ওভারঅল এটাই ছিল যে, আরবে যে দাসপ্রথা প্রচলিত, তা 'mild, gentle or benign' (Hopper 2015).

আজও এসমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করে তাদের অবস্থা যদি দেখেন, খুব একটা পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। যা আমরা Modern Slavery অংশে আলোচনা করব। ইসলাম এমনটিরও অনুমোদন দেয়নি। *'যা খাবে, তাই খাওয়াবে; যা পরবে তাই পরাবে, সাধ্যাতীত বোঝা চাপাবে না'*— ইসলামের শিক্ষা এটাই যা আমরা উপরে এতোক্ষণ বর্ণনা করলাম। সেটা গৃহস্থের দাসই হোক, আর প্রোটো-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কারখানার দাস হোক, কিংবা হোক সরকারি দাস। এসব অব্যবস্থার মাঝেও সামগ্রিক পরিস্থিতি উল্লেখ করেন প্রফেসর ডেভিস:

> " ১৭০০ সালের দিকে, যখন ইসলামী সাম্রাজ্যে দাসপ্রথা বর্তমান, তখনও ইউরোপে এই ধারণা প্রচলিত ছিল, যে মুসলিম বিশ্বে খৃষ্টান দাসেরা আরামেই আছে।

ফরাসী ধর্মযাজক Philemon de La Motte বলেন:

> " Algiers-এর দাসদের কথা বললে, অবশ্যই তারা অতটা অসুখী না। শাসকদের পলিসি, খাস ব্যক্তিদের আগ্রহ/ স্বার্থ (private owners), নগরবাসীদের কিছুটা মিশুক স্বভাব মিলেঝিলে দাসদের কম পরিশ্রমের কারণ হয়েছে, নিদেনপক্ষে তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এটা সত্য [২৩৫]।

ফরাসী পর্যটক Laugier de Tassy চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লেখেন:

> " সাধুসন্ন্যাসীরা আর দাসত্বের অভিজ্ঞতাধারীরা আমাদের বিশ্বাস করানোর জন্য যা বলে, আসলে সেইসব করুণ দুর্দশায় মাগরেবের শ্বেতাঙ্গ দাসেরা ছিল না। [২৩৬]

তবে এরপরও প্রফেসর ডেভিস যেটা বলেছেন:

> " কুরআনের ঐসব বিস্তারিত আয়াত যেগুলো দাসদের সাথে ধৈর্য ও ইনসাফের কথা বলেছে, অধিকাংশ প্রত্যক্ষদর্শীর মতে সেগুলো গুরুত্ব হারিয়েছিল মালিকের খেয়ালখুশির কাছে'। [২৩৭]

এই অভিযোগ আমরা অস্বীকার করি না, এবং মূল আদর্শের ১০০০ বছর বয়সে

---

[235] Ibid, As for the slaves in algiers, they are not indeed so unhappy. The policy of those in power, the interest of particular persons [private owners], and somewhat more sociable disposition of those who inhabit the towns, occasion their lot to be less rigorous, at least for the generality of them.

[২৩৬] Ibid.

[২৩৭] Ibid p69

এসে এটা অস্বাভাবিকও না। আজও আমরা আরবি নামধারীদের কর্মকাণ্ড এটাই দেখি, ৩০০ বছর আগে মুনাফালোভী কিছু দাসমালিকের আচরণ সেই স্বর্ণযুগের মতো হবে তা আশা করাও প্রত্যাশার চাপ বৈ নয়। কিন্তু ইসলাম দাসদের সাথে বাড়াবাড়ির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তি বিধান আগেও যা করেছিল, তখনও তাই ছিল। এবং দাসদের সাথে জুলুম-অত্যাচার, যা হয়েছে, সেজন্য ইসলাম তাদেরকে আদেশও দেয়নি, দায়মুক্তও করেনি। আরবি নামের সবাই মদপান শুরু করলেও ইসলামে মদপান কিয়ামত তক হারামই থাকবে, এবং আখিরাতে শাস্তির হুকুম বলবৎ থাকবে।

উমার রা. দাসীদের প্রহার করতেন

দ্বিতীয় খলিফা উমার রা. এর একটি ঘটনার রেফারেন্স দিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, ইসলাম শুরু থেকেই দাসদাসীদের উপর নির্যাতনকে অনুমোদন করে। যেহেতু উমার রা. এর কর্মকাণ্ড আমাদের দলিল। ঘটনাটি হল: আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন:

قَالَ رَأَى عُمَرُ أَمَةً لَنَا مُتَقَنِّعَةً فَضَرَبَهَا وَقَالَ لَا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ

> “উমার রা. আমাদের একজন দাসীকে নিকাব পরিহিত দেখলেন এবং তাকে চাবুকপেটা করলেন। উমার বললেন: (দাসী হয়ে) স্বাধীনা নারীর মত সাজার চেষ্টা করবে না। [২৩৮]

উমার রা. শরীয়ার বিধিবিধানের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন: ... وأشدهم في أمر الله عمر ... ‘এবং *তাদের মাঝে আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর হল উমার’*। [২৩৯] এটা উমার রা. এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি যখন দিনে-রাতে বাজারের ভিতর বের হতেন, তখন সাথে চাবুক/বেত রাখতেন। কাউকে আল্লাহর হুকুমের খেলাফ কিছু করতে দেখলে স্বহস্তে তাকে প্রহার করতেন। এরকম বহু ঘটনা তাঁর জীবনীতে বর্ণিত রয়েছে [২৪০]।

* বর্ণিত আছে যে, ‘جَلَدَ رَجُلَيْنِ سَبَّحَا بَعْدَ الْعَصْرِ’ দু জন লোক আসরের পর সাবহা তথা যুহরের সালাতের কাযা আদায় করায় (সালাত কাযা হওয়ার অপরাধে) তিনি তাদেরকে চাবুক পেটা করেন। [২৪১]

---

[২৩৮] মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৬/২৩৬
[২৩৯] তিরমিযী, আলবানী রহ. সহীহ বলেছেন।
[২৪০] উমার রা. কেন অমর, সংকলক: এ.বি. এম. কামাল উদ্দীন শামীম, আনোয়ারুল কুরআন প্রকাশনী
[২৪১] ইবনু মানযুর, লিসানুল মিযান, ২/৪৭৩।

* মুয়াবিয়া রা. এর পুত্র (পরবর্তীতে খলীফা) ইয়াজিদকে সাঙ্গপাঙ্গ-সহ রেশমী পোশাক পরিধানের জন্য হাতে থাকা চাবুক দ্বারা আঘাত করেন।
* তিনি নারী-পুরুষ একসাথে কা'বার তাওয়াফে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। একবার এক পুরুষকে নারীদের সাথে নামায পড়তে দেখে হাতের চাবুক দ্বারা আঘাত করেন।
* মাদায়েন জয়ে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন কিতাবের প্রশংসা শুনে একজনকে চাবুকপেটা করেন।
* এক ব্যক্তি উমার রা. এর সামনেই তাঁর প্রশংসা করে আরেক লোককে বলেছিল: দেখো ইনি (উমার) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এইজন্য তাকেও চাবুক দিয়ে পিটিয়েছেন, কেন আবু বাকরের আগে তাঁকে স্থান দেয়া হল।

সুতরাং দাসীকে প্রহারের যে বিবরণ পাওয়া যায় প্রথমত, তার বর্ণনাসূত্র সন্দেহমুক্ত নয় [২৪২]। দ্বিতীয়ত, যদি মেরেও থাকেন, উমার রা. সবাইকেই আইনভঙ্গের জন্য চাবুকপেটা করতেন। কেবল দাসী বলেই মেরেছেন, তা নয়। দাসীটির এখানে অপরাধ ছিল— প্রতারণা; সে স্বাধীনা নারী সেজে মানুষকে ভুল মেসেজ দিতে পারত (impersonation)। নিয়ম ছিল, স্বাধীনা নারী নিকাব করবে, পরাধীন দাসীরা নিকাব করবে না। এমনকি ইবনে কুদামা রহ. বলেন: অধিকাংশ উলামাদের মতে, দাসীদের জন্য মাথা না ঢেকে নামায পড়া জায়েয [২৪৩]। দাসীদের জন্য পর্দায় ছাড় থাকলেও পুরুষদের জন্য চোখের হেফাজতে কোনো ছাড় নেই। এই ঘটনা থেকে— ইসলাম দাসদাসীদের প্রহার করতে বলে কিংবা গণহারে দাসদাসীদের পেটাই করা হতো— এমনটা প্রমাণ করতে চাওয়াটা চূড়ান্ত অসততার নামান্তর।

আরব মুসলিম দাসব্যবসা

দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে আফ্রিকার দাসদের সাপ্লাই গেছে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে।

---

[২৪২] ইবনে কাত্তান বলেন: এই বর্ণনা দাসীর পোশাকের ব্যাপারে উমার রা. থেকেই পাওয়া যায়, এবং সূত্রও নির্ভরযোগ্য না। এবং এতে এর বেশি কিছুও নেই যে, দাসীকে স্বাধীন নারী সাজার জন্য দোষারোপ করা হয়েছে, পোশাকের জন্য নয়। [আহকামুল নজর ১/২৩০]

Abu Amina Elias (December 9, 2019). Slave girls showing their naked breasts? Faith in Allah.

[২৪৩] আল-মুগনী ১/৪৩২

একটা হল Trans Saharan Slave Trade. ফরাসি-সেনেগালীয় নৃতাত্ত্বিক Tidiane N'Diaye তাঁর *Veiled Genocide* বইয়ে দাবি করেন: গত ১৪০০ বছর ধরে ৮ মিলিয়ন (৮০ লক্ষ লোক) বিক্রি হয়েছে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম শহরগুলোতে। আরবেরা লাগাতার সাব-সাহারান আফ্রিকায় **হামলা করেছে * , বন্দি করে নিয়ে গেছে** ৩ মাসের পথ। ৫০% পথেই মারা যেতো **।

আরেকটা হলো পূর্বাঞ্চলীয় দাসব্যবসা। Tidiane N'Diaye-এর মতে এই রুটে দাস গেছে ৯০ লাখ। তার অভিযোগ হল : 'সবাই কেবল 'তথাকথিত' পশ্চিমা ট্রান্স-আটলান্টিক দাসব্যবসা নিয়েই কথা বলে ***। কিন্তু বাস্তবে আরব-মুসলিম দাসব্যবসা ছিল আরও বড়' ****। তার এই কথা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। উত্তর আফ্রিকা, জাঞ্জিবার ও দক্ষিণ আফ্রিকার দাসপ্রথা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। আমাদের পুরো বই জুড়েই আমরা এসব এলাকা নিয়ে গবেষণা উল্লেখ করেছি। পাঠকের সুবিধার্থে বইয়ের শেষে এলাকাভিত্তিক দাসপ্রথার পরিস্থিতি নিয়ে কোন কোন পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছি, তা নির্ঘণ্ট আকারে দেয়া হল। সেখান থেকে সহজেই আফ্রিকার কোন অংশে দাসপ্রথা নিয়ে গবেষকরা কী বলেছেন, তা বের করে একসাথে দেখতে পারেন। আমরা উপনিবেশ সেনেগাল অরিজিনের আর শাসক ফ্রান্সে থিতু লেখক Tidiane N'Diaye-এর দাবিগুলো বিশ্লেষণ করব।

আমরা শুরুতেই তার দাবিকে মেনে নেব। হার্ভার্ড, মিশিগান ও নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক Frederick Cooper-এর ভাষায়:

> “ ইসলামী আফ্রিকাতে আমরা যা দেখি (Muslim African societies), একই জিনিস আমরা আফ্রিকার অমুসলিম অংশেও দেখি। সুতরাং এর কারণ ইসলাম না, ইসলাম অনেক স্থানে সেই সমাজের বাস্তবটাকে মেনে নিয়েছে। ... বরং ইসলাম যে কাজটা করেছে, দাসের সাথে ভালো আচরণকে পুরস্কৃত করেছে, দাসদের ইসলাম শিখিয়েছে, এবং সবশেষে ইসলামী আইনী ছকে ফেলে তাদের মুক্তি দিয়েছে। [২৪৪]

* সাব-সাহারান এলাকায় আরবরা লাগাতার হামলা করেছে, এটা তো আমরা শুরুতেই আলোচনা করেছি, পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাজ্যকে দাওয়াহ কিংবা জিযিয়া কিংবা যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামী শাসনের অধীনে আনা, এটা মুসলিমদের ধর্মীয় দায়িত্ব (ফরযে কিফায়া) এবং খলিফার উপর ওয়াজিব। এবং যুদ্ধবন্দিদের দাসে পরিণত করাও একটি অপশন, সুতরাং সাব-সাহারান আফ্রিকায় হামলা এবং দাস বানানোর উত্তর আমাদের

[২৪৪] Cooper, “Islam and Cultural Hegemony”, pp. 286, 7. A fascinating and accessible firsthand account for the latter is Emily Ruete, Memoirs of an Arabian Princess from Zanzibar (Dover Publications, 2009).

এতোক্ষণে পাবার কথা। যেভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেন আরবরা লোকেদের দাস বানানোর জন্যই হামলা করত। অসৎ দাসব্যবসায়ীরা এভাবে দাস কালেকশন করতো না, তা নয়। কিন্তু কেবল দাস কালেকশন করার জন্য, অপহরণ করার জন্য হামলার সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই। দাসব্যবসায়ীদের সম্পর্কে একটা কঠিন হাদিসও রয়েছে।

আর পূর্ব আফ্রিকায় Yao, Makua এবং Marava ইত্যাদি অমুসলিম গোত্রের মাঝে লাগাতার হানাহানি লেগে থাকত। ইথিওপিয়া-সোমালিয়া-সুদান থেকে মূলত আটক এসব যুদ্ধবন্দিদের আনা হত তানজানিয়ার জাঞ্জিবার বন্দরে ও মিসরে। মুসলিম ব্যবসায়ীরা বন্দরে আসত লবঙ্গ ও হাতির দাঁত কিনতে, একই সাথে এসব বহনের জন্য দাসও কিনে নিত। যারা পরবর্তীতে থিতু হত ওমান, সৌদি আরব সহ অন্যান্য মুসলিম শহরে। সুতরাং দাসব্যবসার জন্য একচেটিয়া ইসলামকে যেভাবে আক্রমণ করেছেন, তাও বাস্তবতার বিপরীত। এরপরও কাফিরদের কাছ থেকে দাস কেনা যাবে কি না, সে ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য রয়েছে, কেননা কাফিররা তো দাসত্বে আনার ইসলামী পদ্ধতি (আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বন্দী) মোতাবেক তাদেরকে দাস বানায়নি। সামনে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

** পরিবারে ঠাঁই পাবার আগে কিংবা মার্কেটে আসার আগে তারা নির্যাতনের স্বীকার হতে পারে, এটা অস্বীকারের সুযোগ নেই। সুইডেনের University of Uppsala-র Swahili and African Linguistics-এর এমিরেটাস প্রোফেসর Abdulazizi Lodhi জানান ডয়েচ ভেলেকে:

> “ দাস রপ্তানিতে আফ্রিকান গোত্রগুলোই ছিল মূল হোতা। এবং গবেষণা জানাচ্ছে, **মার্কেটে আসার আগেই (মুসলিমদের হাতে আসার আগেই) প্রতি ৪ জনে ৩ জন মারা যেত— ক্ষুধায়, অসুস্থতায় বা লম্বা সফরের ধকলে।** [২৪৫]

সুতরাং রাস্তায় পরিবহনে মারা যাওয়ার দায় আরব মুসলিমদের উপর চাপানো কতটুকু ন্যায়নুগ, তা সন্দেহ আছে।

*** লেখক যে আমেরিকান দাসব্যবসার মত ইতিহাসের সুস্পষ্ট ও অবিতর্কিত একটা অধ্যায়-কে 'তথাকথিত' বলেছেন, এতেই তাঁর উদ্দেশ্য উন্মোচিত হয়ে গেছে। প্রভুর গুণ গাওয়াই যে তার এই অভিযোগের লক্ষ্য, তা স্পষ্ট। Morgan State University-র ইতিহাসের অধ্যাপিকা Mary Ann Fay বলছেন,

---

[২৪৫] Silja Fröhlich (AUG 2019), East Africa's forgotten slave trade, Deutsche Welle
'When it came to exports, tribal Africans themselves were the main actors. In many African societies there were no prisons, so people who were captured were sold.'

“ বিশ্ব-ইতিহাসের অধিকাংশ পাঠেই আমেরিকা-ক্যারিবিয়ান-ব্রাজিলের চিনি-ধান-তুলাখেতের দাসপ্রথাকে প্যারাডাইম ধরে নেয়া হয়েছে।

অভিযোগকারী সেই প্যারাডাইমের মধ্যেই ইসলামের দাসপ্রথাকে জোর করে ঢুকানোর চেষ্টা করছেন। অথচ Suzanne Miers এবং Igor Kopytoff সহ অন্যান্য 'আফ্রিকার দাসপ্রথা' বিশেষজ্ঞরা বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন, সেই ১৯৭৭ সাল থেকে : 'আফ্রিকার দাসপ্রথা ছিল অনেক লঘু (benign), কেননা আফ্রিকা পশ্চিমা মডেল ফলো করেনি'। African slavery-র অন্যান্য পণ্ডিতরা মনে করেন, সারাজীবন আফ্রিকাতে কেউ দাস থাকত না এবং মালিকের গোত্রের সাথে মিশে যেত।

**** এমনকি যে সংখ্যা অভিযোগকারী উল্লেখ করেছেন, তাও বাস্তবতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রোফেসর Lodhi বলে: ১ কোটি ৭০ লাখ দাস বাইরে রপ্তানি? কীভাবে সম্ভব যখন পুরো আফ্রিকা মিলে জনসংখ্যাই সেসময় ৪ কোটি হবে কি না সন্দেহ। হিসেবগুলো তো কিছুতেই মেলে না। তাও ধরে নিচ্ছি সঠিক উনি। দাসদের সাথে আচরণের কথা বাদ দিলাম, কেবল সাংখ্যিক অনুপাতের দিক দিয়েও আরব মুসলিম দাসব্যবসাকে আমেরিকান দাসব্যবসার চেয়ে বড় কি বলা যায়? আরবরা ১৩০০ বছর ধরে ১৭ মিলিয়ন, আর ইউরোপ ৩০০ বছরে ১২ মিলিয়ন।

কাফিরদের থেকে দাস ক্রয়

১৮০৮ সালে একজন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কোর্ট কলকাতার মুসলিম মুফতিদের মতামত আহ্বান করে দাসপ্রথার ব্যাপারে। তাঁরা পরিষ্কার জানিয়ে দেন : কেবল দীনের সাথে যুদ্ধকারী কাফিরদেরকে দাস বানানো বৈধ। নিজেকে বা নিজের সন্তানকে বিক্রি করা, বা ঋণের ফাঁদে ফেলে দাস বানানো (যা দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতবর্ষে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা ছিল) অবৈধ। তাঁরা মত দেন : যেসব আফ্রিকানদের আমদানি করা হয়, তারা শরঈভাবে দাস নয়, যদি তাদেরকে অপহরণ বা প্রতারণা করে আনা হয়ে থাকে। [২৪৬]

আবার হিদায়া-আইনশাস্ত্র মতে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে যারা দাস ছিল, ইসলাম তাদের দাসত্বকে বহাল রাখে। এই দুই ফতোয়ার উপর নির্ভর করে ১৮৩০ সালে রায় দেন : আফ্রিকান দাসেরা বা তাদের পূর্বপুরুষরা আসলেই বংশপরম্পরায় দাস কি না, সেটা প্রমাণের দায় মালিকের [২৪৭]। ১৮৪১ সালে মাদ্রাজ কোর্টের মুফতি সাহেবগণও

---

[২৪৬] Amal K. Chattopadhyay, Slavery in the Bengal Presidency, 1772-1843 (London: The Golden Eagle Publishing House, 1977) pp. 158, 170-7.

[২৪৭] D. R. Banaji, Slavery in British India (Bombay: D. B. Taraporevala Sons & Co., 1933) p. 43.

এই ফতোয়া গ্রহণ করেন। [২৪৮]

জাঞ্জ দাসবিদ্রোহ

এবার আসি Zanj rebellion প্রসঙ্গে। ৮৬৯-৮৮৩ পর্যন্ত দাসরা বিদ্রোহ করেছিল ক্ষমতাসীন আব্বাসীদের বিরুদ্ধে। Encyclopaedia Britannica থেকে আমরা জানি ঐ বিদ্রোহে শিয়া ও খারেজীদের ইন্ধন ছিল। জাঞ্জ বিদ্রোহ কেবল একটা দাসবিদ্রোহ ছিল না, এর ফলে ছোট একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছিল। বিদ্রোহের মূল হোতা ছিল আলী বিন মুহাম্মাদ নামক একজন ইরানী শিয়া। তাকে বলা হত 'সাহিবুল জাঞ্জ'। সে বলত: 'আমাকে নবুওয়াত দেয়া হয়েছিল, আমার ভয় হল যদি আমি এর দায়িত্ব আদায় করতে না পারি, তাই অপারগতা প্রকাশ করলাম। [২৪৯] নিজেকে সে একবার আব্বাস বিন আলী আরেকবার হুসাইন বিন আলী রা. এর বংশধর দাবি করে। এ ছাড়া ভবিষ্যদ্বাণী-কেরামতি-ভেল্কিবাজি দিয়ে তার বহু সমর্থক জুটে যায়।

জাঞ্জিবার থেকে আনা দাসদেরকে দক্ষিণ ইরাকের পাললিক সমভূমিতে গ্রীষ্মের তপ্ত দাবদাহের ভিতরে কাজ করানো হত। শহরে শহরে গিয়ে এই আলী বিন মুহাম্মাদ তাদেরকে সংগঠিত করে এই বলে বলে– তোমাদের মনিবদেরকেই তোমরা দাস বানাবে, তোমাদের মালিকেরা তোমাদের বেশি কষ্ট দিচ্ছে, হাদিসে বর্ণিত অধিকার তোমরা পাচ্ছ না। বিদ্রোহীরা বসরা, আবাদান, আহওয়ায ও ওয়াসিত শহর দখলে নেয়। বসরা শহরে কয়েকদিন পর্যন্ত লুটতরাজ, গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগ করে। আহওয়াজ শহরে ৫০ হাজার মুসলিমকে হত্যা ও ৪০ হজার নারী-পুরুষকে বন্দি করে।

টাইগ্রিসের কোলে 'আল-মুখতারাহ' শহরে রাজধানী স্থাপন করে। আলী বিন মুহাম্মাদ নিজ নামে মুদ্রা চালু করে, আমীরুল মুমিনীন উপাধি ধারণ করে। মজার ব্যাপার হল, কোন জাঞ্জ এই রাষ্ট্রে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত হয়নি, বরং দাসই রয়ে গিয়েছিল অধিকাংশই। পরে খলিফা মু'তামিদের ভাই আবু আহমাদ মুয়াফফিক তাদের পরাজিত করেন। তাদের শহর মানিয়া, মানসুরা ও মুখতারাহ দখল করে ধৃতদের তওবার সুযোগ দেয়া হয়। ২৭০ হিজরিতে এক যুদ্ধে 'সাহেবুল জাঞ্জ' নিহত হয়।[২৫০]

---

[২৪৮] Indrani Chatterjee, Gender, slavery and law in colonial India (New Delhi: Oxford University Press, 1999) p. 213.

[২৪৯] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৪/৫৩৯

[২৫০] মাওলানা ইসমাইল রেহান, মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বিশ্বকোষ, ৭/৪১২-৪১৭

এটা মূলত দাসদের নিজস্ব বিদ্রোহ ছিল না, বরং একটা রাষ্ট্রদ্রোহে দাসদের ব্যবহার করা হয়েছিল মুক্তির প্রলোভন দেখিয়ে। এতোটুকুই।

দাসদের খোজাকরণ

আব্বাসী ও উসমানী খিলাফতের সময় কিছু দাসদেরকে বিশেষ উদ্দেশ্যে খোজা করার প্রচলন ছিল। খোজাকরণ ব্যাপারটা ইতিহাসে নানান সমাজে পাওয়া যায়। প্রাচীন আফ্রিকা ও এশিয়ান সমাজে এমনকি এই তো গত শতকের শুরুতেও ইউরোপে খোজা করার চল ছিল। ইতালিয়ান অপেরা সংগীতে উচ্চ কম্পাঙ্কের সুরে (মেয়েদের মত) গান গাইবার জন্য শিল্পীদের শিশুকালেই খোজা করা হত। এদের বলা হত castrato (বহুবচনে castrati)। শেষ খোজা শিল্পী Alessandro Moreschi ১৯২২ সালে ৬৪ বছর বয়সে মারা যান।

ইসলামী সাম্রাজ্যে এই খোজাকরণ এসেছে বাইজানটাইনদের দেখাদেখি। নচেৎ ইসলাম এই খোজাকরণকে কঠিনভাবে দেখে। অন্য মানুষকে তো দূরের কথা, কেউ যদি নিজেকে নিজে খোজা করতে চায়, স্পষ্টভাবে সেটা হারাম বলে দিয়েছে ইসলাম। উসমান ইবনু মায্‌'ঊন রা. একবার বেশি বেশি ইবাদত করার জন্য খাসি হবার অনুমতি চেয়েছিলেন। নবীজী কঠোর ভাষায় সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা জানিয়ে দিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আবেদন করলাম:

– হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে খাসি হয়ে যাবার অনুমতি দিন।
– যে কাউকে খাসি করে অথবা নিজে খাসি হয়, সে আমার উম্মতের মধ্যে নয়। বরং আমার উম্মাতের খাসি হওয়া হল সিয়াম পালন করা। [২৫১]

ইবনে হাজার রহ. এ সম্পর্কিত সব হাদিস পর্যালোচনা করে বলেন: আদমসন্তানের খোজাকরণ হারাম হবার ব্যাপারে আলিমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করে, অনুমতি দেয়া হলে অনেকে করতো, ফলে মুসলিমদের সংখ্যা কমে যেত; এছাড়া এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক, আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন, আল্লাহর অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ, নারীদের সমবতী হবার চেষ্টা, নিখুঁত শরীরে খুঁত সৃষ্টি ইত্যাদি। [২৫২] আজ পর্যন্ত আলিমগণ জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতিকে (শুক্রনালী কর্তন) নাজায়েজ বা হারাম বলেন। দাসদের ব্যাপারে একটি হাদিসে এসেছে :

---

[২৫১] সহীহ বুখারী ৫০৭৩, সহীহ মুসলিম ১৪০২
[২৫২] ফাতহুল বারী ৯/১১৯ সূত্রে islamQA

> “ যে ব্যক্তি তার দাসকে খাসি করবে, আমরা তাকে খাসি করে দেব এবং যে ব্যক্তি তার দাসের কোন অঙ্গ কাটবে, আমরা তার অঙ্গ কাটবো। [২৫৩]

যদিও এই হাদিসের উপর আইনি ফতোয়া নয়, তবে নিষেধাজ্ঞা ও ভীতিপ্রদর্শন রয়েছে হাদিসে। অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই যে, আব্বাসি ও উসমানী খিলাফতে এই গুনাহের কাজটি করা হয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে, যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এর জবাবদিহি অবশ্যই তাঁদের করতে হবে হাশরের মাঠে, যদি না আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে থাকেন।

অনেক সমকামী এক্টিভিস্ট ইসলামের ইতিহাসে এই খোজাকরণকে সামনে এনে সমকাম চর্চার বৈধতা মুসলিমদের মাঝে প্রচার করতে চায়। খোজাকরণের প্র্যাক্টিসের সাথে সমকামিতার কোনো সম্পর্ক নেই। ফরাসী জহুরী ও পরিব্রাজক Jean-Baptiste Chardin তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লেখেন,

> “ প্রাচ্যের পুরুষরা তাদের নারীদের প্রতি যে গাইরত (protective jealousy) অনুভব করে, তা থেকেই খোজাকরণের মত প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও অমানবিক প্রথার উদ্ভব। নিজেদের নারীদের পাহারা দেবার উদ্দেশ্যে এদের খোজা করা হলে রাষ্ট্রীয় বিরাট দায়িত্বেও তাদের দেখা যেত। অভিজাত পরিবারে খোজারা অন্দরমহলে গৃহশিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করত। অনেক জ্ঞানীগুণী খোজাদের দেখেছি আমি। [২৫৪]

মূলত নিজেদের নারীদের রক্ষা, পাহারা, ফাইফরমাশ, শিক্ষাদীক্ষা নিরাপদে পুরুষদের দিয়ে করানোর উদ্দেশ্যেই বিজাতীয় এই প্রথা আমদানি হয়েছে ইসলামী সভ্যতায়। হাজার হাজার নারীর হারেম প্রশাসন চালানো, তাদের ও সন্তানদের বেড়ে ওঠা, শিক্ষা কার্যক্রম, নিরাপত্তা ও সুলতানের সাথে লিয়াজোঁর জন্য নিরাপদ কর্মকর্তা সরবরাহের জন্য এই অনৈসলামিক চর্চা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় খরচে হাজার হাজার নারী এভাবে রাখাটাই ইসলামের মেজাজের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলাম যে দুনিয়াবিমুখতা ও অল্পেতুষ্টির শিক্ষা দেয়, তা পরবর্তী সুলতানদের জীবনের সাথে বহুলাংশেই মেলে না। একটা গুনাহ টেনে আনে আরেকটি গুনাহ, এক বিদআতকে টিকিয়ে রাখতে আনতে হয় আরেক বিদআত। হারেম কালচারের ব্যাপারে সামনে যথাসময়ে আলোচনা হবে।

---

[২৫৩] তিরিমিযি ১৪১৪, আবু দাউদ ৪৫১৫, ইবনে মাজাহ ২৬৬৩। ইমাম মুনজিরী বলেন : ইমাম তিরমিযীর মতে, হাদিসটি হাসান গারিব।

[২৫৪] Voyages du Chevalier Chardin, ed. Louis Langlois, Paris, Le Normant, 1811, vol. I সূত্রে Anthony A. Lee, Africans in the Palace: The Testimony of Taj al-Saltana Qajar from the Royal Harem in Iran

দাসমুক্তি

আমরা শুরুতেই বলেছি, ইসলামের মৌলিক নীতি হল: মানুষ স্বাধীন, যদি না স্বাধীনতা খর্ব করার কোনো কারণ থাকে। কাফির যুদ্ধবন্দিদেরকে দাসপ্রথায় আনার কারণ ছিল: তাদের কুফর এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। দাস হিসেবে গ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে মুসলিম সমাজের মূলধারায় রেখে হিদায়াতের পরিবেশ দেয়া হয়েছে। সু-আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে আকর্ষণ করা হয়েছে, এবং গণহারে তাদেরকে ইসলামে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে পরকালীন জীবনে চূড়ান্ত ক্ষতি থেকে সে বেঁচে যায়।

দাস ইসলাম গ্রহণ করলেই মুক্তি?

হিদায়াতের পরিবেশে আনার দ্বারা ইসলামের মৌলিক লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। এখন তাকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। হিদায়াত আল্লাহর হাতে, তিনি ছাড়া আর কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। মানুষ কেবল হিদায়াতের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। আল্লাহ বলেছেন তাঁর রাসূলকে:

> “তুমি যাকে ভালবাস তাকে সৎপথ দেখাতে পারবে না, বরং আল্লাহ্ই যাকে চান সৎ পথে পরিচালিত করেন, সৎপথপ্রাপ্তদের তিনি ভাল করেই জানেন।[২৫৫]

সুতরাং মুক্তি পাওয়াটা ইসলাম গ্রহণের সাথে খাস নয়। ইসলাম গ্রহণ করলে অটোমেটিক মুক্ত হয়ে যাবে, আর গ্রহণ না করলে মুক্তি দেয়া যাবে না, এমন নয়। অমুসলিম দাসকেও মুক্ত করা যাবে। আবার দাস মুসলিম হয়ে গেলেও তাকে মুক্তি

[২৫৫] সূরা কাসাস ২৮: ৫৬

না দিয়ে দাসত্বে রাখা যাবে। আল্লামা শানকিতী রহ বলেন: 'এটা তো স্বীকৃত মূলনীতি যে, যে অধিকার আগেই সাব্যস্ত, তা পরের অধিকার দ্বারা বাতিল হয় না'। আরেকটি বিষয় যে, দাস মুসলিম হলেই যদি মুক্তিকে বাধ্যতামূলক বা অটো করা হত, তবে মনিব দাসের ইসলাম গ্রহণকে অপছন্দ করত, কেননা এতে তার আর্থিক লোকসান হত। যেমনটি আমরা দেখি প্রোফেসর ডেভিসের লেখায়:

> “ মুসলিম মালিকেরা নিজেরাই এইসব সুযোগসন্ধানী ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে ছিল। কেননা মুসলিম হয়ে গেলে দাসটার বিক্রয়মূল্য যেত অনেক কমে। [২৫৬]

মুসলিম দাসকে মুক্তি দেওয়াটা ইসলাম কেবল উৎসাহিত করেছে, তাতেই মালিকপক্ষ একে আর্থিক ক্ষতির কারণ ভাবা শুরু করেছে। যদি মুসলিম হলেই অটো-মুক্ত হবার বিধান দেয়া হত, তবে আরও গুরুতর হয়ে যেত ব্যাপারটা। তাহলে মূল যে উদ্দেশ্য 'হিদায়াতপ্রাপ্তি' সেটাই সুদূর পরাহত হয়ে যেত। এজন্য ইসলাম ধর্ম-নির্বিশেষে 'মুসলিম পরিবেশে আসা' দাসের জন্য মুক্তির রাস্তা রেখেছে মালিককে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। যাতে মালিক তার ইসলাম গ্রহণে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। আবার লোকসানের অনুভূতিও কাজ না করে (পারলৌকিক সওয়াবের উৎসাহে বা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে প্রাপ্তি অর্জন রেখে)।

বিধান হিসেবে দাসমুক্তি

ইসলাম বিদ্বেষীরা প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, দাসমুক্তি তো ইসলামের পূর্বেও ছিল। এ আর নতুন কী? যেমন, আবু লাহাব তার দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছিল রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের কথা শুনে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে ইসলামের পূর্বেও দাসমুক্তি ছিল। কিন্তু তা ছিল একান্তই ব্যক্তিগত খেয়ালের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইসলাম একে ধর্মীয় বিধানে পরিণত করেছে। দাসমুক্তিকে মহিমান্বিত করেছে, ফযীলতের কাজ বানিয়েছে। শুধু তাই নয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে (কাফফারা) দাসমুক্তিকে বিধান করেছে যে, তোমাকে দাসমুক্তি করতেই হবে, নইলে হবে না; যা আমরা সামনে দেখবো।

এমনিতেই বদান্যতা-মহানুভবতা থেকে দাসমুক্তি আর ধর্মীয় বিধান হিসেবে দাসমুক্তির মাঝে আছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বদান্যতা স্বার্থের কাছে পরাজিত হয়ে যায়। কিন্তু ধর্মবোধ ও পারলৌকিক লাভের আশা জয়যুক্ত হয় পার্থিব স্বার্থের কাছে।

---

[২৫৬] Davis, p22

যদি সেক্যুলার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, দাসমুক্তি একটা আর্থিক লোকসানের কাজ ছাড়া কিছুই না। এই লোকসান একজন মানুষ কখন মেনে নেবে, যখন সে আরও বড় লাভ দেখবে। এটাই হিউম্যান সাইকোলজি।

ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থাকা আর না থাকার পার্থক্যটা বাস্তবে কেমন হয়। একটা উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে।

ধর্মীয় বিধান হিসেবে[২৫৭]	ধর্মীয় বিধান নয়, স্রেফ মানবতা থেকে [২৫৮]
* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬৩ জন দাস মুক্ত করেছেন। * আম্মাজান আয়িশা (রা.) ৬৯ জন * আবু বকর (রা.) অসংখ্য * আব্বাস (রা.) ৭০ জনকে * উসমান (রা.) ২০ জন * হাকিম বিন হিযাম (রা.) ১০০ জন * আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) ১০০০ জন * আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) ৩০০০০ দাসকে মুক্ত করেছেন। * যুলকালাহ আল হিমইয়ারী (রা.) একদিনে ৮০০০ দাস মুক্ত করেন।	* Eva Sheppard Wolfe এর মতে ভার্জিনিয়া প্রদেশে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পরের ২ দশকে দাসমুক্তির হার ছিল সবচেয়ে বেশি। সেটা কত? ২ দশকে মানে 'বিশ বছরে ১১,০০০ জন'। শুধু ভার্জিনিয়ার ২,৯৩,০০০ দাসের মধ্যে ২০ বছরে ১১,০০০। ওনার হিসেবে দাসমুক্তির হার ০.২%। * Willem Klooster গণনা করেছেন দাসমুক্তির হার বছরে ০.৫%। (পৃ : ৩) * Keila Grinberg এর গবেষণায় পর্তুগীজ ব্রাজিলে 'প্রতি দশ বছরে ১০০ জন' দাস মুক্ত হত। (পৃ : ১১) * ১৫-৪৪ বছর বয়সী মহিলাদের মুক্তির সম্ভাব্যতা ছিল ০.১৬%, আর পুরুষের ছিল ০.০৯%। (পৃ : ১১৪)

এটাই হল ধর্মীয় বিধানের কারণে মুক্তি এবং ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি থেকে মুক্তিদানের মাঝে পার্থক্য। ইসলাম এতো বাহানা তৈরি করে মুসলিম-অমুসলিম দাসকে মুক্তির ব্যবস্থা করেছে, যে অনেক গবেষক তো বলেই বসেছেন: ইসলাম আসলে দাসপ্রথা চায়-ই না। চলুন দেখা যাক।

---

[২৫৭] আল-কিতানী 'আত-তারাতীবুল ইদারিয়াহ' কিতাবে এই গণনা করেছেন, পৃষ্ঠা : ৯৪, ৯৫। নবাব সিদ্দীক হাসান খান, ফতহুল আল্লাম শরহে বুলুগুল মারাম, কিতাবুল ইতক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩২ সূত্রে তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ইঃফাঃ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯।

[২৫৮] *Paths to Freedom: Manumission in the Atlantic World;* edited by Rosemary Brana-Shute, Randy J. Sparks.

বাধ্যতামূলক দাসমুক্তি

ক. মুকাতাবাহ/ লিখিত চুক্তি

এটি এমন একটি চুক্তি বুঝায় যার দ্বারা দাস নিজেই নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধের বিনিময়ে নিজের মুক্তির জন্য মনিবের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ নিজের মুক্তি নিজে কিনে নেবে। কুরআনে আল্লাহ বলেন—

> " তোমাদের অধিকারভুক্ত যারা চুক্তিবদ্ধ হতে চায়, তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও, যদি তাতে কল্যাণ থাকে'। [২৫৯]

এ আয়াতের প্রেক্ষিতে আলিমগণ বলেছেন, ঐ মালিকের জন্য চুক্তি করা ওয়াজিব [২৬০]। মানে দাস মুক্তির চুক্তি করতে চাইলে মনিব চুক্তিতে উপনীত হতে বাধ্য। না করতে পারবে না।

হানাফি মত অনুসারে: কেউ যদি দাসকে অর্থের বিনিময়ে মুক্তির প্রস্তাব দেয়, আর ঐ দাস যদি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহলে কবুল করা মাত্র সে মুক্ত হয়ে যাবে (যদি শর্ত না থাকে যে, শোধের পর তুমি মুক্ত)। এবং প্রদেয় অর্থ তার দেনা হিসেবে বা ঋণ হিসেবে থাকবে। এসব বিধান থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম মুক্তি দেবার জন্য উন্মুখ। মালিকের ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণ যে মুহূর্তে নেই, না থাকলে (দাস তো টাকা শোধই করবে), ইসলামের উদ্দেশ্য মুক্তি। দাস নিজে উপার্জন করে পরিশোধ করবে। প্রোফেসর ডেভিস আলজেরিয়া-তিউনিসিয়ার দাসদের সম্পর্কে লিখেছেন—

> " অনেকে তো নিজস্ব ব্যবসাও চালাতো, আবার কেউ কেউ নিজেও দাস রাখত, তবে অধিকাংশই মালিকের এগ্রোফার্মে বা ব্যবসায় কাজ করতো বা অন্য কোথাও ভাড়ায় খাটতো। [২৬১]

> " কারও কারও কাজ তো ইউরোপের বেতনভুক্ত কর্মীদের মত। পানি আনা, টয়লেট সাফ করা, দোকান থেকে গরম রুটি আনা, সপ্তাহে একবার বাসা ও উঠোন ধোয়া, চাদর-বিছানা ধোয়া, মাসে দু'বার বাসা চুনকাম করা, ঘরের বাচ্চাকাচ্চাদের খেয়াল রাখা। এমন ক্ষেত্রে বাইরে ঘুরে বেড়ানোর এবং অন্য আয়ের ধান্ধা করার বেশ সময় পাওয়া যেত।

---

[২৫৯] সূরা আন নূর-৩৩ (কল্যাণ বলতে বুঝায় মুক্তি লাভের পর তারা চুরি-ব্যভিচার-অন্যায়-অপকর্ম করে বেড়াবে না। এক্ষেত্রে অবশ্যই তাদেরকে মুক্তিলাভের সুযোগ দেয়া উচিত। যাতে তারা মুক্তিলাভের পর আত্মসংশোধনের পথে উন্নতিলাভ করতে পারে। এবং কোথাও বিবাহ করে চাইলে স্বাধীনভাবে তা করতে সমর্থ হয়। দাসত্বের কারণে ক্ষেত্র সংকুচিত না থাকে। [তাওযীহুল কুরআন ২/৪৩২]

[২৬০] শাইখ তারিফী, তাফসীর ওয়াল বয়ান লি আহকামিল কুরআন ৪/২০৯

[২৬১] Davis, Christian Slave and Muslim Masters, p16

> “ এবং নিজের ভরণপোষণ বাবদ খরচ অর্থ মালিককে দিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ নিজের কাছে রাখতে পারত, যা দিয়ে পরে মুকাতাবা বা gileffo নামক টাকা দিয়ে স্বাধীন হয়ে যেত। এমনকি public slave-রাও এভাবে মুক্ত হতে পারত। [২৬২]

যেসব দাসরা এই চুক্তি করেছে, তাদের অর্থ পরিশোধে ইসলাম সাহায্যের আহ্বান জানিয়েছে মুসলিম সমাজের কাছে। নানাভাবে মুসলিমরা সহায়তার হাত বাড়িয়ে তাকে মুক্ত করবে। যেমন:

১. যাকাত

যাকাতের একটি খাত ইসলাম নির্ধারণ করেছে দাসমুক্তি [২৬৩]। যাকাতের টাকা থেকে মুকাতাবকে (চুক্তিবদ্ধ দাস) সাহায্য করা যাবে।

২. কিস্তি

গোলামের জন্য এই ছাড় রয়েছে যে, সে মনিবকে কিস্তিতে অর্থ পরিশোধ করতে পারবে অর্থাৎ একসাথেই পুরো অর্থ দেওয়া লাগবে না। [২৬৪]

৩. মালিকের পক্ষ থেকে সাহায্য

মনিবের কর্তব্য হলো দাসকে অর্থ পরিশোধের ব্যাপারে সাহায্য করা। হাদিসে এসেছে,

> “ যে তার দাসকে মুকাতাবাহর ব্যাপারে সাহায্য করবে আল্লাহ্ তাকে হাশরের ময়দানে আরশের ছায়া দান করবেন। [২৬৫]

সাহাবাগণ মুকাতাব দাসের বিনিময় মূল্য ১/৩ , ১/৪ বা আরও কিছু কমিয়ে দিতেন। চুক্তির মাধ্যমে মুক্তির বিষয়টি সহজসাধ্য করে দেয়া থেকেও ইসলাম যে মুক্তিকে ত্বরান্বিত করেছে, তা আন্দাজ করা যায়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, সকল দাসের যে মুকাতাবাহর সামর্থ্য থাকবে ব্যাপারটা এমন নয়। তো যাদের সামর্থ্য নেই, তারা কি মুক্ত হতে পারবে না? জ্বি, অবশ্যই পারবে। সেজন্য বহু ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। এতো বেশি রাস্তা ইসলামে মুক্তির জন্য দেয়া রয়েছে যে, সমাজে দাস থাকাই কঠিন।

---

[২৬২] Ibid, p88-91
[২৬৩] কুরআন-৯/৬০
[২৬৪] সহিহ বুখারি, কিতাবুল ইতক, হা-২৩৯৩
[২৬৫] মাজমাউয জাওয়ায়েদ ৪/৮৩

খ.পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে দাসমুক্তি

বিভিন্ন অহরহ ঘটে থাকে এমন পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং বিপদাপদ থেকে বাঁচার নেক-আমল হিসেবে ইসলাম দাসদের জন্য মুক্তির বাহানা রেখেছে। বিধানই করে দিয়েছে। যেমন—

- যদি দাসকে প্রহার করা হয় তবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাকে মুক্ত করতে হবে। ইবনে উমার (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একথা বলতে শুনেছি :

> “ যে ব্যক্তি নিজ ক্রীতদাসকে চপেটাঘাত করল বা প্রহার করল, এর কাফফারা/ প্রায়শ্চিত্ত হল তাকে মুক্ত করে দেয়া। [২৬৬]।

- কাউকে অনিচ্ছাকৃত হত্যা করলে দাসমুক্ত করতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: [২৬৭]

> “ আর কোন মুমিনের কাজ নয় অন্য মুমিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত (হলে ভিন্ন কথা)। **যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে** এবং দিয়াত (রক্ত পণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি সদাকা (ক্ষমা) করে দেয় (তাহলে দিতে হবে না)। আর সে যদি তোমাদের শত্রু কওমের হয় এবং সে মুমিন, তাহলে একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে। আর যদি এমন কওমের হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে তাহলে দিয়াত দিতে হবে, যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিবারের কাছে এবং একজন মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে। তবে যদি না পায় তাহলে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করবে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

- প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে দাস মুক্ত করতে হবে। আল্লাহ বলেন: [২৬৮]

> “ আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অর্থহীন কসমের ব্যাপারে, কিন্তু যে কসম তোমরা দৃঢ়ভাবে কর সে কসমের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করেন। সুতরাং এর কাফফারা হল দশ জন মিসকীনকে খাবার দান করা, মধ্যম ধরনের খাবার, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে খাইয়ে থাক, অথবা তাদের বস্ত্র দান, কিংবা একজন দাস-দাসী মুক্ত করা।

---

[২৬৬] মুসলিম ই.ফা., কিতাবুল আইমান/ কসম, হাদিস নং ৪১৫২,৪১৫৩,৪১৫৪

[২৬৭] কুরআন-৪/৯২

[২৬৮] কুরআন ৫/৮৯

■ রোযাবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে দাসমুক্ত করতে হবে [২৬৯] আবূ হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত:

> "এক ব্যক্তি রমাযানের সওম ভঙ্গ করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে একটি গোলাম আযাদ করার অথবা একটানা দুই মাস সওম পালন অথবা ষাটজন মিসকীনকে আহার করানোর নির্দেশ দেন।

■ যিহার করলে দাসমুক্ত করতে হবে [২৭০] যিহার মানে হলো ঝগড়ার সময় স্ত্রীকে বলা, 'তুমি আমার মায়ের মতো'। আল্লাহ পাক বলেন:

> "আর যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে অতঃপর তারা যা বলেছে তা থেকে ফিরে আসে, তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করবে। এর মাধ্যমে তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।

দাসমুক্তি-কে সওয়াবের আমল হিসেবে ঘোষণা

দাসমুক্তিকে একটা বিরাট নেক আমল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাধ্যতামূলকের পাশাপাশি অপশনাল বা সওয়াবের আশায় দাসমুক্তিকে ব্যাপক উৎসাহিত হরা হয়েছে। যেমন—

■ সূর্যগ্রহণের সময় দাস মুক্ত করার কথা এসেছে। আসমা (রা.) বর্ণনা করেন :

> "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সূর্যগ্রহণের সময় দাস মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। [২৭১]

■ যাকাতের ৮ খাতের এক খাত তো আছেই যে, যাকাতের টাকায় দাস কিনে মুক্ত করা [২৭২]। আল্লাহ বলেন:

> "নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন

---

[২৬৯] আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, হাদিস নং ২৩৯২

[২৭০] কুরআন ৫৮/৩ এবং আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, হাদিস নং ২২০৮

[২৭১] বুখারী ই.ফা., কিতাবুল কুসুফ/সূর্যগ্রহণ, ২য় খণ্ড, হাদিস নং ৯৯৬

[২৭২] কুরআনঃ৯/৬০

করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

উমার বিন আবদুল আযীয (রহ.) এর আমলে ইফ্রিকিয়া প্রদেশে (বর্তমান তিউনিসিয়া) তাঁর নিযুক্ত যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা ইয়াহিয়া বিন সাঈদ। তিনি বলেন, আমি যাকাত কালেকশন করলাম কিন্তু দেবার মত কাউকে পেলাম না। পরে ঐ টাকা দিয়ে স্থানীয় দাসদের কিনে মুক্ত করলাম ইসলাম গ্রহণের শর্তে। [২৭৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর ৭ জন সাহাবী মিলে মুক্ত করেছেন ৩৯,৩২২ জন দাস! আরো সোয়া লক্ষ সাহাবী যাদেরকে মুক্ত করেছেন তাদের সংখ্যা তাহলে কত। প্রত্যেকে যদি একজন করেও মুক্ত করে তাহলেও সোয়া লক্ষ দাস মুক্ত হয়েছে। যুদ্ধবন্দি ছাড়া আর কোনো উপায় ইসলাম রাখেনি দাস বানানোর। তাহলে এবার নিকেশ করেন, ইসলামের প্রথম ৫০ বছরে যুদ্ধই হয়েছে ক'টা, আর দাস হয়েছে ক'জন, আর মুক্তই হল ক'জন। এর পিছনে কারণ কী? এর পিছনে একমাত্র ফ্যাক্টর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পারলৌকিক মুক্তি। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> “ কেউ যদি তার মুসলিম দাসকে আজাদ করে দেয় তবে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রত্যেক অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন দাসের প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে। [২৭৪]

যার দরুন, কারণে-অকারণে দাস মুক্ত করা সাহাবাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কুফার গভর্নর মুহাম্মদ বিন সুলাইমান (৭৬৪-৭৭২ খ্রি:) ১২০০০ দাস মুক্ত করেন একাই। [২৭৫] এমনকি হাজার বছর পরেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাই। তুরস্কে বুর্সা শহরে কোর্ট ডকুমেন্ট থেকে প্রাপ্ত গবেষণায় এসেছে ১৯৯ জনের মাঝে ১৪০ জনকেই (৭০%) মুক্ত করা হয়েছে কোনো বিনিময় ছাড়া, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। ৪৬ জন মুক্ত হয়েছে 'মুকাতাবা' চুক্তির দ্বারা। [২৭৬]

---

[২৭৩] . ফিকহুল যাকাত, শায়খ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৬

[২৭৪] মুসলিম ই.ফা., হাদিস নং ৩৬৫৩

[২৭৫] Daniel Pipes (1980): Mawlas: Freed slaves and converts in early Islam, Slavery & Abolition: A Journal of Slave and Post-Slave Studies, 1:2, 132-177

[২৭৬] Osman Cetin (2001), Slavery and Conversion of the Slaves to Islam in the Ottoman Society: According to the Canonical Registers of Bursa between XVth and XVIIIth Centuries, Uludug University İlahiyat Fakültesi Dergisi, Vol.10:1

উসমানী ইতিহাসবিদ Ahmed Cevdet Pasha-র মেয়ে Fatma Aliye বলেন: ১৯শ শতকে এটা আম পাবলিকের কাছে বিশ্বাসের মত হয়ে গিয়েছিল যে, ৭-৯ বছর পর দাসদের মুক্ত করে দিতে হয়; বা মুক্ত করে দিতে পারে, এমন ধনী লোকের কাছে বিক্রি করে দিতে হয়।

দাসপ্রথা বিশেষজ্ঞ Orlando Patterson এর মতে দক্ষিণ USA-তে দাসমুক্তির হার ছিল ইতিহাসে সর্বনিম্ন। বিপরীতে আফ্রিকার মাগরেবে খ্রিস্টান দাসদের মুক্তির হার ছিল উচ্চ। [২৭৭]

ইসলামের দাসপ্রথা মানসুখ বা রহিত না হওয়াটাই কাফিরদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার রহমত, বড় ইহসান। নিছক বস্তুবাদী চোখে দেখলেও: 'হ্যান্ডস আপ' অবস্থায় শত্রুসেনাকে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসে ইসলামেরই সেনা বানিয়ে নেয়া— এই কাজটা আর কোনো সভ্যতা বা আদর্শ করে দেখাতে পারেনি। নিশ্চিত জাহান্নামী হয়ে যাওয়া থেকে উঠিয়ে পরকালের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এই দাসপ্রথা, শত্রুর যোগ্যতাকে ইসলামের পক্ষে ব্যবহার করেছে দাসপ্রথা। যে ইসলাম তাদেরকে দাস বানিয়েছে...

- সেই দাসেরাই আলিম-আইনজ্ঞ-মুহাদ্দিস হিসেবে সেই ইসলামের জ্ঞানতত্ত্বকেই বিকশিত করেছে, সংরক্ষণ করেছে।

- সেনা হিসেবে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে, স্বজাতির বিরুদ্ধে লড়েছে। মোঙ্গলদের নৃশংস হাতে ইসলামী সভ্যতা যখন নিভুনিভু, দাস রাজবংশ আইনে জালুতের যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করে ইসলামকে রক্ষা করেছে।

- জ্যানিসারি সেনারা নিজ জাতির বিরুদ্ধে ইসলামের পক্ষে প্রাণ দিয়েছে। রাদু বে সেনাপতি হিসেবে আপন ভাই ভ্লাদের (ড্রাকুলা নামে পরিচিত) বিরুদ্ধে হন্যে হয়ে ঘুরেছে।

- মামলুক (দাস) রাজবংশগুলো এবং জ্যানিসারি অফিসারেরা (সাবেক দাস) নিজেরাও স্বজাতি থেকে দাস রিক্রুটমেন্ট অব্যাহত রেখেছে।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝে নেয়া উচিত মুসলিম সভ্যতায় দাসেরা ব্যাপারটাকে

---

[২৭৭] Patterson, 217, 277 সূত্রে Eugene Genovese, "The Treatment of Slaves in Different Counties: Problems in the Applications of the Comparative Method," in Laura Foner and Eugene Genovese (eds.) Slavery in the New World (Prentice Hall, 1969), 203

কীভাবে দেখত। এবার একনজরে যদি সামারাইজ করি দাসপ্রথা বৈধ থাকার পিছনের প্রজ্ঞা—

- যুদ্ধ এড়ানো। Deterrence তৈরি করা, যা অহেতুক প্রাণক্ষয় কমাবে।
- তার দ্বারা ইসলামের ক্ষতি কমানো। আবার যুদ্ধ করার সুযোগ না দেয়া।
- শত্রুকে বন্দি না রেখে একটা সামাজিক স্ট্যাটাস দিয়ে বন্দিকে মূলধারায় এনে প্রোডাক্টিভ বানানো
- ডিটেনশান ক্যাম্প বা প্রিজনে আটকে না রেখে মুক্তভাবে চলাফেরার মানবিক সুযোগ দেওয়া
- যাবজ্জীবন দাসত্বে না রেখে নানান ভাবে তার মুক্তির ব্যবস্থা থাকা।
- বিয়ে করার সুযোগ দেওয়া, শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া, স্বাভাবিক জীবনযাপন নিশ্চিত করা।
- যোগ্যতা কাজে লাগানোর সুযোগ দেয়া। যেমন— শিক্ষক, সেনাপতি, শাসক বানানো।
- মুসলিম পরিবেশে রেখে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা গ্রহণের মাধ্যমে অনন্তকালের জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুযোগ দেয়া।

মানবাধিকার ও আধুনিক দাসপ্রথা

প্রজা ও জমিদারের মাঝে মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী অংশটার উৎপত্তি ষোড়শ শতক থেকে। উপনিবেশের মাধ্যমে ইউরোপের পুঁজি বাড়ছে, ব্যবসাপাতি বাড়ছে। জমিদারেরা ছিল এদের বিকাশে বাধা। কারণ এই বণিকেরা ছিল উৎপাদক প্রজা আর শোষক জমিদারের মাঝখানে, যাদেরকে জমিদারেরা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত, ব্যবসায় বিধিনিষেধ-খাজনাপাতি আরোপ করে [২৭৮]। অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড বলেন :

> “ষোড়শ শতকে এই নতুন শিশু অর্থনীতি (পুঁজিবাদ) থেকে জন্ম নিল নতুন মনোভাব—বাজার-মানসিকতা, যার মূল্যবোধগুলো ভিন্ন ধরনের।... ধর্মের শিক্ষা ছিল, আর্থিকভাবেও প্রত্যেকে অপরের জন্য দায়ী। বিপরীতে নতুন এই মানসিকতায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন অপর সকলের চেয়ে উপরে ওঠা, অপরকে পিছে ফেলা আর টেক্কা দেবার প্রচেষ্টা। ভ্রাতৃভাবের চেয়ে প্রতিযোগিতাই দরকারী মানসিকতা এই নতুন ব্যবস্থাতে।... ব্যবহারের নৈতিকতার চেয়ে সম্পদ সংগ্রহের দ্বারা মানুষ বিচার হতে লাগল।... অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝেই এই নব্য অর্থনৈতিক ধারণা একটা 'সার্বজনীন জীবনধারা'য় পরিণত হয়ে পড়ে। সেক্যুলার ও বস্তুবাদী মূল্যবোধ, যা দ্বারা পশ্চিম ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার মানুষ প্রভাবিত, এই নতুন দর্শনই ছিল তার ভিত্তি। [২৭৯]

সুতরাং জমিদারদের সাথে এদের একটা স্নায়ুযুদ্ধ চলছে। ওদিকে জমিদার-রাজাদেরকে হাওয়া দেয় চার্চ। জমিদার-চার্চ-রাজা এই পুরো সিন্ডিকেটটাই ব্যবসায়ীদের শত্রু। অবশেষে বাটে পাওয়া গেল সিন্ডিকেটকে। যাজকদের অনৈতিকতা, শতাব্দীর পর শতাব্দী ডাইনী-নিধন, বুবোনিক প্লেগ, চার্চ-সমর্থিত সামন্ততন্ত্রের অত্যাচার, ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ ইউরোপে শুরু হল বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন—

---

[২৭৮] অর্থনীতিবিদদের যুগ, ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড।

[২৭৯] ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড, *অর্থনীতিবিদদের যুগ,* পৃষ্ঠা : ১১-১৭।

এনলাইটেনমেন্ট। জমিদারদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে ব্যবসার উপর নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেবার দর্শন দেয়া হতে লাগল: মার্কেন্টাইল অর্থনীতি, ফিজিওক্রাট, এরপর লিবারেল। ব্যবসাপাতির পক্ষে যা যা উপকারী, যেমন: ক্রেতার ভোগের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত মালিকানা, সরকারি হস্তক্ষেপ না থাকা ইত্যাদি আলোচনা এনলাইটেনমেন্ট দর্শনে চলতে থাকল। জন্ম নিল পুঁজিবাদ, মুনাফাই যার লক্ষ্য। উপনিবেশ ও শিল্পবিপ্লবের মওকায় পুঁজির বিকাশে বিকশিত হল এই মধ্যবিত্ত শিল্পপতিরা।

অবশেষে ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবে এদের হাতেই পতন ঘটলো জমিদারতন্ত্রের, এরাই দেশে পত্তন করল গণতন্ত্রের, যাতে নিজেদের ব্যবসার অনুকূলে শাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করা যায়। সেই সাথে নিজেরাও সরাসরি মন্ত্রী ইত্যাদি হবার দ্বারা শাসনে হস্তক্ষেপ করা যায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই এনলাইটেনমেন্ট থেকে আসা মূল্যবোধগুলো এই ব্যবসায়ী শ্রেণীটার পক্ষে কাজ করে। কীভাবে করে—

ক.

আগের ধর্মভিত্তিক নৈতিকতা ভোগকে নিরুৎসাহিত করে, ত্যাগকে উৎসাহিত করে। সুতরাং 'ব্যক্তি'র নতুন সংজ্ঞা দাও: যে নিজের ভালোমন্দ নিজে ঠিক করে সে human, সেই আলোকিত। বাকি সবাই অন্ধকার যুগের মানুষ। এভাবে ধর্মকে হটিয়ে হিউম্যানিজম, ধর্মনিরপেক্ষতা, লিবারেল ইথিক্সকে আনা হল।

খ.

পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য মানুষ ত্যাগ করে, sacrifice করে, যা ভোগকে কমায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আদর্শের দ্বারা তৈরি হবে স্বার্থপর মানুষ, যার ফোকাস হবে শুধু নিজের ভোগ। পরিবারের পিতা সন্তানকে Deterred consumption শেখায়, কম ভোগ করতে শেখায়। যে পরিবারে বাবা থাকে না, সে পরিবারের সন্তানরা হয় compulsive consumer.[২৮০] সুতরাং ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীবাদ প্রভৃতি ব্যবহার করে পরিবার ভেঙে দাও, দুর্বল করে দাও, পরিবার গঠন পিছিয়ে দাও, লিভ-টুগেদার ভিত্তিক ভঙ্গুর পরিবার (fragile family) তৈরি কর। বাপকে সন্তান যেন না পায়, নিজের ভোগ স্যাক্রিফাইস করার মত কেউ যেন না থাকে।

গ.

স্বাধীন মানুষ নিজের ইচ্ছার দাসত্ব করবে। ফলে স্বাধীনতা বৃদ্ধি করবে ভোক্তাসংখ্যা।

---

[২৮০] Aric Rindfleisch et al. (1997). *Family Structure, Materialism And Compulsive Consumption,* Jounal of Consumer Research, vol 23, no.4, pp. 312-325

পরাধীন ব্যক্তির ভোগ সীমিত। নেগেটিভ ফ্রীডমকে প্রোমোট কর, সব বাধা ভেঙে দাও। কেউ কাউকে নিয়ন্ত্রণের অধিকার রাখে না। লিবারেল, সমতা, সমানাধিকার। আগে স্বামী-স্ত্রী মিলে এক গাড়ি কিনত। এখন দু'জনের দুটো গাড়ি, ডাবল ডাবল পণ্য বিক্রি হবে।

ঘ.

সমতা ও এ থেকে উৎসারিত অন্যান্য আইন প্রত্যেকের ভোগের অধিকার নিশ্চিত করবে।

এভাবে এনলাইটেনমেন্টের পুরো কাঠামোটাই পুঁজিবাদের পক্ষে কাজ করবে। **ভোগ বাড়লে ক্রেতা বাড়বে, ক্রেতা বাড়লে পণ্য বেশি বিক্রি হবে, বেশি বিক্রি মানে বেশি মুনাফা— পুঁজিবাদ। যা যা এই ভোগকে নিরুৎসাহিত করে, ভোগের অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় : ধর্ম, পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ— সবকিছুকে ভেঙে অকার্যকর করে দিতে পারলে লাভেই লাভ। আর রাষ্ট্র হবে সর্বশক্তিমান, যা সযত্নে রক্ষা করবে পুঁজিপতিদের অবাধ ব্যবসার স্বার্থ।** এই গল্পটুকু কেন করলাম? এখন বুঝা যাবে।

পশ্চিমারা তো সম্পূর্ণ বিলোপ করেছে

পশ্চিমারা তো আইন করে দাসপ্রথাকে বিলোপ করেছে। বিপরীতে মুসলিম দেশগুলোতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নানান জায়গায় দাসপ্রথা চালু ছিল। সেসব স্থানেও পশ্চিমারাই চাপ দিয়ে বিলুপ্ত করিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমারাই তো বেশি মানবিক তাহলে। চলুন দেখা যাক, দাসপ্রথা বিলোপ করার জন্য, দুই ধাপে পশ্চিমা সভ্যতা এগিয়েছে—

- ১ম পদক্ষেপ ছিল দাস'ব্যবসা' বন্ধ করা'।
- ২য় পদক্ষেপ ছিল, দাস'প্রথা' বিলোপ করা। অর্থাৎ অলরেডি যারা দাস হিসেবে আছে, তাদেরকে মুক্ত করা।

কেন? একেবারে প্রথাটা বিলোপ করে দিলেই তো ব্যবসাও একাই বন্ধ হয়ে যেত। কেন আগে ব্যবসা বন্ধ করে প্রথাটা রাখা হল? চলুন তাহলে ইতিহাস থেকে ঘুরিয়ে আনি।

১ম পদক্ষেপ: দাস'ব্যবসা' বন্ধ করা

১৫০০ সাল থেকে ১৮০০ সাল এই ৩০০ বছর দাসব্যবসা ছিল ইউরোপের অন্যতম লাভের ব্যবসা। Bank of England, Lloyds of London, Barclays Bank এরা সবাই দাসব্যবসার বিনিয়োগকারী। যেমন ধরেন, ব্রিটেনের Royal Africa Company প্রতিটা ট্রিপে ৩৮% লাভ করত ১৬৮০ সালের দিকে, আফ্রিকা থেকে একটা দাস ৩ পাউন্ডে কিনে আমেরিকায় বেচতো ২০ পাউন্ডে। ১৬৩০-১৮০৭ এই সময়ে ব্রিটিশ দাসব্যবসায়ীরা ১২ মিলিয়ন পাউন্ড লাভ করে শুধু দাস বেচে। মুনাফা ১৮০০ সালের ঠিক আগে আগে ১০% এ নেমে আসে। কিন্তু এই ১০%-ও কম না। কম না এই কারণে যে, ৭০% দাস নিযুক্ত হত ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে চিনিশিল্পে, আর চিনিশিল্পে প্রচুর শ্রম লাগে, যা পুরোটাই ছিল দাস নির্ভর। ১৭৬০ সালে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ-টু-ইংল্যান্ড (ফ্রান্স-স্পেন-পর্তুগাল-ডেনমার্ক-হল্যান্ড বাদে) রপ্তানি ছিল ৩ মিলিয়ন পাউন্ড (আজকের ২৫০ মিলিয়ন), যা পুরোটাই দাসদের উৎপাদন। কলোনিগুলো থেকে যা রপ্তানি হত, তার ৭৫% ছিল দাসশ্রম। কিন্তু ... কী হলো এরপর?

- ১৮০৩ সালে ডেনমার্ক দাস'ব্যবসা'কে অবৈধ করে।
- ১৮০৭-০৮ এ আমেরিকা ও বৃটেন নিজ দেশে দাস আমদানিকে অপরাধ সাব্যস্ত করে।
- ডাচরা ১৮১৪ সালে
- পর্তুগাল, স্পেন ও ফ্রান্স ১৮২০ এর মধ্যে

সালগুলো লক্ষ্য করুন। ৩০০ বছর ধরে চলা আমেরিকা-ইউরোপের অন্যতম লাভের ব্যবসাটা ১৭ বছরের মধ্যে তারা গুটিয়ে দিয়েছে। এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। হঠাৎ ১৮০০ এর পর কেন ধুমধাড়াক্কা বিলোপ করে দেয়া হল? যেসব দেশ দাসব্যবসা থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হত, তারা সবাই উনিশ শতকের প্রথম ২০ বছরেই কেন ব্যবসা বন্ধ করে দিল? কী এমন ঘটল যে, পুরোপুরি দাসপ্রথা-নির্ভর অর্থনীতি যাদের তারাই হঠাৎ করে দাসপ্রথাবিরোধী (abolitionist) হয়ে গেল? চলুন দেখা যাক, পণ্ডিতরা কী বলেন।

প্রথমত : দাসব্যবসা আর লাভজনক ছিল না

- ১৭৬০ এর পরে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব হয়। নিত্যনতুন মেশিন আবিষ্কারের ফলে

প্রচুর শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে। যন্ত্রের বিকাশের দরুন মার্কেটে নতুন দাসের প্রয়োজন কমে আসে, মানবশ্রমের দরকার হ্রাস পায়। আমরা দেখেছি দাসব্যবসায় লাভ ৩৮% থেকে ১০%-এ নেমে এসেছে। ব্যাংকগুলো দাসব্যবসার চেয়ে এখন শিল্প কারখানায় বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী। এজন্যই দেখেন দাসপ্রথা বিলোপের যত আওয়াজ সব ১৭৬০ এর পর, এর আগে সারা দুনিয়ায় কোনো আওয়াজ নেই।

- যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদিত এই প্রচুর পণ্য (মূলত পোশাক) দুনিয়ার নানান জাতির কাছে বিক্রি করে (সেসময় ডলার নেই) বিনিময়ে সেসব জায়গা থেকে কাঁচামাল আনা হতো (চিনি, চাল, তুলা)। ফলে ব্রিটেনের ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান চিনি পড়ে থাকে গুদামে, চিনিখেতগুলো দেউলিয়া হবার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। ১৭৯৯-১৮০৭ এই ৮ বছরে জ্যামাইকাতে বন্ধ হয়ে যায় ৬৫টা খেত, দেনায় নিলামে ওঠে ৩২টা। ১৮০৬ সালে ৬ হাজার টন চিনি অতিরিক্ত উৎপাদন হয়েছিল। কী করলে উৎপাদন কমানো যায়? দাসব্যবসা বন্ধ করে দাও। কলোনিগুলোয় নতুন করে যেন আর দাস যেতে না পারে।

- উঠতি শিল্পপতি সমাজ এবং পুরনো জমিদার সমাজ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। জমিদার সমাজ ছিল এই দাসব্যবসার মূল বিনিয়োগকারী এবং দাস দ্বারা কৃষির (plantation sector) মাধ্যমে লাভবান। যেমন The Royal Adventurers কোম্পানির মাথাদের মধ্যে ছিল ২ জন আল্ডারম্যান, ৩ জন ডিউক, ৮ জন আর্ল, ৭ জন লর্ড, ১ জন কাউন্টেস, ২৭ জন নাইট [২৮১]। দাসকোম্পানিগুলোর নাম দেখেন : The Royal Adventurers, The Royal African Company ... নাম দেখেই বুঝা যাচ্ছে এখানে রাজপরিবারের বা তাদের সমর্থনপুষ্টদের পৃষ্ঠপোষকতা বা বিনিয়োগ রয়েছে। মানে দাসব্যবসা জমিদারদের, শিল্প কারখানা পুঁজিপতিদের।

  – ফলে জমিদারদের শক্তি নিঃশেষ করতে দাসব্যবসা বন্ধ করে দাসপ্রথা বিলোপ করা প্রয়োজন ছিল, ওদিকে শিল্পপতিদের দাসের দরকার নেই, তাদের আছে যন্ত্র।

  – শিল্প প্রোডাক্ট বিক্রি করে আনতে হচ্ছে চিনি, আবার ওদিকে দাসদের দিয়ে উৎপাদন করানো হচ্ছে চিনি, ফলে শিল্পপণ্য বিক্রি ব্যাহত হচ্ছে।

  – আফ্রিকাতে পণ্য বিক্রির জন্য স্বাধীন ক্রেতা চাই। তাদেরকে দাস বানিয়ে নিয়ে

[২৮১] এগুলো অভিজাত পরিবার, সামন্ত ও জমিদারদের নানান পদ-পদবী. মর্যাদার ক্রমধারা রাফলি এমন– duke/duchess > marquess/marchioness > earl/countess > viscount/viscountess > baron/baroness. BRETTE WARSHAW (SEP 17, 2019) What's the Difference.

যাওয়াটা জমিদারদের জন্য লাভ হলেও, ব্যবসায়ীদের লোকসান। সবদিক দিয়েই দাসপ্রথা শিল্পপতিদের জন্য লোকসান।

ওদিকে ১৭৮৯-এ ফ্রান্সে জমিদারদের উৎখাত করা হয়ে গেছে, ব্রিটেনও উদ্দীপ্ত।

- ওয়েস্ট ইন্ডিয়া ছাড়াও বিশ্বের নানা জায়গায় ততদিনে ব্রিটেনের উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। সেসব জায়গার উৎপাদনের সাথে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার উৎপাদন প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার ব্যবসাগুলোর কর্ণধার জমিদারেরা, আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্ণধার হল ব্যবসায়ীরা। দাসপ্রথার পক্ষেবিপক্ষে কারা ছিল একটু দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

দাসপ্রথার পক্ষে	দাসপ্রথার বিপক্ষে
রাজা ৩য় জর্জ রাজা ৪র্থ উইলিয়াম চার্চ তৎকালীন প্রধান মানবাধিকার কর্মীরা ➡ John Cay ➡ Bryan Blundell ➡ Foster Cunliffe ➡ মেয়র Thomas Leyland ➡ Heywood পরিবার ➡ Tarlton পরিবার	■ Thornton পরিবার (ইস্ট ইন্ডিয়া স্টকের মালিক) ■ Zachary Macaulay (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার) ■ James Cropper (ইস্ট ইন্ডিয়ার চিনির প্রধান আমদানিকারক) ■ Thomas Whitmore (পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি)

দ্বিতীয়ত : অন্য কিছু বেশি লাভজনক ছিল

- ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে ওঠা শিল্প-কারখানাগুলোয় উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য আফ্রিকার বাজারও প্রয়োজন, যে প্রয়োজনটা আগে ছিল না। সব কর্মক্ষম আফ্রিকানকে ধরে নিয়ে এলে পণ্য কিনবে কে? [২৮২]

- নতুন অর্থনীতিতে (পুঁজিবাদ) দাসপ্রথার চেয়ে waged labour বা বেতনভুক্ত শ্রমিক বেশি লাভের ঠেকল ইউরোপের কাছে। কেননা দাস তো স্বাধীন ভোক্তা না। বরং বেতনভুক্ত শ্রমিক নিজেই ভোক্তা। আধুনিক অর্থনীতির জনক Adam Smith-এর মতে, যে ব্যক্তি সম্পত্তি অর্জন করতে পারে না, তার প্রবণতাই থাকে

---

[২৮২] Trevor Getz. Why Was Slavery Abolished?: Three Theories. Khan Academy

: খাবে বেশি, শ্রম দেবে কম। বেশি শ্রম সে কেন দেবে? তার তো লাভ নেই বেশি কষ্ট করে। সুতরাং দাসের চেয়ে স্বাধীন ভাড়াটে শ্রমিক বেশি economically superior. দাসের পিছনে যা খর্চা হত, সেটাই বেতনাকারে দেয়া হবে। শ্রমিক ওভারটাইম করে ভোগের চেষ্টা করবে। কাজও পাওয়া গেল বেশি, ভোক্তার মার্কেটও বড় হল।

সুতরাং উপনিবেশীদের নতুন অর্থনীতির জন্য দাসপ্রথা ছিল একটা লস-প্রোজেক্ট। সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের জন্যও তাদের শক্তির উৎস ধ্বংস করা দরকার ছিল, কেননা এখন শিল্পপতিদের শাসন শুরু হবে, যার নাম গণতন্ত্র। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে যার সূচনা হয়ে গেছে ফ্রান্সে। যার কারণে উনিশ শতকের নতুন অর্থনীতি, নতুন রাজনীতি এবং নতুন সমাজের জন্য দাসপ্রথার আর প্রয়োজন নেই। ১৭৯২ সালেই ফ্রান্স দাসপ্রথা বিলোপ করে দেয়।

২য় পদক্ষেপ: দাসপ্রথা বিলোপ

নিজদেশে নতুন দাস আমদানি বন্ধ করেছে অনেকেই। কিন্তু যেখানে মূল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলছে, কাঁচামাল উৎপাদন চলছে, সেই উপনিবেশে দাসপ্রথা চালু রেখেছে। যতখানি স্বার্থ, ততটুকুতে ছাড় নেই।

- ১ম দাসপ্রথা বিলোপ করে ফ্রান্স ১৭৯২-এ
- ১৭৯১ সালে হাইতিতে দাসবিদ্রোহ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হয়, সফল বিদ্রোহে হাইতি স্বাধীন হয়। দাসপ্রথা বিলোপ হয় ১৮০৪ সালে।
- কিউবাতে ১৮২৩ সালে।
- মেক্সিকোতে ১৮২৯ সালে।
- ১৮৩৩ সালে বৃটেনে আইন হয়।
- ১৮৬৫ সালে আমেরিকায় আইন হয়।

১৭৭৬ সালে আমেরিকা ব্রিটেন থেকে স্বাধীন হয়ে যায়। আমেরিকার পতাকাতলে কিউবা ও অন্যান্য চিনি উৎপাদকেরা ইউরোপের বাজার দখল করতে থাকে। ২৫% অতিরিক্ত ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান চিনি ইউরোপের বাজারে বেচতে হবে, প্রতিযোগিতায় নেমেছে সস্তা ব্রাজিলিয়ান ও কিউবান চিনি। ১৮২৪-১৮২৯ এর মধ্যে জার্মানি,

প্রুশিয়া, রাশিয়ার বাজার ব্রিটিশের হাতছাড়া। ১৮০৭-এর অতি-উৎপাদনের সমাধান ছিল দাসব্যবসা থামানো, আর এবারের ১৮৩৩ এর অতি-উৎপাদনের সমাধান দাঁড়ালো দাসমুক্তি। ত্রিনিদাদের জাতির পিতা ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী Eric Williams-এর *Capitalism and Slavery* বই থেকে আলোচনা করলাম এতক্ষণ। উনার মন্তব্য হল :

> “ নিগ্রো দাসশ্রম ও দাসব্যবসা সেই পুঁজিটা তৈরি করে দিয়েছে যা নির্মাণ করেছে শিল্পবিপ্লবকে। আবার ম্যাচিউরড শিল্প পুঁজিই (mature industrial capitalism) দাসপ্রথাকে ধ্বংস করেছে। যখন ব্রিটিশ পুঁজিবাদ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার উৎপাদনে নির্ভর করত, তখন তারা দাসপ্রথার পক্ষে দাঁড়িয়েছে, দাসব্যবসায় বিনিয়োগ করেছে; যখন তারা দেখল ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার একক রাজত্ব (monopoly) একটা সমস্যা, তখন সেই রাজত্ব ভাঙতে তারাই প্রথমে সেই দাসপ্রথাকে ভেঙেছে।

ব্যাপারটা ইউরোপের মহীয়ান গরীয়ান কোন নৈতিক পদক্ষেপ, তা নয়। এখনো ইউরোপ যেখানে তার নিজের প্রয়োজন, যতটুকু প্রয়োজন সেখানে ততটুকু দাসপ্রথা টিকিয়ে রেখেছে। সামনে আলোচনা আসছে।

নৈতিক কারণে দাসপ্রথার বিলোপ ঘটেছে বলা হয়। এবোলিশনিস্টদের (দাসপ্রথাবিরোধী) অনেকে ইভ্যানজেলিস্ট (প্রচারবাদী) খৃস্টান ছিল, তা সত্য। তারা প্রচার করেন, দাসপ্রথাকে পাপ হিসেবে, বাইবেল-বিরোধী কাজ হিসেবে। কিন্তু এই বাইবেল দিয়েই এতোদিন দাসপ্রথাকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। নূহ আ. এর অভিশপ্ত কৃষ্ণবর্ণ পুত্র 'হাম'-এর বংশধরদেরকে দাস বানানোর যৌক্তিকতা খৃষ্টবাদী নৈতিকতায় বৈধতা পেয়ে এসেছে এতোদিন। ১৮০০-এর আগেপরে কি এমন হল যে, বদলে গেল নৈতিকতা? এনলাইটেনমেন্ট থেকে আসা নতুন অর্থকেন্দ্রিক নৈতিকতাই এজন্য দায়ী। দাসত্বের এই বর্ণভিত্তিক (racism) ধারণার সাথেও ইসলামের সম্পর্ক নেই, নতুন পুঁজিবাদী নৈতিকতার সাথেও ইসলামের সম্পর্ক নেই। বলা যায়, নতুন অর্থকাঠামোয় ভোক্তা বাড়িয়ে বাজার বড় করবার যে ধারণা তা বাস্তবায়নেই নতুন নৈতিকতাকে ব্যবহার করা হয়েছে, খৃষ্টবাদী নতুন ব্যাখ্যা এনে।

- স্পেন আইন করেছে ১৮২০ এর আগে ঠিকই, কিন্তু প্রয়োগ করেছে ১৮৬৭ সালে। কিন্তু তখন থেকে ১৮৬৭ সাল অব্দি কিউবাতে দাস গেছে ৪,৯৯,৫৮০ জন।[২৮৩] এই হচ্ছে দাসপ্রথা বিলোপের হাকীকত। আইন করার পরও ৪৭ বছর।

[২৮৩] On the slave trade to Cuba, see BERGAD, Laird W., Fe Iglesias García, and María del Carmen Barcia. The Cuban Slave Market, 1790-1880. New York: Cambridge University Press, 1995.

- পর্তুগাল আইন করেছে ১৮২০ এর আগে। ১৮৩১ সালে ব্রাজিলে দাস আমদানি নিষিদ্ধ করেছে, কিন্তু তার পরে আরও ৪,৮০,০০০ দাস এনেছে ব্রাজিলের ভূমিতে। ১৮৮৮ পর্যন্ত দাসব্যবসা চলেছিল এখানে। আইন করার পরও ৬৮ বছর। [২৮৪]

- ১৮৩৩ সালে ব্রিটেনে slavery abolishing act পাশ করা হয়। তবে এর শর্ত ছিল— যেসকল দেশ ইস্ট ইন্ডিয়া 'কোম্পানি'র অধীনে ছিল, সরাসরি বৃটিশ সরকারের অধীনে না, সেসকল দেশ ব্যতীত। মানে যেসব দেশ থেকে বৃটেনের কাঁচামাল আসে, সম্পদ আসে, সেখানে তারা দাসপ্রথা চালু রাখবে, শোষণ-নির্যাতন করবে। হাস্যকর আইন না? ১৭৫৭ সালে পলাশীর পরাজয়ের পর থেকে কাঁচামালসহ সম্পদ তো ভারত থেকে ব্রিটেনে যাওয়া শুরু করেছে। তাদের দেশে তো দাসপ্রথার দরকার নাই, দরকার তো ভারতে। [২৮৫]

- এমনকি ১৮৩৩ সালে দাসপ্রথা বিলোপ আইনের পরও ব্রিটিশরা হাভানা ও রিও-ডি-জেনিরোতে বেড়ী-শিকল রপ্তানি করেছে। বলেন, তামাশা না এগুলো?

এজন্যই একটু আগে বললাম— কাজীর গরু খাতাতেই ছিল, গোয়ালে ছিলো না শুরু থেকেই। এখনও নেই।

এরপর কী হল?

১৮৩৩ সালের আইনে দাসপ্রথা তো বিলোপ হল, এবার কিন্তু দাস দিয়ে যা হতো, তা এখন হবে কী দিয়ে। দাস থেকে যে সস্তা শ্রম পাওয়া যেত, তা পাওয়া যাবে কীভাবে? আখ খামারমালিকদের তো মাথায় হাত, তাদের লাগবে একটা লাগাতার সস্তা ও বাধ্যশ্রম। চীন ও ইন্ডিয়া থেকে জনশক্তি আমদানি শুরু হল, এটা ছিল বাধ্যশ্রমের একটা নতুন সিস্টেম, যা বহুদিক থেকেই দাসপ্রথার হুবহু। পুরো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জুড়েই আগের আফ্রিকান দাসদের রিপ্লেস করলো ভারতীয়রা, একটা চুক্তিভিত্তিক শ্রমনীতির অধীনে— ফিজি, নাটাল, বার্মা,শ্রীলঙ্কা, মালয়, ব্রিটিশ গায়ানা, জ্যামাইকা ও ত্রিনিদাদে [২৮৬]।

---

[২৮৪] For estimates, see the Transatlantic Slave Trade Database: Voyages, www.slavevoyages.org.

[২৮৫] William Digby, 'Prosperous' British India. 1901

[২৮৬] A New System of Slavery? [nationalarchives.gov.uk]

তারা আগের আফ্রিকান দাসদের মতই আচরণ পেত, এস্টেটের বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। বেতন ছিল নামেমাত্র— দিনে এক শিলিং (১ পাউন্ডের ১/২০)। যেকোনো মাত্রার চুক্তিভঙ্গ হলেই অটোমেটিক ২ মাসের জেল বা ৫ পাউন্ড জরিমানা (১০০ দিনের বেতন)। ১৮৩৮ সালে একজন ম্যাজিস্ট্রেট Charles Anderson উপনিবেশমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন: 'কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের সাথে (ভারতীয়) মারাত্মক অন্যায় আচরণ করা হয়, সাধ্যাতীত পরিশ্রম করানো হয়, চাবুক মেরে শাস্তি দেয়া হয়'। ক্ষেতমালিকরা এত কঠোর আচরণ করত যে, ঐতিহাসিক Hugh Tinker জানান: 'ইমিগ্রান্টদের পচাগলা দেহ প্রায়ই পাওয়া যেত আখক্ষেতের মাঝে'। শ্রমিকেরা কাজ করতে না পারলে তাদের বেতন বা খাবার কিছুই দেয়া হত না। এসব কারণে ১৮৪০ সালে ভারত থেকে শ্রমিক আসা স্থগিত করা হয়। [২৮৭]

ভারত থেকে আসা স্থগিত হয়ে গেলে, এরপর প্রথমে ইউরোপীয়ানদের আনা হয়, চাইনিজদের আনা হয়, আফ্রিকানদের আনা হয়। ১৮৪৩ সালে আবারও ভারতীয়দের আনার প্রক্রিয়া চালু করা হয়। এই দফা তাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসার মৌলিক ব্যবস্থা রেখেই নীতিমালা করা হয়।

বিগত ৭০০ বছরে যে ভারতে মাত্র ১৭ বার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, সেই ভারতে ১৭৭০-১৮৫০ এর মাঝে ৮০ বছরের ভিতরে অলরেডি ১২ বার দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে, না খেয়ে মারা গেছে ৬০ লাখ মানুষ [২৮৮] । অর্থাৎ গত ১০০ বছরের লুটপাট ও 'আইন করে অর্থনৈতিক শোষণের' ফলে ইতিমধ্যেই ভারতে চমৎকার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যাতে মানুষ যে কোনো শর্তে শ্রম দিতে রাজি। এই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে ব্রিটিশের নিযুক্ত শ্রম-এজেন্টরা। নীলচাষ নিয়ে আমরা সামনে আলাপ করব। মূলত বিহার-আউধরাজ্য-দিল্লি থেকে প্রচুর নীলচাষী অমৌসুমে শহরে আসত কাজের জন্য। তারাই ছিল এই নব্য দাসপ্রথার মূল টার্গেট। শিল্প ধ্বংস হয়েছে বলে প্রচুর তাঁতী এমনকি রন্ধনশিল্পী-নর্তক-গায়ক-লেখক-পুরোহিত পর্যন্ত শ্রমিক হিসেবে গেছে। ১৯১৭ সালে যখন এই অভিবাসন বন্ধ হয়, তার আগে ২৫ লক্ষ ভারতীয় গেছে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোয়। জানি না, এদেরকে আপনারা দাস বলবেন কি না।

---

[২৮৭] প্রাগুক্ত
[২৮৮] William Digby, Prosperous British India

নিজ দেশে দাস

এতোক্ষণ আপনারা দাসপ্রথার একটা ধরন দেখেছেন, যেখানে জন্মভূমি থেকে মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয় আরেক দেশে। **আরেক ধরনের দাসপ্রথা ছিল আফ্রিকা ও ভারতীয় উপমহাদেশের উপনিবেশগুলোতে। যেখানে ইউরোপীয়রা নেটিভদেরকে দাস বানিয়েছিল নিজেদের মাতৃভূমিতেই, কোন অপহরণ নেই এখানে।**

এই রকমের দাসপ্রথার প্রচলন ছিল ব্রিটিশ ভারতে, বেলজিয়ামের উপনিবেশ কঙ্গো, ফরাসি উপনিবেশগুলোসহ অধিকাংশ উপনিবেশগুলোতে। একটা ছবি আছে দেখুন যেটাতে এক অসহায় বাবা বসে আছে আর তার সামনে তার বাচ্চার কাটা হাত, আর কাটা পা রয়েছে। কঙ্গোর সেই পিতা যথেষ্ট পরিমাণ কোকো উৎপাদন না করতে পারায় তার সোনামনির হাত-পা কেটে দেওয়া হয়েছে। তারই নীচে আরও শিশুদের ছবি দেখুন যাদের হাত কাটা।
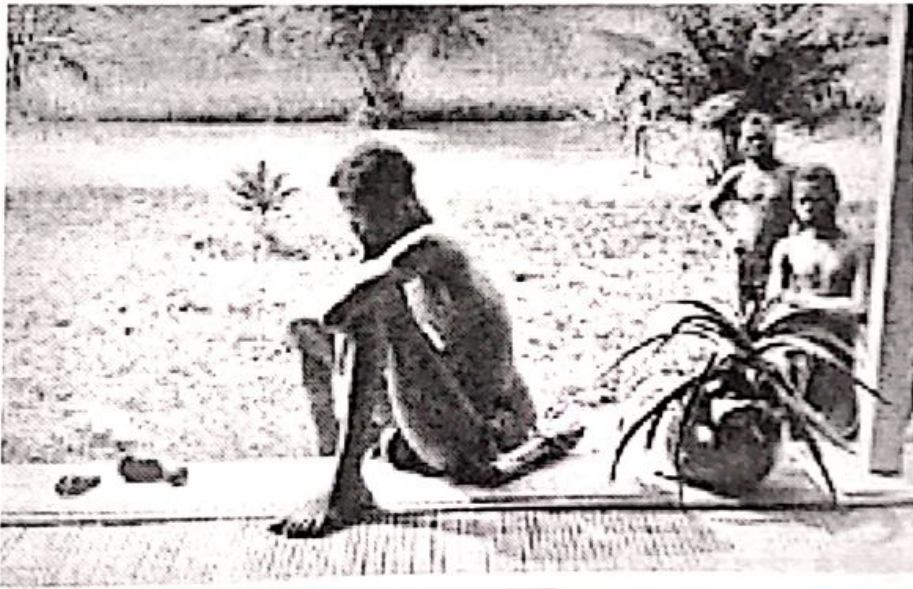
১৮৮৫ সালে 'বার্লিন কনফারেন্স'-এ ইউরোপীয় দেশগুলো আফ্রিকাকে নিজেদের মাঝে ভাগ করে নেয় ম্যাপ দাগিয়ে, এজন্যই আফ্রিকার দেশগুলোর সীমানা আপনি দেখবেন সরলরৈখিক। যেন কেউ কেকের স্লাইস কেটে নিয়েছে। ১৮৮৫-১৯০৮ পর্যন্ত কঙ্গো ছিল বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ডের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ১৯০৮ সালে একে

পার্লামেন্টের অধীনে এনে 'বেলজিয়ান উপনিবেশ' এর মর্যাদা (?) দেয়া হয়।

জাঞ্জিবার ও পশ্চিম আফ্রিকা থেকে কিশোরদের দাস হিসেবে এনে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে গড়ে তোলা হয় লিওপোল্ডের ব্যক্তিগত বাহিনী Force Publique, অফিসার ছিল সাদারা। তাদের কাজ ছিল চাষীরা রাবার উৎপাদন কোটা পূরণ করছে কি না তা নজরদারি করা, না পারলে টর্চার করা, বাচ্চাদের হাত কেটে দেয়া, প্রতিবাদীদের হত্যা করা, গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া, নেটিভদের চাবকানো ও ধর্ষণ। নিজ কোটার রাবার উৎপাদন করতে না পারার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। হত্যার পর নিহতের কাটা হাত নিয়ে রিপোর্ট করতে হত সৈন্যদের। ফলে এমন সিস্টেম দাঁড়িয়ে গেল, হয় কোটা পূরণ করো (যা ছিল অসম্ভব), নয়তো কাটা হাত জোগাড় কর, যাতে সেনারা নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারে। ফলে গ্রামে গ্রামেও লড়াই-হানহানি-হাত কাটাকাটি লেগে থাকত। এই সময়কালে মহামারি-গণহত্যা-অপুষ্টিতে প্রায় ১ কোটি কঙ্গোলিজ নিহত হয়। দেখুন এই ব্যবস্থাটাও একধরনের দাসপ্রথা; **নিজ দেশে নিজ বাড়িতে থেকেও এরা শ্রমদাস। এই চিত্র আফ্রিকা-এশিয়ার সব ইউরোপীয় কলোনিতে পাওয়া যায়।**

বাংলায়ও নীলকরদের দাদন-প্রথা, নীলকুঠিতে অত্যাচারের ইতিহাস, ব্রিটিশ মালিকানাধীন কারখানাগুলোতে বাধ্যশ্রম ইত্যাদিও এই দ্বিতীয় ক্যাটাগরির দাসপ্রথার চিত্র। **ট্রান্স-আটলান্টিক দাসব্যবসায় দাসকে গাঁটের পয়সা খর্চা করে নিয়ে যাওয়া হত আমেরিকায়, কমপক্ষে গরু-ছাগলের মর্যাদাটুকু ছিল; একটা দাস মরলে মালিকের লস বই লাভ ছিল না। কিন্তু নিজ দেশে দাস বানালে সেই মর্যাদাটুকুও নেই। অত্যাচারে মরে গেলেও লস নেই, আরও কত আছে...**

বস্ত্রশিল্পে দাসত্ব

শিল্পবিপ্লবের আগের প্রাক-শিল্পবিপ্লব সময়ে (Proto-industrialization) ভারতবর্ষ ছিল সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ। এর বিবরণ পাওয়া যায় ফ্রান্সিস বুকাননের ভ্রমণকাহিনীতে। সেসময় ভারত সারা দুনিয়ায় কী কী রপ্তানি করতো, তা তুলে ধরেছেন তিনি। মসলিন-সিল্ক-কিংখাব-প্রিন্টের কাপড়, এমব্রয়ডারি, পাটের গালিচা, তামা-পিতলের পাত্র, গহনা, লেদার প্রোডাক্ট, অস্ত্রপাতি, পারফিউম, হাতির দাঁতের কারুকাজ, কাগজ যেত ইউরোপ-আমেরিকায়। [২৮৯] সুলতান আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ফ্রাসোয়াঁ বার্নিয়ের একটি চিঠি লেখেন ফ্রান্সের অর্থসচিব মঁশিয়ে

---

[২৮৯] *A journey from Madras through the countries of Mysore, Kanara and Malabar,* Francis Buchanan MD, Fellow of Royal Society.

কলবার্টকে। তাতে তিনি মুঘল আমলে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লেখেন:

> "হিন্দুস্তান প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। সোনা-রূপা পৃথিবীর অন্য সব জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে এসে পৌঁছোয়। এবং হিন্দুস্থানের গুপ্ত-গহবরে অন্তর্ধান হয়ে যায়। ... এর কারণ হল, হিন্দুস্তানের বণিকরা সোনা দিয়ে দাম শোধ না করে, পণ্য দিয়েই দাম দিত। আর পণ্যের পসরা নিয়ে দেশ-বিদেশে গেলে, সেই জাহাজেই তাল তাল সোনা বোঝাই করে ফেরত আসত। [২৯০]

সম্রাট আওরঙ্গজেব (রহ.) এর সময়ে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে চীনকে পিছনে ফেলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনীতিতে (World's Largest Economy) পরিণত হয়, যার মূল্যমান ছিল প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলার। এর জিডিপি ছিল সে সময়ের সমগ্র বিশ্বের ৪ ভাগের ১ ভাগ। [২৯১] সেই দেশটা ঠিক কী প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে গেলে ১৭৬৯-১৮০০ এর মাঝে ৭ দফা এমন দেশে দুর্ভিক্ষ হতে পারে? ঠিক কী প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে গেলে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশে ১৮০১-১৯০০ পর্যন্ত ১০০ বছরে ৩১ টা মন্বন্তরে মরে যায় ৪ কোটি ১০ লাখ মানুষ—'না খেয়ে' [২৯২] সেটা আশা করি বলে বুঝাতে হবে না। কীভাবে এই উপমহাদেশের শিল্পকে ধ্বংস করা হল, সেটাই আমাদের আলাপ।

শিল্পবিপ্লবের আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের নানান জায়গায় তৈরি করে কাপড়ের ফ্যাক্টরি। উপমহাদেশের সমৃদ্ধ বস্ত্রশিল্প ছিল ইংল্যান্ডের তাঁতিদের চক্ষুশূল। ওদিকে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছে, যন্ত্রচালিত কারখানার নিম্নমানের কাপড় বিক্রির বাজার সৃষ্টি করার জন্য ভারতের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস করে দেবার বিকল্প নেই। ১৭ মার্চ ১৭৬৯ এর এক আদেশবলে কোম্পানি তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে: কাঁচা রেশম উৎপাদন বাড়াতে হবে, রেশমবস্ত্র উৎপাদন কমাতে হবে। ঘরে উৎপাদন করতে দেয়া যাবে না, বলপ্রয়োগে রেশমশিল্পীদের 'কোম্পানির ফ্যাক্টরি'-তে এসে কাজ করতে বাধ্য করা হবে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই আদেশের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। বলা হয় [২৯৩]:

> "এই আদেশ একটি নিখুঁত পলিসি-প্ল্যান— একই সাথে বাধ্য করা এবং উৎসাহিত করা। **ফলে বাংলার শিল্পকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ধ্বংস করবে। এর ফলে**

---

[২৯০] বাদশাহী আমল, বিনয় ঘোষ, পৃ: ৬৯-৭১

[২৯১] *The World Economy*, Angus Maddison, OECD Publishing (2003), page: 261

[২৯২] 'Prosperous' British India, Sir William Digby, 1901

[২৯৩] Ninth Report of the Houseof Commons Select Committee on Ad. ministration of Justice in India, ১৭৮৩, আর্টিকেল ৯১-৯২-৯৩.

ঐ শিল্পোন্নত দেশটির চেহারাই পাল্টে যাবে, বরং গ্রেটব্রিটেনের শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামালের এক ময়দানে পরিণত করাই উদ্দেশ্য।

নিজ ঘরে রেশমশিল্পীরা যেন কাজ করতে না পারে, কোম্পানির স্বার্থে কেবল যেন কোম্পানির ফ্যাক্টরিতেই কাজ করে, এজন্য সরকারি ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হওয়া চাই। পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর শাস্তির দ্বারা সরকারি ক্ষমতাবলে এটা করা হোক তারা চায় (কোম্পানি)।

কারিগরদের বেতনের লোভ দেখিয়ে ফিরিয়ে রাখা হবে তাঁত থেকে, যাতে আমাদের জন্য কাঁচামাল রয়ে যায়। তাদেরকে আমাদের কারখানায় আটকে দেয়া (locked up) হবে। তাদের যে পণ্য আগে বিকাশলাভ করেছিল, উচ্চমূল্য করে দিয়ে, তা ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ করে দেয়া হবে গ্রেটব্রিটেনের ক্ষমতাবলে।

এইসব বিধিনিষেধ আর উৎসাহের দ্বারাই বাংলায় আমাদের চাওয়া পূর্ণ হবে। শ্রমকে শিল্প থেকে কাঁচামালের দিকে ঘুরিয়ে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। এই পলিসির ফলে কাঁচা রেশমের উৎপাদন ব্যাপক বেড়েছে।

ব্রিটিশ ব্যবসায়ী William Bolts তাঁর *Considerations on India Affairs* পত্র সংকলনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভয়াবহ লুটপাটের খতিয়ান তুলে এনেছেন। তিনি লেখেন:

> " কোম্পানি স্থানীয় গোমস্তাদের নিয়োগ দিত। আর গোমস্তারা নিয়োগ দিত দালাল। গোমস্তারা গরিব তাঁতিদেরকে কিছু অগ্রিম টাকার বিনিময়ে চুক্তি করতে বাধ্য করতো। তাদের ইচ্ছেমত রেটে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি। তাঁতিরা চুক্তি করতে না চাইলে বেঁধে রাখা হত, চাবুকপেটা করা হত।
>
> এই সেক্টরে ডাকাতির নজির অকল্পনীয়। গোমস্তাদের রেজিস্টারে তাঁতিদের তালিকা থাকত, তারা ঐ গোমস্তা ছাড়া অন্য কারো কাছে মাল বিক্রি করতে পারত না। গোমস্তাদের একপ্রকার দাসের মত। স্থানীয় বাজারে যে রেট তার চেয়ে ১৫-৪০% কম দামে তাঁতিদেরকে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করা হত। তাঁতিরা চেষ্টা করত গোপনে ডাচ-ফরাসিদের কাছে বিক্রি করার, এজন্য তাদের উপর সবসময় নজরদারি করা হত। (পৃ.১৯৩)

পুরো দেশজুড়ে শিল্পশ্রমিকদের উপর হেন অত্যাচার নেই , যা করা হত না। অত্যাচারের পরিমাণ বাড়তেই থাকত, বিশেষ করে তাঁতীদের উপর। তাঁতী, দালাল ও পাইকারদেরকে উৎপাদন-সংগ্রহের কোটা পূরণ না হবার জন্য গ্রেপ্তার, জেল, মোটা জরিমানা, চাবুকপেটা এবং নিজ ভূমি থেকে বহিষ্কার করা হত। কম উৎপাদন করলে তাঁতিদের পণ্য ছিনিয়ে নেয়া হত দাম ছাড়াই। কাঁচা রেশমশিল্পীদের উপরও

> এরকম অত্যাচার হত। এমন ঘটনাও জানা গেছে, **এই বাধ্যশ্রম থেকে বাঁচতে তাঁতিরা নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুলিই কেটে ফেলেছে।** লর্ড ক্লাইভের সময় তো আর্মেনীয় বণিকদের কারখানা গুঁড়িয়ে দিয়ে রেশমচাষীদের জোর করে ইংরেজ কারখানায় আনা হয়েছে। (পৃ. ১৯৪) [২৯৪]

দাস ধরে নিজের দেশে বা অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে কাজ করানোর তো দরকার নেই। এখানেই কাঁচামাল, এখানেই দাস পাওয়া যাচ্ছে। যাদেরকে পিটিয়ে, শারীরিক-মানসিক টর্চার করে কাজ করিয়ে নেয়া যাচ্ছে।

নীলচাষে দাসত্ব

শিল্পবিপ্লবের পর ব্রিটেনে চলে যায় বস্ত্রশিল্প। মেশিনে প্রচুর উৎপাদন হতে থাকে কাপড়। সেই প্রচুর কাপড়ের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর পরিমাণ নীল। তখনো কেমিক্যাল নীল আবিষ্কার হয়নি। ব্রিটিশ নীলকরেরা নীলচাষে বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করে। নদীয়া, যশোর, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি জেলায় নীলচাষ শুরু হয়। সেসময় এটা ছিল বিরাট লাভের ব্যবসা। ১৮২০-১৮২৭ এর মাঝে কেবল কোম্পানিরই লাভ হয়েছিল সাড়ে ৩ লাখ পাউণ্ড, মানে সেসময়কারই ৪৫ লাখ টাকা। [২৯৫] এটা তো কেবল সেই লাভ যা কোম্পানি দেখিয়েছিল পার্লামেন্টে, বাস্তবে লাভ ছিল কমপক্ষে এর দ্বিগুণ। আর 'প্রাইভেট মার্চেন্ট'দের লাভ তো আরও বেশি, এমনকি অনেক নেটিভ জমিদারও নীলকর বনে গিয়েছিল।

১৮৪৭ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ববাজারে নীলের দাম প্রায় দ্বিগুণ বাড়লেও কৃষক ন্যায্যমূল্য পেতো না। কারণ তাদের একচেটিয়া ক্রেতা ছিল নীলকর ইংরেজ। অন্য যে কোনো ফসলের তুলনায় চাষীদের ৭ টাকা লস হতো সেসময়কার হিসেবে। [২৯৬] নীলকররা কৃষকদের উৎকৃষ্ট জমিতে **নীল বুনতে বাধ্য করত।** নীল ছাড়া অন্য কোনো শস্য উৎপাদন করতে দিত না। দাদনের টাকা নেওয়ার সময় শর্তসাপেক্ষে চুক্তিপত্রে টিপ সই দিতে হতো আর চুক্তি অনুযায়ী কাজ না করলে চাষির ওপর চালানো হতো অকথ্য অত্যাচার। **প্রতিটি নীলকুঠিতে ছিল কয়েদখানা। নীল চাষ করতে না চাইলে কৃষকদের ওপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালানো হতো।**

---

[২৯৪] William Bolts, Merchant And Alderman, Or Judge Of The Hon. The Mayor's Court Of Calcutta, Considerations on India Affairs, 1772

[২৯৫] John Phipps, A series of the Principal Product of Bengal, 1832, p5৯

[২৯৬] ডক্টর মো. জাহাঙ্গীর আলম, নীল আর নীলকণ্ঠ নয়... , কৃষি তথ্য সার্ভিস, বাংলাদেশ সরকার।

কী ধরনের নির্যাতন চালানো হতো দেখা যাক। বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ যার নামে তিনি নীলকর 'মোরে সাহেব'। যার কুকীর্তি উঠে এসেছিল 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় (২রা বৈশাখ, ১২৫৬ বঙ্গাব্দ); যার শিরোনাম ছিল : *সুসভ্য ইংরাজবংশবতসং শ্রীযুক্ত মোরে হইতে প্রজাদিগের নির্ব্বাসন, ভ্রূণহত্যা-স্ত্রীহত্যা-বালহত্যা, বলাৎকার, জালকারিতা প্রভৃতি।* কারও কারও ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হত। যেসব কৃষক অত্যাচারের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতেন, তাদের ভিটেমাটিতে নীল চাষ করা হত। অন্যকিছু বুনলে নীলকরের লোকেরা গিয়ে নীলের বীজ বুনে দিয়ে আসতো। নীল সংগ্রহ ও কেনার সময় সব অর্থ পরিশোধও করত না। উপরন্তু তারা তাদের পেয়াদা ও লাঠিয়ালদের দিয়ে দৈহিক নির্মম নির্যাতন করা হতো গরিব চাষিদের। নীলকরদের অত্যাচারে বহু বিত্তশালী গৃহস্থ গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে, অনেক স্থানীয় যুবতী তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছে, বহু প্রতিবাদী মানুষ হারিয়েছে জীবন। অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় নীল চাষের বিরুদ্ধে চাষীরা ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে এবং চারদিকে বিদ্রোহের সুত্রপাত ঘটে। প্রতিবিধানের জন্য গঠন করা হয় 'নীল কমিশন'।

নীলচাষ যে নানাবিধ নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত একথা 'নীল কমিশনের' রিপোর্টে স্বীকৃত হয়। এ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, রায়তদের কিভাবে ঋণ নিতে ও নীলচাষের চুক্তি সই করতে বাধ্য করা হতো; কিভাবে নীলকরেরা অনিচ্ছুক রায়তদের বাড়িঘর লুট করতে ও জ্বালিয়ে দিতে লাঠিয়ালদের ব্যবহার করত; কিভাবে রায়তদের হালের বলদ ধরে নেওয়া হতো; কিভাবে তাদের সবচেয়ে উর্বর জমি নীলচাষের আওতায় আনা হতো। পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটরা অত্যাচারী নীলকরদের সাহায্য-সহযোগিতা করত বলে যে অভিযোগ ছিল, তারও সমর্থন মেলে কমিশনের রিপোর্টে। [২৯৭] কমিশন রায়তদের উপর নৃশংসতার কথা লিপিবদ্ধ করে বটে, কিন্তু তাদেরকে রক্ষা করার জন্য নতুন আইনের প্রয়োজন বিবেচনা করে নি। দাসপ্রথার সাথে এর পার্থক্য হল কেবল 'অপহরণ করে অন্য দেশে স্থানান্তর না করা'। নিজ দেশে নিজ ঘরে মানুষকে দাস বানানো হয়েছে।

মানবতার ফেরিওয়ালারা, সভ্যতার দাবিদারেরা, মূলবোধ-নৈতিকতার প্রশিক্ষকরা নিজ দেশে দাসপ্রথা লোপ করে ক্রেডিট নিলেও উপনিবেশে, যেখানে থেকে তাদের মূল উৎপাদন আসে, যেখান থেকে তাদের ইকোনমির জ্বালানি আসে। যেখানে তারা ঠিকই দাসপ্রথার সবগুলো উপাদান বজায় রেখেছে। বাধ্যশ্রম, শারিরিক নির্যাতন, মানসিক অত্যাচারের মাধ্যমে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, বন্দিত্ব, স্বাধীনতা হরণ সবই পূর্ণ মাত্রায়

[২৯৭] নীল বিদ্রোহ, বাংলাপিডিয়া

লালন করেছে। আর নেটিভ গোলামরা মুগ্ধ নয়নে ভাবছে, কত মহান এই সাদা সভ্যতা। উপনিবেশ-যুগে তারা যা করেছে, ঠিক একই কাজ তারা নব্য-উপনিবেশী যুগেও করছে। পার্থক্য হল, তখন কোম্পানিরই নিজস্ব সেনাবাহিনী ছিল। আর এখনকার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির নিজের বাহিনী থাকে না, তবে গণতন্ত্রের মাধ্যমে যে পুতুল সরকার তারা বানায়, সেই সরকারি বাহিনীকে ব্যবহার করেই একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার জুটিয়ে নেয়। নিজ দেশের সরকার, ইইউ, জাতিসংঘ দিয়ে বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ করে, কিংবা তাদের সাপ্লায়ারদের দিয়ে ভিতর থেকে চাপ দিয়ে ৩য় বিশ্বের সরকারকে তাদের মনমত পলিসি করতে বাধ্য করে। উপনিবেশী যুগের কোম্পানিগুলোর প্রেতাত্মারা আজও জিইয়ে রেখেছে দাসপ্রথা। বিশ্বাস হচ্ছে না তো?

আধুনিক দাসপ্রথা

অষ্টাদশ শতকের সেই মধ্যবিত্ত পুঁজিপতিরা আজকের মাল্টিন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রির মালিক। কর্পোরেট দুনিয়ার একেকজন রাঘব বোয়াল। দেশে দেশে সরকার যা আমরা দেখি এরা পুতুল। সরকারে বসায় এরা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-মিডিয়া-রাষ্ট্র এসবকিছু এই শ্রেণীর হাতে। ৫০% সম্পদ যে ১% এর হাতে, এরা হচ্ছে সেই তারা। পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে, যুদ্ধ থেকে নিয়ে রিএডুকেশন ক্যাম্প, আইন থেকে নিয়ে নারীবাদ সবকিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই অংশটাকে লাভবান করবে। এরাই একসময় দাসব্যবসায় বিনিয়োগ করেছে, এরাই পরে দাসপ্রথা বন্ধে আইন করেছে নিজেদের স্বার্থে, আবার এরাই সীমিত আকারে ভিন্ন নামে দাসপ্রথা টিকিয়ে রেখেছে নিজেদেরই স্বার্থে। তখনও রেখেছিল, এখনো রেখেছে।

সব অপরাধের বিরুদ্ধেই আইন করা হয়। কিন্তু এরপরও অপরাধ চলে। যে অপরাধের সাথে সরাসরি অর্থের যোগ আছে, তা সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারেই যোগসাজশে চলে। দাসব্যবসাকেই এখন ডাকা হয় 'মানব পাচার' (human trafficking) নামে। দাসপ্রথাকে ডাকা হয় 'জবরদস্তি শ্রম' (forced labour) নামে। International Justice Mission (IJM) এর জার্মানির প্রধান Dietmar Roller বলেছেন ডয়েচ ভেলে-কে: 'দাসপ্রথা এখন আর বৈধ না। কিন্তু গিরগিটির মত রঙ বদলে সে এখনো গোপনে বেঁচে আছে'।

- ২০১৮ সালে ILO জানাচ্ছে প্রতি বছর দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ থেকে ২০

লক্ষ শিশু ইউরোপ-আমেরিকাতে পাচার করা হয় [২৯৮]। ইউরোপ-আমেরিকায় না দাসব্যবসা নিষেধ, দাসপ্রথা নিষেধ? তাহলে এই ২০ লক্ষ শিশু সেখানে কী করে? পাচারকারীরা কি তাদেরকে ইউরোপ-আমেরিকায় নিয়ে বিনামূল্যে ছেড়ে দেয়, না বিক্রি করে? যারা কেনে, তারা কি মুক্ত করে দেয়, নাকি প্রপার্টি হিসেবে থাকে? আপনার কি ধারণা এই বিশাল ব্যবসার কথা রাষ্ট্র জানে না? (উগান্ডার এমপি যে ইয়াবা ব্যবসার মূল হোতা, এটা কি রাষ্ট্র-প্রশাসন জানেনা?)

- লাতিন আমেরিকার ভিতরে ১১-১৭ বছর বয়সী প্রায় ২০ লক্ষ শিশু যৌনশ্রমে বাধ্য হচ্ছে [২৯৯]। বাংলাদেশ দিয়েই চিন্তা করেন, এটা ওপেন সিক্রেট যে টেকনাফে মাদকবিরোধী অভিযানে এমপি সাহেবের কিচ্ছু হবে না। একেকজন এমপি, মন্ত্রী, এমপির শালা, মন্ত্রীর ছেলে, আর্মিচীফের ভাই।

- পূর্ব ইউরোপ থেকেও প্রতি বছর বহু নারী ও শিশু আমেরিকাতে পাচার করা হয়। Europol (2009) এবং International Labour Organization (2005) এর মতে বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, রাশিয়া, মলদোভা, বেলারুশ এবং ইউক্রেন থেকে বহু মানুষ পাচার হয়ে পশ্চিম ইউরোপের ১ম বিশ্বে যায় [৩০০]। কী করে এরা গিয়ে? চাকরি-ব্যবসা? এদেরকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়, জোরপূর্বক শ্রম নেয়া হয় এবং গর্ভবতী মা-দের পাচার করে বাচ্চা কিনে নেবার জন্য। রেডক্রসের মতে, শুধু এক বেলারুশেই ৮ লাখ মানুষ মিসিং [৩০১]।

Human Rights Commission United States এর রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বে ৪ ধরনের দাস (modern slave) রয়েছে—

১. Forced Labourer (জোরপূর্বক শ্রমিক)

২. Sex trafficking (পর্নোগ্রাফি ও পতিতাবৃত্তির জন্য পাচার)

৩. Debt bondage (ঋণ পরিশোধে অক্ষম হওয়ায় দাস বানানো)

---

[২৯৮] Child Sex Trafficking In Latin America, United Nations Human Rights Council.

[২৯৯] The Commercial Sexual Exploitation Of Children In Latin America, page ১১ [আন্তর্জাতিক সংগঠন End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) এর ২০১৪ সালের রিপোর্ট]

[৩০০] Petrunov, G. (2014). Human Trafficking in Eastern Europe: The Case of Bulgaria. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 653(1), 162–182.

[৩০১] Joe Lowry, IFRC representative for Belarus, Moldova and Ukraine (12 march 2009). Eastern Europe: Human trafficking "set to rise". International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

৪. Child trafficking (শিশু পাচার)

Global Slavery Index-2016 অনুসারে এই সংখ্যাটা ৪০.৩ মিলিয়ন, যারা modern slavery-এর অধীনে রয়েছে [৩০২]। দেখুন পাঠক, ট্রান্স-আটলান্টিক দাসব্যবসায় ১২.৫ মিলিয়ন (সর্বোচ্চ ৫০ মিলিয়ন), আর মুসলিমদের কাছে ট্রান্স সাহারান দাসব্যবসায় সর্বোচ্চ ধরেছে ১৭ মিলিয়ন। আর এখন আধুনিক দুনিয়ায় ৪০ মিলিয়ন দাস। ঘুরেফিরে তো একই হল। আইন খাতাকলমেই, নাকি? এসব আইন করে কী লাভ, যা উদ্দেশ্য পুরো করে না। আছে লাভ আছে। লাভ ছাড়া আবার কেউ কিছু করে নাকি?

কেন? কে দায়ী?

১.

বিচারিক প্রক্রিয়ায় 'Cui bono' নাম একটা নীতি আছে। মানে হল—'to whom is it a benefit?', এই যে অপরাধটা হল, এতে কার কার লাভ হয়েছে। তাদেরকে ধরলেই আসল ঘটনা বেরিয়ে আসবে। আজকের এই আধুনিক দাসপ্রথায় কার কার লাভ হচ্ছে, বের করুন। ILO-এর মতে, আধুনিক দাসদের কারণে বছরে ১৫০ বিলিয়ন ডলার মুনাফা হয়, কেননা এদের বেতন-ছাড়া বা নামেমাত্র বেতনে কাজ করানো হচ্ছে, সেই বেতনটা বেঁচে যাচ্ছে, মুনাফার খাতায় যোগ হচ্ছে সেটা। এরা কোথায় কাজ করছে? কোন সে ইন্ডাস্ট্রি যার সাপ্লাই চেইনে এদেরকে এনে বাধ্যশ্রম দেয়ানো হচ্ছে?

- যেমন Oxfam-এর এক তদন্তে এসেছে, ব্রিটেনে টমেটো-প্রোডাক্টের সাপ্লাইদাতা ফিনল্যান্ডের SOK Group যে ইটালিয়ান প্রডিউসারের থেকে টমেটো আনে, তারা forced labour দিয়ে কাজ করাচ্ছে (রয়টার্স, ২০১৯)।

- কিংবা বড় বড় চকোলেট কোম্পানিগুলো ঘানা বা আইভরি কোস্ট থেকে বাধ্যশ্রমের কোকো আনছে, যেটা তারা জানে যে, এজন্যই কমদামে কোকো আমদানি করা যায়। লাভ বেশি রেখে বেচা যায়।

- বৃটেনের Tetly চা কোম্পানি ইন্ডিয়ার Tata Global Beverages থেকে চা নেয়, তারা অত্যন্ত কম বেতনে মানবেতরভাবে শ্রম নিচ্ছে (গার্ডিয়ান, ২০১৪)।

- Oxfam, UK-এর ethical trade manager মিস্টার Rachel Wilshaw

[৩০২] The Global Slavery Index 2018, Walk Free Foundation.

বলেন:

> “ আমরা এখন জানি যে, অধিকাংশ গ্লোবাল কোম্পানিরই সাপ্লাই চেইনে কোথাও না কোথাও আধুনিক দাসপ্রথা রয়েছে। [৩০৩]

অর্থনীতিবিদ Evi Hartmann তাঁর *Wie viele Sklaven halten Sie? (How many slaves do you have?)* বইয়ে মন্তব্য করেছেন: গড়ে প্রত্যেক জার্মান পরোক্ষভাবে ৬০ জন দাস রাখে। কীভাবে? তারা কাপড় কেনে, সংঘাতময় এলাকা থেকে আসা কাঁচামালে বানানো প্রোডাক্ট কেনে। এভাবে আমরা বিশ্বের নানা প্রান্তে দাসপ্রথাকে টিকিয়ে রাখি। টপ ৫টা ইন্ডাস্ট্রির নাম যদি বলা যায়, যারা এই দাসপ্রথার উপর মুনাফা করছে এবং টিকে আছে—

- ইলেক্ট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি
- গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি
- ফুড এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রি
- সেক্স ইন্ডাস্ট্রি (বার ও নাইটক্লাব)
- ক্যাসিনো ও হোটেল

২.
আপনি যদি Global Slavery Index-এর রিপোর্ট দেখেন, দেখবেন ১ম বিশ্বের দেশগুলো সাদা সাদা। তাদের গায়ে কোনো ছোপ নেই। তারা নির্দোষ, তাদের দেশে দাসপ্রথা নেই। তারা উন্নত, তারা সভ্য। আর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো কালো কালো। এসব জায়গা দাসপ্রথায় জর্জরিত। এরা এখনও অসভ্য। প্রশ্ন হল, কাদেরকে কম পয়সায় কাঁচামাল সাপ্লাই দেবার জন্য এসব জায়গায় দাসপ্রথা টিকিয়ে রাখা হয়েছে। কাদেরকে কম মূল্যে কোকো দেবার জন্য ঘানা ও আইভরি কোস্টে নামমাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে শ্রম নেয়া হচ্ছে জোর করে। উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলে মালের দামের উপর চাপ পড়বে, দাম বাড়বে। দাম বাড়লে তারা কারা, যারা এখান থেকে আর প্রোডাক্ট নেবে না, অন্য জায়গা থেকে নেবে যাদের দাম কম, মানে তারাও দাসপ্রথা কাজে লাগায়।

একেই বলে নব্য-উপনিবেশবাদ। উপনিবেশবাদ হল: গরু পরাধীন, আমিই পালব, আমিই খাওয়াবো, আমিই দুধ নেব। আর নব্য-উপনিবেশবাদ হল: গরু আমি পালব না,

---

[৩০৩] Katherine Steiner-Dicks (Aug 6, 2019). 'We know most global companies have modern slavery in their supply chains'. [Reuters Events is part of Reuters News & Media Ltd]

গরু স্বাধীন, নিজের মত চরে খাবে, আমি দিনশেষে শুধু দুধটুকু দুয়ে নেব। আগে বৃটিশ দাদন দিয়ে, পিটিয়ে মেরে নীল চাষ করাতো, দোষ হত ব্রিটিশের। এখন নেয় এদেশীয় সরকার দিয়ে পলিসি করিয়ে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে, ব্রিটিশের হাত ময়লা হয় না। ম্যাপটা থাকে সাদা সাদা। আর ভারতের ম্যাপ হয় কালো কালো। গরীব দেশের সরকার আইন বানায় গরীব দেশের প্রডিউসার/ সাপ্লায়ারদের চাপে। কিংবা আমেরিকান গ্লোবাল কোম্পানি আমেরিকা সরকারকে দিয়ে গরীব দেশের সরকারকে চাপ দেয়ায়। গরীব দেশে এই সাপ্লায়াররা-শিল্পপতিরাই মন্ত্রিসভা আলো করে বসে থাকে। Govt. of the Capitalist, by the Capitalist, for the Capitalist. এর নাম 'গণতন্ত্র'। কেউ যদি মনমতো কাজ না করে, পরের টার্মে বদলে দেয়া যায়। সাপ্লাই চেইন ঠিক রয়ে যায়। দাসরা দাস রয়ে যায়। আর যে দেশে এই মজার সিস্টেমটা নেই, সেখানে গিয়ে জোর করে 'গণতন্ত্র' দেয়া হয়। অবশ্য স্বৈরশাসক বা বাদশাহ অতখানি সুযোগ দিলে গণতন্ত্র তখন আর জরুরি থাকে না। দেশে দেশে দুনিয়া চালায় পুঁজিপতিরা। এই দুনিয়া ওদের, আমাদের না।

দেখুন আফ্রিকার ম্যাপটা। যে অঞ্চলগুলো বেশি ডার্ক করা, সে অঞ্চলগুলোতে অত্যাধিক modern slavery রয়েছে। সেখানে এতো দাসত্বের কারণ কী? কারণ হলো অভাব। মানুষ একমুঠো খাবারের আশায় নিজেকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের দেশ আফ্রিকার এ অবস্থা কেন হলো? কে দায়ী এর জন্য?
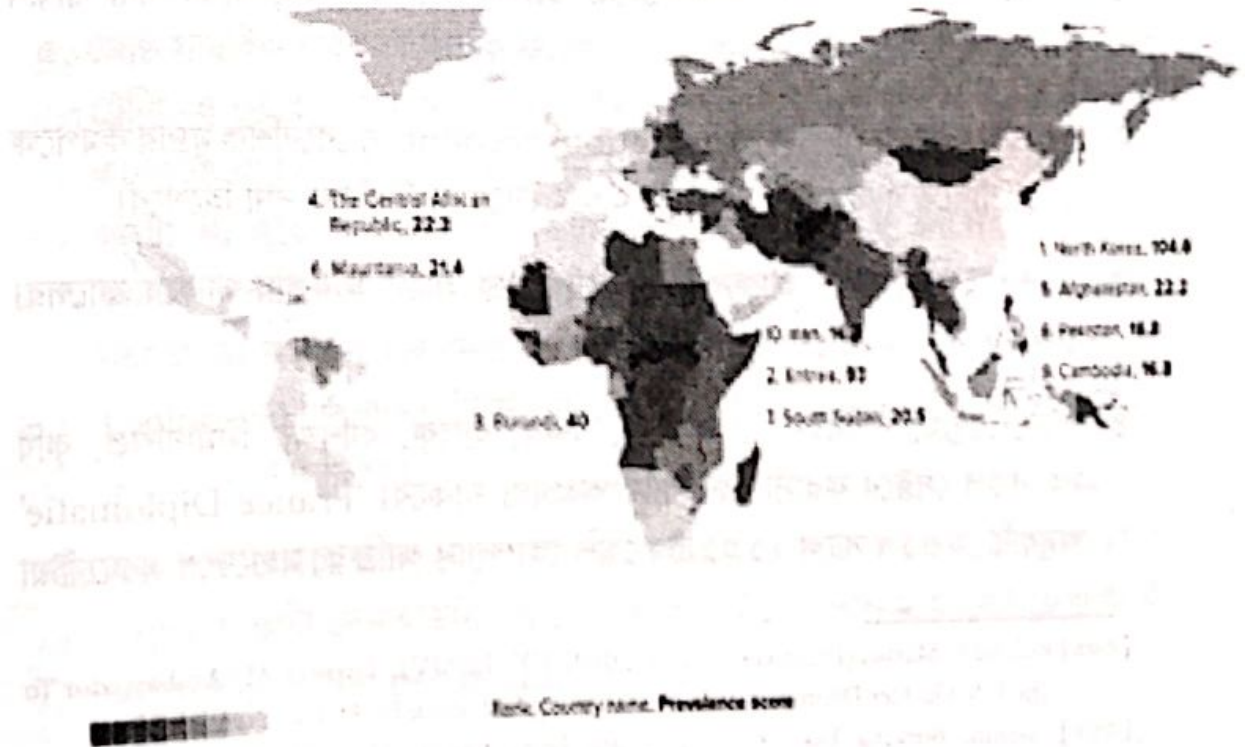
তাদের এই করুণ দশার জন্য ফ্রান্স দায়ী। পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলো ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশ— মৌরিতানিয়া, মালি, সেনেগাল, গিনি, আইভরি কোস্ট, বারকিনা ফাসো, বেনিন, নাইজার, আলজেরিয়া। এক শতাব্দী উপনিবেশ শাসনের পর গেল শতকের ৬০-এর দশকে এদের স্বাধীনতা দেয়া হয়।

গত বছরের নভেম্বরে সাংবাদিক Roland S. Martin-এর চ্যানেলে আসেন আমেরিকায় নিযুক্ত আফ্রিকান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত Dr. Arikana Chihombori-Quao. এসে শোনান মানবসভ্যতার ইতিহাসের এক হৃদয়বিদারক অধ্যায়। ৬০ বছর আগে ফ্রান্স আফ্রিকা ছেড়ে গেলেও উপনিবেশ ছেড়ে দেয়নি। তারা স্বাধীনতা দিয়েছিল একটি লিখিত চুক্তির বিনিময়ে। চুক্তিটি ছিল এই যে, আফ্রিকার মোট বৈদেশিক রিজার্ভের ৮৫% ফ্রান্সে পাঠাতে হবে। আর বাকি ১৫% দিয়ে আফ্রিকা চলবে। যদি আফ্রিকার ১৫% দিয়ে চলতে অসুবিধা হয়, তবে ফ্রান্স আফ্রিকাকে সুদে ১০% লোন দিবে। চিন্তা করেন, আফ্রিকার টাকা আফ্রিকাকে ঋণ দিবে, সুদে [৩০৪]। PAN AFRICAN VISIONS জানাচ্ছে, প্রতি বছর ফরাসী সেন্ট্রাল ব্যাংকে ৫০০ বিলিয়ন ডলার জমা দেয় ১৪টা আফ্রিকান দেশ [৩০৫] colonial debt হিসেবে। তাদেরকে ফরাসীরা যে উন্নতি এনে দিয়েছে তার প্রতিদানে বিগত ৬০ বছর ধরে ঋণ শোধ করে চলেছে দেশগুলো। সেই চুক্তির প্রধান ধারাগুলো এমন—

১. উপনিবেশে ফ্রান্স যেসব অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে, তার বাবদ সদ্য স্বাধীন দেশগুলো ঋণ পরিশোধ করবে।

২. দেশগুলো ফরাসী ট্রেজারিতে operations account-এ বৈদেশিক মুদ্রার কমপক্ষে ৬৫% রাখতে বাধ্য থাকবে। আরও ২০% দেবে অর্থনৈতিক দায় হিসেবে।

৩. এসব দেশের যেকোন প্রাকৃতিক সম্পদে সবার আগে অধিকার থাকবে ফ্রান্সের। ফ্রান্স না নিলে অন্য ক্রেতা দেখা হবে।

৪. পানি, বিদ্যুৎ, পরিবহন, টেলিফোন, বন্দর, ব্যাংক, বাণিজ্য, নির্মাণশিল্প, কৃষি সহ সকল সেক্টরে ফরাসী কোম্পানি অগ্রগণ্য থাকবে। 'France Diplomatie' অনুযায়ী, ২০১৭ সালে ২১০৯টির বেশি কোম্পানি আফ্রিকা মহাদেশে একচেটিয়া

---

[৩০৪] Roland S. Martin (Premiered Nov 5, 2019). EXCLUSIVE: Former AU Ambassador To The U.S. On Her Dismissal, France's Ongoing Influence In Africa. YOUTUBE

[৩০৫] Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo-Brazzaville, Equatorial Guinea and Gabon.

ব্যবসা করছে। এর মধ্যে আছে:

খাত	ফরাসি কোম্পানির মনোপলি
জ্বালানি খাত	ফরাসি কোম্পানি Total আফ্রিকার এক-তৃতীয়াংশ পেট্রোলিয়াম উত্তোলন করে
পরিবহন খাত	Air France
কারখানা	Lafarge
নির্মাণশিল্প	Bouygues Sogea-Satom
এগ্রো	Bel Bolloré
টেলিকম	Orange (১৯টা দেশে ১০ কোটি আফ্রিকান গ্রাহক) France Telecom
ব্যাংকিং	৩টা ফ্রেঞ্চ ব্যাংক ৭০% লেনদেন করে থাকে। – Banque National de Paris, – Société Générale – Crédit Lyonnais
ইউরেনিয়াম	Arlit (Niger) ও Orano (ex Areva) ১৯৭৬ সাল থেকে ইউরেনিয়াম তুলছে।

৫. জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাদেরকে ফ্রান্সে ট্রেনিং-এ পাঠানো হবে। এদেশীয় সেনাদের ট্রেনিং-ও দেবে ফ্রান্স। দেশগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখার উপায় হিসেবে এদেরকে ব্যবহার করা হবে। স্বাধীনতার পর থেকে গত ৫০ বছরে আফ্রিকাতে **৬৭টা ক্যু হয়েছে আফ্রিকার ২৬টা দেশে, যার ১৬টা-ই ফ্রান্সের উপনিবেশ।** যতবার নির্বাচিত সরকার এসেছে, ফ্রান্সের স্বার্থের বিপরীতে গেলেই হয় হত্যা নয়তো ক্যু করে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ক্যু করানো হয় French Foreign Legion-এর সদস্যদের দিয়ে, যারা ফ্রেঞ্চ আর্মিতে চাকরিরত বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেটিভ সেনা অফিসার [৩০৬]।

৬. নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে ফ্রান্স যেকোনো সময় নিজ সেনা মোতায়েন করতে পারবে এসব দেশে। বা স্থায়ী সেনাছাউনি বসাতে পারবে। বাইরের দেশে ২ ধরনের ফ্রেঞ্চ আর্মি থাকে: Opex আর pre-positioned forces.

---

[৩০৬] Mawuna Remarque Koutonin (January 30, 2014). 14 African countries forced by france to pay colonial tax for the benefits of slavery and colonization. PAN AFRICAN VISIONS

- Opex হল শান্তি মিশন। ৪৫% Opex সেনা আফ্রিকায় মোতায়েন আছে।
- Pre-positioned forces হল ফ্রান্সের বাইরে স্থায়ীভাবে মোতায়েন বাহিনী। আফ্রিকায় ফ্রান্সের ৪টি স্থায়ী বেইস রয়েছে— জিবুতি, সেনেগাল, গ্যাবন আর আইভরি কোস্ট। ফ্রান্স এবং তার অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা এবং দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ এদের দায়িত্ব।

৭. অফিসিয়াল এবং শিক্ষাদীক্ষার ভাষা হবে ফ্রেঞ্চ। Francophonie নামক সংস্থার মাধ্যমে French Minister of Foreign Affairs এর অধীনে তা মনিটর করা হবে।

৮. মুদ্রা হিসেবে CFA ফ্রাঙ্ক ব্যবহার করতে হবে। CFA Franc (African Financial Community or Cooperation Franc)

৯. বাৎসরিক রিজার্ভ ও ব্যালেন্সের পরিমাণ ফ্রান্সের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

১০. ফ্রান্স ছাড়া অন্য কোনো দেশের সাথে সামরিক চুক্তি করা যাবে না।

১১. ফ্রান্সের যেকোনো প্রয়োজনে মিত্র হিসেবে একাত্মতা প্রকাশ করবে।

এখন আমাকে বলেন, ২০১৬-১৭ তে আইভরি কোস্টের ২৩ লাখ এডাল্ট যে কোকো ফ্যাক্টরিতে দাসত্ব করে, সে দায় কি আফ্রিকার, না অন্য কারো? সেদেশের ১০-১৭ বছরের ৮৯১,০০০ শিশু যে স্কুলে না গিয়ে কোকো মাঠে নামমাত্র মূল্যে শ্রম দেয়, সে দায় কার? [৩০৭] আফ্রিকার, নাকি যারা আফ্রিকার ৮৫% সম্পদ নিয়ে যায় প্রতিবছর, তাদের? চকচকে ক্যালেন্ডার পেজে ছাপানো হবে সংস্থাগুলোর রিপোর্ট। যে বিষয়ের রিপোর্টই হোক না কেন, সেখানে আফ্রিকার ম্যাপ থাকবে কালা কালা রঙে।

দারিদ্র্যসীমার নিচে কারা— আফ্রিকা
দুর্ভিক্ষে মারা যায় কারা— আফ্রিকা
এইডস, ইবোলা মহামারি কোথায়— আফ্রিকা
অপুষ্টি বেশি কোথায়— আফ্রিকা
বিদ্যুত-বিশুদ্ধ পানি-টয়লেট নাই কোথায়— আফ্রিকা
জীবনমান সর্বনিম্ন কোথায়— আফ্রিকা
বিধবা বেশি— আফ্রিকা
নারীর প্যারামিটারগুলো সর্বনিম্ন— আফ্রিকা
অপরাধ বেশি— আফ্রিকা

---

[৩০৭] Global slavery index 2018 report

আর ফ্রান্সের ম্যাপটা দেখেন। ফকফকা, পরিচ্ছন্ন, সভ্য, উন্নত।

পশ্চিমারা দাসপ্রথাকে এবোলিশ করেনি বরং ভিন্ন নামে চালু রেখেছে। ৪০ মিলিয়ন তো খাতাকলমে, আসল সংখ্যাটা বেশি বই কম না। ট্রান্স-আটলান্টিক ও মুসলিম দুনিয়ায় দাসব্যবসা যা হয়েছে, আধুনিক দুনিয়ায় দাসের সংখ্যাও তার কাছাকাছি। পার্থক্য এটাই, আগে ব্যবসাটা চালাতো জমিদার শ্রেণী। তাদের নামিয়ে দেয়া দরকার ছিল, নামিয়ে দেয়া হয়ে গেছে। এখনকার দাসব্যবসা চলবে শিল্পপতিদের স্বার্থে। যেখানে যতটুকু দরকার।

৩.

সমাজতন্ত্র প্র্যাকটিক্যালি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ছাড়া আর কিছুই না। টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রের পুঁজিবাদী চরিত্র আরও অমানবিক। রাষ্ট্রীয় উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যত অমানবিক নীতিমালাই করা হোক না কেন, শ্রমিকের আন্দোলনের কোনো সুযোগ থাকে না। যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে থাকে। সোভিয়েত রাশিয়ায় এর বহু নজির আছে বইয়ের কলেবর বড় হবার আশঙ্কায় ওদিকে আর গেলাম না। তবে একটা উদাহরণ তো না দেখলেই নয়।

Centre for Strategic and International Studies এর রিপোর্ট মোতাবেক বিশ্বের ২২% তুলাজাত প্রোডাক্ট সাপ্লাই দেয় চীন একাই। সেই চীনের ৮৪% কটন পণ্য আসে পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে। সেই পূর্ব তুর্কিস্তানে ৫-৮ লাখ জাতিগত উইঘুর মুসলিমকে বাধ্য করা হচ্ছে বিনামূল্যে বা নামেমাত্র মূল্যে ফ্যাক্টরিতে শ্রম দিতে। অর্থাৎ চীনা কটন ইন্ডাস্ট্রি পুরোটাই চলছে উইঘুরদের ঘাম-রক্ত-অশ্রুতে [৩০৮]।

সাপ্লাই চেইনের সাথে জড়িত প্রতিটি হান চাইনিজ লাভবান হচ্ছে এই শ্রমদাসত্বে। লাভবান হচ্ছে কমিউনিস্ট সরকার। লাভবান হচ্ছে Apple, adidas, amazon, Calvin Klein, PUMA, JACK & JONES, BMW, GAP, NIKE, Samsung, SONY, HUAWEI, Volkswagen-এর মত অসংখ্য বহুজাতিক কোম্পানি লাভবান হচ্ছে মুসলিমদের এই শ্রমদাসত্বে। করোনা মহামারির সময়ও শ্রমদাসদের দিয়ে সারা দুনিয়ায় পিপিই-মাস্ক ব্যবসা করে লাভের পাহাড় গড়েছে চীনা সরকার। Citizen Power Initiatives for China (CPIC) তাদের অনুসন্ধানী রিপোর্টে সুস্পষ্ট জানিয়েছে:

> “ আমাদের প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এটা ধরে নিতেই

---

[৩০৮] Ana Nicolai da Costa (13 NOV 2019) Xinjiang cotton sparks concerns over forced labour claims, BBC news

হবে, চীন থেকে যে কটন প্রোডাক্টই আসুক, সেটাই উইঘুর-কাজাখ শ্রমদাসদের হাতে তৈরি।[৩০৯]

অভিযোগের জবাবে চীনা সরকার বার বার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। বলা হচ্ছে, দারিদ্র্য বিমোচনে আমরা উইঘুরদেরকে চাকরি দিচ্ছি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করছি। তাই যদি হয়;

তবে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, কর্পোরেট চাকরিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ধনী কৃষক, দক্ষ পেশাজীবীদেরকে ধরে এনে এনে কেন ফ্যাক্টরিতে কাজ করানো হচ্ছে? ৭৪ বছরের অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ লোককে পর্যন্ত লাগানো হয়েছে।

ফ্যাক্টরির ভিতরে কাকপক্ষীও যেতে পারে না কেন? বিদেশী সাংবাদিকদের ভিজিটের দিন কেন সব কর্মীকে ছুটি দেয়া হয়? কেন সাংবাদিকদের কথা বলতে দেয়া হয় না শ্রমিকদের সাথে, কেন কথা বলার সময় সরকারি লোক দাঁড়িয়ে থাকে পাশে? কেন বিদেশী পরিদর্শকদের সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর শ্রমিকদের মুখস্ত করানো হয়?[৩১০] বিস্তারিত জানতে পড়ুন ইলমহাউস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত এনামুল হোসাইন রচিত **'কাশগড়: কত না অশ্রুজল'** বইটি। চোখের পানি ধরে রাখা যায় না, সেসব মর্মন্তুদ কাহিনী শুনলে।

কোন পাগলে বলে 'দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়েছে', 'এখন আর দাস নেই'। মানবেতিহাসের শুরু থেকেই দাসপ্রথা একটা বাস্তবতা, আইন করার পরও বাস্তবতা, মানব সভ্যতা যত আধুনিকই হোক না কেন এটা বাস্তবতাই থাকবে। কোনো আইনেই, কোনো কনভেনশনেই, কোনো স্লেভারি অ্যাক্ট করেই একে বিলোপ করা যায়নি, যায় না। রাষ্ট্র নিজে একে চর্চা করে, রাষ্ট্রের চোখের সামনে পুঁজিপতিরা এটা চর্চা করে, এসব পণ্য কেনার দ্বারা আমরাও এর চর্চা করি।

সমাধান ইসলামে। ইসলাম মজলুমের অধিকার দিতে এসেছে। ঘাম শুকোনোর আগেই শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা শ্রমিককে বুঝিয়ে দিতে এসেছে। এবং যারা ইসলামের এই মানবতাকে উদ্ধারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাদের স্বাধীনতাকে ইসলাম হরণ করবে। (তুলনী: জন লকের যুক্তিটা) তাদেরকে দাস বানিয়ে মুসলিম সমাজে রেখে উত্তম আচরণের দ্বারা তাদের ভুল ভাঙানোর চেষ্টা ইসলাম করবে। পরিশেষে মুক্তিকে ত্বরান্বিত করবে। ইসলামের দাসপ্রথার ধারণা এটা— বুঝতে না চাইলে তাকে কীভাবে বুঝানো যায় বলেন।

---

[৩০৯] Umar Farooq (8 AUG 2019). China profiting off forced labour inXinjiang, Anadolu Agency
[৩১০] Adrian Zenz (11 DEC 2019) Xinjiang's new slavery, Foreign Policy

যুদ্ধে নারীর নিয়তি

দাসীর প্রসঙ্গ আসলেই আমাদের এতোক্ষণের আলোচনার সাথে চারটি অতিরিক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়—

১. পুরুষদের বন্দি করা না হয় বুঝলাম, নারীদের কেন বন্দি করা হবে?
২. বন্দি করা হলো ভালো কথা, সহবাস কেন করা হবে?
৩. সহবাস করবে ভালো কথা, বিয়ে ছাড়া কেন?
৪. বিয়ে ছাড়া করবে ভালো কথা, সম্মতি ছাড়া কেন?

কেন'র কোনো শেষ নেই। আসলে একটা প্রশ্ন করা তো সহজ। কে-কী-কবে-কেন-কোথায় এই শব্দগুলো জানা থাকলেই যেকোনো বিষয়ে আপনি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। কিন্তু উত্তর পেতে হলে জানতে হয়, ভাবতে হয়, জানা তথ্যগুলো ভেবে সিন্থেসিস করে একটা 'কেন' বা 'কীভাবে'-এর উত্তর মেলে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লাগে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে, অথচ প্রশ্নটা করতে লাগে একটা বাক্য। পরীক্ষার খাতার কথাই ভাবুন। প্রশ্নপত্রটা এক পৃষ্ঠা, উত্তর লিখে আসি কয় পাতা? লুজ নিই কয়টা?

প্রশ্ন ১. পুরুষদের বন্দি করা বুঝলাম, নারীদেরকে কেন বন্দি করা হবে?

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে পুরুষদের বন্দি করা হল, বুঝলাম। কিন্তু তাদের নারী-শিশুরা তো কী দোষ করেছে। তারা তো যুদ্ধ করেনি, তাহলে নারীদেরকে কেন বন্দি করা হচ্ছে।

প্রথমত, ইসলামী যুদ্ধনীতির মৌলিক বিষয় হল নারী-শিশুরা যুদ্ধে নিরাপদ, যদি না—

১.মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২. সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয় (গোয়েন্দাগিরি ইত্যাদি দ্বারা)

কিন্তু কাফিরদের নারীদেরকে বন্দি করার বিষয়টি মুসলিম বাহিনীপ্রধানের উপর ন্যস্ত। ইসলাম অনুমতি দিয়ে রেখেছে, আমীর কল্যাণ মনে করলে বন্দি করতে পারে, চাইলে রেখে চলে আসতে পারে। কেন? এসব নারীদের তো কোনো দোষ নেই। তারা তো ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। আচ্ছা, আমাদের পিছনের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে: যুদ্ধের সুযোগে (হারবী কাফির) ইসলাম তার 'লক্ষ্য' অর্জনের উপযোগিতায় তাকে দাসত্বে আবদ্ধ করেছে, দাসপ্রথার ক্ষতি হ্রাস-লোপ করেছে, দাসপ্রথার উপকারটুকু গ্রহণ করেছে। কী কী উপকার—

- ইসলামকে প্রবল করে Deterrence সৃষ্টি
- কুফরকে হীন করে কাফিরের দ্বারা ক্ষতির সুযোগ মথিত করা
- মুমিনদের উপকৃত ও উৎসাহিত করা
- কাফিরের প্রাণ বাঁচিয়ে হিদায়াতের পরিবেশে রাখা
- কাফিরের ভরণপোষণের ব্যবস্থা

ঠিক এই ৫টি কারণেই ইসলাম কাফির-নারীশিশুদেরকেও বন্দি করবে।

- Deterrence সৃষ্টি: নারীরা দাসী হয়ে যাবে, এই ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ এড়ানো
- কাফির নারীদের দ্বারা ইসলামের ক্ষতির সুযোগ মথিত করা: কাফিরদের সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা তারা ইসলামের ক্ষতির যোগ্যতা রাখে। সেটা বন্ধ করা।
- মুমিনদের উপকৃত করা
- প্রাণ বাঁচিয়ে হিদায়াতের পরিবেশে রাখা
- ভরণপোষণ

তবে নারীশিশুদের বন্দি করার বাস্তবতা তখনকার আর এখনকার একরকম না। একটা দেশ দখল করে সব নারী-শিশুকেই দাস বানানো হবে? না, ব্যাপারটা অত্যন্ত ইম্প্র্যাকটিক্যাল, সম্ভব না। যদি মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধ করে কোনো শহর দখল করতে হয়। সেক্ষেত্রে সেই শহরের নারী-শিশুদের দাস বানানো হবে, যদি 'আমীরুল জুনদ' (বাহিনীপ্রধান) মনে করেন। কিন্তু এখনকার যুদ্ধ কালচারে ব্যাপারটা অনেক জটিল।

যুদ্ধ-কালচার

আগের যুগে আরবের যুদ্ধ-সংস্কৃতি কেমন ছিল, দেখুন। তখন আরবে যুদ্ধ হতো

গোত্রে গোত্রে। যেমন: বনু কুরাইজা, বনু নাজির, বনু হাওয়াজিন। একটা-দুটো গোত্র হয়তো একটা শহরকে কেন্দ্র করে বাস করত। যেমন: মক্কায় কুরাইশ, মদীনায় আউস-খাযরাজ, তায়েফে বনু সকীফ, এরকম। বর্তমানে আর্মি যেমন একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যুদ্ধ করা আর্মির কাজ, বাকিরা বেসামরিক মানুষ; তখন এমন আলাদা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তখনকার সময় একটা গোত্রের 'সকল বালেগ পুরুষ'-ই যোদ্ধা। কিংবা উন্নত সাম্রাজ্যে রাজার অধীনস্থ জমিদার, ব্যারন, ডিউকেরা নিজ নিজ বেসামরিক প্রজাদের থেকে রাজাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈনিক সরবরাহ করত। এখনো কোনো কোনো দেশে conscription নামে একটা আইন আছে যে, দেশের সকল নাগরিককেই বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হয়। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আর্মিতে সার্ভিস দিতে হয়, যাতে দেশের প্রয়োজনে তারা যুদ্ধে অংশ নিতে পারে। অর্থাৎ যুদ্ধের সময় হলে, সকল নাগরিকই যোদ্ধা।

যুদ্ধ যদি অবরোধ টাইপ হয়, তাহলে শহরটা পতনের পর পুরো শহরই দাস বানানো হবে, পুরুষদেরকে দাসও বানানো হতে পারে, মেরেও ফেলা হতে পারে। শহরের পুরুষ সবাইকে যোদ্ধা হিসেবে ধরে নিয়ে।

আর যুদ্ধ যদি হয় শহর থেকে বাইরে বেরিয়ে ময়দানে, তাহলে নারীশিশুদের শহরে রেখে আসা হত, বিজয়ীরা শহরে গিয়ে তাদেরকে দাস বানাতো। নইলে যুদ্ধের সময় তারা নারীশিশুদেরকে নিয়ে ময়দানে আসত, যাতে যুদ্ধের স্পিরিট বাড়ে। যেমনটা হয়েছিল আওতাসের যুদ্ধে (সামনে আলোচনা আসবে)। তাহলে, বুঝা যাচ্ছে, একটা যুদ্ধে গোত্রের 'বালেগ সকল পুরুষ' যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। পরাজিত গোত্রটির পুরুষদের একদল নিহত হবে, আরেকদল বন্দি হবে। গোত্রে বাকি রইল শুধু গোত্রের নারী-শিশুরা। তাদের পরিণতি ৩টা—

১. হয় শরণার্থী হিসেবে অন্য গোত্রের কাছে যাবে, ও তাদের সাথে থাকবে। শরণার্থীদের বাস্তবতা এ যুগে যেমন, সে যুগেও ভিন্ন কিছু ছিলো না। ভিন গোত্রেও তাদের অবস্থান দাসের মতোই থাকবে।

২. নয়তো ক্ষুধা ইত্যাদিতে মানবেতর জীবন যাপন করবে। কেননা সক্ষম পুরুষেরা সবাই হয় মৃত, নয় বন্দি হয়ে বিজয়ীর দাস।

৩. নয়তো অনাহারে-রোগে মৃত্যুবরণ করবে এই নারী-শিশুরা।

এই তিনটি অপশান সেসময় পরাজিত পক্ষের নারীদের সামনে। আরেকটি পথ রয়েছে: বিজয়ী পক্ষের সেনাদের কাছে বিজয়ী পক্ষের সমাজে আশ্রয় পাওয়া। বিজয়ী

দল তো পরাজিত দলের সহায়-সম্পদও লুটে নেবে, তাদের কাছে থাকাটাই যৌক্তিক। সে যুগে সেনারাও পরাজয়ের প্রস্তুতি নিয়েই ময়দানে যেত। নিজ স্ত্রী-কন্যাদেরকে সুসজ্জিত করে নিয়ে যেত, যাতে পরাজয়ের পর আমি নিহত বা বন্দি হলে, আমার ঘরের মেয়েলোকেদের একটা হিল্লে হয়। সুসজ্জিতা নারীটি হয়তো কোনো বড় ঘরে সচ্ছল মালিকের চোখে পড়বে, এবং ভালো একটা জায়গায় আশ্রয় পাবে, এই আশায় তারা এটা করতো। Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature-এর বরাতে :

> “ যে সকল নারীরা তাদের বাবা অথবা স্বামীদের সাথে রণক্ষেত্রে যেত, তারা সবচেয়ে ভালো মানের পোশাক ও অলঙ্কার পরিধান করত যাতে যুদ্ধে পরাজিত হলে বন্দী অবস্থায় বিজয়ীদের দয়া পাওয়া যায়। [৩১১]

এবার আসি বর্তমানের যুদ্ধ-কালচারে। এখন সবাই যোদ্ধা না, মানুষ দুইভাগে বিভক্ত— সামরিক ও বেসামরিক। যুদ্ধ হবে 'আর্মি vs আর্মি', গোত্রের সাথে গোত্রের না। কিছু সিভিলিয়ান যোগ দিতে পারে। আর্মি পরাজিত মানে সেদেশই পরাজিত। এখন আর্মি একটা ইন্সটিটিউশন। দেখা যাচ্ছে একটা শহরের হয়তো ৫০ হাজার লোকের মাঝে ১০০ জন আর্মিতে চাকরি করে। যাদের অধিকাংশই এই শহরের ফ্রন্টে লড়ছে না, তাদের পোস্টিং হয়তো অন্য কোনো ফ্রন্টে। এখানে যারা লড়ছে, তারা অন্য জেলার মানুষ। যেমন কথার কথা, বার্মিজ আর্মিকে হারিয়ে ইয়াঙ্গুন শহর দখল করা হল, যার জনসংখ্যা ১ কোটি, যার মাঝে সেনাবাহিনীতে চাকরি করে ৩০ হাজার লোক। এখন কী করণীয়? এ ছাড়াও এখন জনসংখ্যা এতো বেশি যে, সবাইকে দাস হিসেবে গ্রহণ অযৌক্তিক ও অবাস্তব। এখনকার অবস্থা তুলনীয় উমার রা. বাইজান্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার সাথে। সকলকে দাস না করে, যথাস্থানে রেখে জিযিয়া আরোপ করা, তাদের মাঝে ভূমি বণ্টন করে খারাজ আরোপ করা।

যুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধ শেষে নারীর পরিণতি

বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি কেমন হয় একটু ধারণা করার চেষ্টা করি। বাংলাদেশে আমাদের প্রজন্ম আমরা যুদ্ধ দেখিনি, আমাদের আগের প্রজন্মও অনেকেই দেখেনি, বা দেখলেও বুঝার মত বয়সে ছিলেন না। বুঝানোর জন্য যেটা বলা যায়, কিছুদিন আগে আমরা

---

[৩১১] John McClintock, James Strong, "Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature" [Harper & Brothers, 1894, p. 782

করোনা পরিস্থিতিতে লক-ডাউনের সাথে পরিচিত হয়েছি। গাড়িঘোড়া চলছে না, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে, বাইরে বের হওয়া যাচ্ছে না, স্টক করা খাবার ফুরিয়ে আসছে। যুদ্ধ অবস্থা কিছুটা এরকমই, এর সাথে যোগ হবে—

- কারেন্ট থাকবে না
- শহর এলাকায় পানি সরবরাহ, গ্যাস সরবরাহ থাকবে না।
- মুহুর্মুহু মাথার উপর প্লেন চলবে, ভয় কাজ করবে, এই বুঝি বোমা ফেলল, এই বুঝি মারা গেলাম।
- মুহুর্মুহু কাছে-দূরে গোলাগুলির শব্দ
- কারফিউ থাকবে কোথাও কোথাও
- করোনার সময় মনে হত, বের হলে হয়তো আক্রান্ত হয়ে মারা যাবো। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতে ব্যাপারটা দাঁড়ায়, 'হয়তো-টয়তো' না, বের হলে 'নিশ্চিত' মারাই যাবো।

এমন একটা পরিস্থিতিতে পুরুষশূন্য নারীর কেমন দিন কাটা উচিত, ভেবে নিতে পারেন। বর্তমান যুদ্ধ কালচারে একজন নারীর নিয়তি—

যুদ্ধ চলাকালীন

- কিছু নারী বিধবা হবে কিংবা স্বামী বন্দি হবে। আর্নিং মেম্বার নাই। এমন কারফিউ টাইপ জীবিকাবিহীন অবস্থায় অনিশ্চিত দিন কাটবে। বের হয়ে মারাও যেতে পারে।
- পার্শ্ববর্তী দেশে উদ্বাস্তু হবে। এখানে আন্তর্জাতিক রিলিফ-টিলিফ আসবে। বেঁচেবর্তে থাকা যাবে।
- অথবা ইন্টার্নালি ডিসপ্লেসড হবে। যেমন: ঢাকার মানুষ রাজশাহীতে বা আরও গ্রামে চলে গেল। সেখানেও দিন খুব ভালো কাটবে, তা নয়।

যুদ্ধকালে নারীর জন্য আধুনিক বিশ্বে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান **শরণার্থী শিবির**, দেশের বাইরে। তবে সেখানে পৌঁছোনোর জার্নিটা বাসে-কারে চড়ে নয়, হয়তো পায়ে হেঁটেই হবে।

যুদ্ধ শেষে

আর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে পরাজিত জাতির নারীরা—

- দেশের বাইরে পালাতে পারলে, শরণার্থী শিবিরে থাকবে।
- পালাতে না পারলে, বিজয়ী সেনাদের দ্বারা গণধর্ষিত হবে। ধর্ষণ-অনাহার-রোগে নিহত হবে।
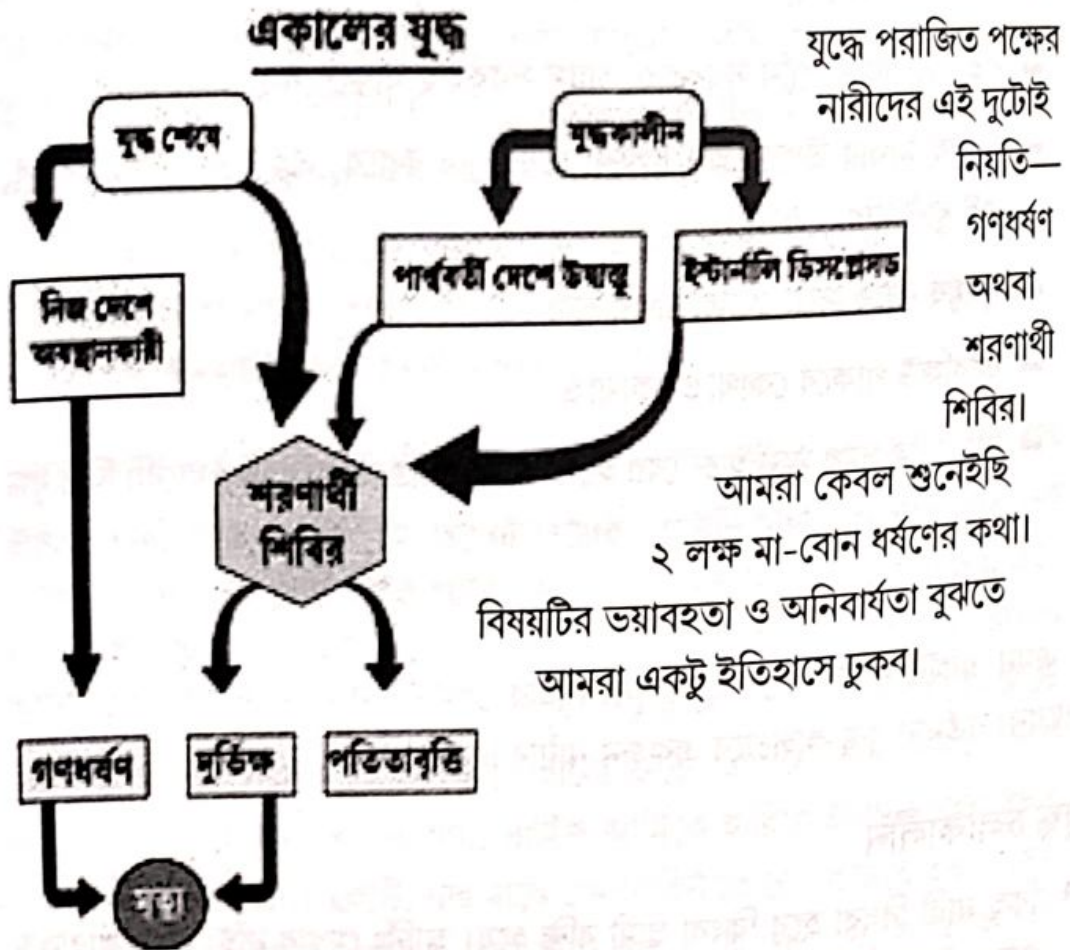
যুদ্ধে গণধর্ষণ

যৌনতা একটা স্বাভাবিক মানবিক চাহিদা। হাজার হাজার সুস্থ সক্ষম যুবক স্বদেশ-স্ত্রী-পরিজন থেকে দূরে বছরের-পর-বছর যুদ্ধ করছে, এই প্রয়োজন পূরণের কোনো উপায় ছাড়া। কুখ্যাত সেক্যুলার পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজীকে দেখা যায় এটা বলেই গণধর্ষণকে বৈধতা দিচ্ছে :

> "আপনারা কীভাবে আশা করেন একজন সৈন্য থাকবে, যুদ্ধ করবে, মারা যাবে পূর্ব পাকিস্তানে এবং যৌনক্ষুধা মেটাতে ফেরত যাবে ঝিলামে (পশ্চিম পাকিস্তানে)?

এবং এই চাহিদার আবশ্যিক পরিণতি হিসেবে এমন কোনো যুদ্ধই আপনি পাবেন না যেখানে, সেনারা প্রতিপক্ষের নারীদের ধর্ষণ করেনি। সে হিসেবে 'ধর্ষণ যুদ্ধের

অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ'। কেবল মিলিটারি আইনে শাস্তির ভয় ছাড়া এমন কোনো ভিতরগত বাধা সেক্যুলার আর্মির থাকে না, যা তাকে আত্মসংযমে বাধ্য করবে। শাস্তির সম্ভাবনা না থাকলে একটা ডিসিপ্লিন্ড সেক্যুলার আর্মি মূলত একদল নৈতিকতাহীন উন্মত্ত যুবক ছাড়া আর কিছুই না। সেই সাথে যদি খোদ কর্তৃপক্ষের তরফে জাতীয়তাবাদী একটা নৈতিক দায়মুক্তি থাকে, তাহলে তো পোয়াবারো।

বেশির চেয়ে বেশি যা আধুনিক সভ্যতা করতে পেরেছে, তা হল যুদ্ধকালীন পতিতালয় স্থাপন। যেমন ২য় বিশ্বযুদ্ধে জাপান তার দখলকৃত এলাকায় বহু'কমফোর্ট স্টেশন' তৈরি করে। সেখানে অধিকৃত এলাকার পতিতাদের (voluntary prostitution) রাখা হয়, যাতে জাপানি সেনারা গণধর্ষণ না করে। কেননা ধর্ষণের দরুন এসব এলাকায় জাপান-বিরোধী মনোভাব দানা বাঁধছিল। একে ঠেকাতে এই 'কমফোর্ট উইমেন'-এর আয়োজন। ৫০ হাজার থেকে ২ লক্ষ নারী এখানে যৌনশ্রম দিত [৩১২]।

আবার একই সময় ইউরোপে আমেরিকান সেনাদের জন্য 'GI whorehouse' করেছিল ডজন ডজন। এক রিসার্চে এসেছে এসময় ৫০% বিবাহিত সেনা ও ৮০% অবিবাহিত সেনা এগুলো থেকে উপকৃত হয়েছে। ইতালি ফ্রন্টে ১০০০ জনে ১৬৮ জন যৌনরোগে আক্রান্ত হয়েছিল। কোথাও কোথাও এই সংখ্যা ২২৩ জন পর্যন্ত উঠেছে। [৩১৩]

ব্রিটিশ সেনাদের জন্য ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালের ভিতর ৩৫ শহরে ১৩৭টা 'মিলিটারি ব্রোথেল' স্থাপন করা হয়েছিল। ফরাসি ও ইতালীয় মেয়েদের দিয়ে। অফিসারদের জন্য আলাদা লাক্সারির ব্যবস্থা ছিল। দেড় লক্ষ ব্রিটিশ সেনা যৌনরোগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল যুদ্ধের পর।[৩১৪]

কিন্তু এরপরও ব্যাপক গণধর্ষণ ঠেকানো যায়নি। যুদ্ধকালীন সময়ে নারীদের সুরক্ষা দিতে জেনেভা কনভেনশন আরও বেশি ব্যর্থ। সোভিয়েত ও জাপান সম্মতি দিলেও সই করেনি ৩য় কনভেনশনে। তাই তাদের এসব মেনে চলার দায় নেই বুঝলাম। কিন্তু যারা বানালো, তারা তো মানবে? কোথায় মানলো?

---

[৩১২] Gottschall J. (2004). Explaining wartime rape. Journal of sex research, 41(2), 129-136.

[৩১৩] MARY LOUISE ROBERTS, The Price of Discretion: Prostitution, Venereal Disease, and the American Military in France, 1944—1946, The American Historical Review , OCTOBER 2010, Vol. 115, No. 4 (OCTOBER 2010), pp. 1002-1030

[৩১৪] CLARE MAKEPEACE (29 October 2011), Sex and the Somme: The officially sanctioned brothels on the front line laid bare for the first time, Dailymail

আমেরিকান সৈন্যরা

আগ্রহী পাঠকদের জন্য দুটো বই রিকমেন্ড করছি:

- University of Wisconsin-এর Professor Mary Louise Roberts এর বই *What Soldiers Do.*
- Northern Kentucky University-র Criminology-র প্রফেসর J. Robert Lilly-র বই *Taken by force.*

মার্কিন সেনাবাহিনী বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর বাহিনীর ইউরোপে যাবার আগ্রহ বাড়ানোর জন্য ফ্রান্সকে একটা নন্দন-কানন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ফরাসী রমণীদের ছবি দিয়ে সেনাদের ম্যাগাজিন Stars And Stripes হেডলাইন করে : 'Here's What We're Fighting For' (এগুলোর জন্যই তো আমরা যুদ্ধ করছি)। ফরাসী মেয়েদের ছবি দিয়ে হেডলাইন : 'I am not married' কিংবা 'You have charming eyes' বা এমন 'প্রচ্ছন্ন আকর্ষণবোধক' কিছু বার্তা। যেন ম্যাগাজিন বলছে : এসে লুটেপুটে নাও, আমরা রেডি তোমাদের জন্য। এভাবে রাজনীতিবিদরা রেপমিথ তৈরি করে সেনাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিল। Professor Roberts বলেন :

> "সেনাদেরকে আক্ষরিক অর্থেই 'যুদ্ধে আসতে লালায়িত' (literally seduced) করা হয়েছিল... ডি-ডে'র পর থেকে উত্তর ফ্রান্সে যেন বয়ে গিয়েছিল 'পুরুষের লালসার সুনামি'। [৩১৫] ফরাসি ক্লিনিকগুলো মহিলা যৌনরোগী দিয়ে ভরে গিয়েছিল।

- ফ্রান্স ছিল আমেরিকার মিত্র দেশ। তারপরও ৩৬০০ ফরাসি নারীকে ধর্ষণ করে আমেরিকান সৈন্যরা। Taken by force বইয়ের লেখিকা J. Robert Lilly-র মতে, আমেরিকান সৈন্যরা বেশি না, ফ্রান্সে ৩৬০০, যুক্তরাজ্যে ২৫০০, আর জার্মানীতে ১১,০০০ নারীকে ধর্ষণ করেছে। Lilly মিলিটারি রেকর্ড ও বিচারিক নথি ঘেঁটে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, **ঐ সময় পশ্চিম ইউরোপে কম বেশি ১৪,০০০ বেসামরিক নারীকে ধর্ষণ করা হয়।** [৩১৬] এবার চিন্তা করেন নথির বাইরে আরও কত জন আছে।

---

[৩১৫] GUY WALTERS (31 May 2013). The GIs who raped France. Daily mail
[৩১৬] DANNY BUCKLAND (Aug 18, 2013). D-Day GIs 'raped and killed their French allies while US army generals turned a blind eye'. Daily Express
Jennifer Schuessler (May 20, 2013). The Dark Side of Liberation. The New York Times

- New York University Press থেকে প্রকাশিত The GI War Against Japan বইয়ে লেখক Schrijvers Peter লেখেন, ধর্ষণ ছিল স্বাভাবিক ঘটনা (general practice)। তিনি আরো বলেন, দখলের **প্রথম ১০ দিনে শুধু** Kanagawa **জেলাতেই ১৩৩৬ টি** রেপ-এর ঘটনা নথিভুক্ত হয়। ওকিনাওয়ার একজন ইতিহাসবিদ বলেন, ৩ মাসে সংখ্যা ছিল ১০,০০০ এর বেশি।

- সম্প্রতি জার্মানিতে প্রকাশিত Crimes Unspoken: The Rape of German Women at the End of the Second World War বইয়ে একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৪৫-১৯৫৫ সাল এই **১০ বছরে দখলদার আমেরিকা ১৯০,০০০ জার্মান নারীকে ধর্ষণ করেছে।**

ব্রিটিশ ও ফরাসি সৈন্যরা

- লেখিকা ইতিহাসের অধ্যাপক Miriam Gebhardt বলেন: **ব্রিটিশরা আরও ৪৫,০০০ এবং ফরাসিরা আরও ৫০,০০০ নারীকে ধর্ষণ করে।**[৩১৭] এটাই যুদ্ধে পরাজিত পক্ষের নারীদের বাস্তবতা। জেনেভা কনভেনশন এখানে অকেজো।

সোভিয়েত সৈন্যরা

- ১৯৪৫ সালের এপ্রিলের শেষের দিকে সোভিয়েত রেড আর্মি প্রবেশ করে বার্লিন শহরে। ৩০ এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করে। শহর দখলের পর সভ্য দেশের আর্মিটি মাত্র **১০ দিনে প্রায় ১ লক্ষ** জার্মান নারীকে ধর্ষণ করে [৩১৮]।

- পূর্ব প্রুশিয়াতে রেড আর্মির মেরিন অফিসার হিসেবে ছিলেন Zakhar Agranenko. পরবর্তীতে নাট্যকার হোন এবং তার ডায়েরিতে লিখেন: রেড আর্মি জার্মান নারীদের সাথে 'ব্যক্তিগত সম্পর্কে' বিশ্বাসী ছিল না অর্থাৎ তারা 'ওয়ান টু ওয়ান রিলেশান' না বরং **৯-১০-১২ জন মিলে একই বারে একজনকে ধর্ষণ** করতো (গণধর্ষণ)।

- বিজ্ঞানী Andrei Sakharov এর বন্ধু Natalya Gesse সাংবাদিক হিসেবে

---

[৩১৭] Guy Walters ().Did Allied troops rape 285,000 German women? That's the shocking claim in a new book. But is the German feminist behind it exposing a war crime - or slandering heroes? Daily Mail.

[৩১৮] Lucy Ash (1 May 2015). The rape of Berlin. BBC News, Berlin

কর্মরত ছিলেন। তিনি লেখেন, প্রতিটি রাশিয়ান সৈন্য ৮-৮০ বছর বয়সী প্রত্যেক নারীকে ধর্ষণ করতো। বার্লিনের প্রধান ২ হাসপাতালে ১০ দিনে rape victim ভর্তি হয় সূত্রভেদে ৯৫,০০০ - ১৩০,০০০ জন। একজন ডাক্তার জানান: প্রায় ১০,০০০ পরে মারা যায়, আত্মহত্যায়ই বেশি।

- এটা গেল প্রথমই ধাক্কায়, এরপর অনাহার থেকে বাঁচতে জার্মান মেয়েরা সোভিয়েত সেনাদের কাছে নিজেদের বিক্রি করত, কখনও এজন্যও যাতে অন্য সেনাদের থেকে নিরাপদ থাকা যায়, এজন্য একজনের কাছে নিজেকে পেশ করত।[৩১৯]

জাপানি সৈন্যরা

জাপান নিজেও ১৯৩৭ এ নানজিং প্রদেশেই ৮০,০০০ চীনা নারীকে ধর্ষণ করেছে।

ঠিক একই রকম ব্যর্থ হয়েছে ৪র্থ জেনেভা কনভেনশন এবং মানবাধিকার সনদ-টনদ।

- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ২ লক্ষ নারী পাকিস্তান আর্মি দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছে। মোড়লেরা সিমলা চুক্তিতে শর্ত দিয়ে দিয়েছে যুদ্ধাপরাধের বিচার করা যাবে না। নিজেদের কনভেনশন নিজেরাই খেয়ে ফেলে।
- গুয়াতেমালা গৃহযুদ্ধে ১ লক্ষ,
- রুয়ান্ডা গৃহযুদ্ধে ৫ লক্ষ,
- বসনিয়ায় ৬০ হাজার নারী ধর্ষিতা হয়েছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী থাকা অবস্থাতেই হাজারো নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে।[৩২০]

এতগুলো ঘটনা কিন্তু ঘটেছে ১৯২৯ সালে স্বাক্ষরিত যুদ্ধবন্দি সম্পর্কিত জেনেভা কনভেনশানের পরে। যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে তাদের এসব সভ্য সভ্য পেপারওয়ার্ক যুদ্ধে কতটা অকেজো তা বার বার প্রমাণ হয়েছে। বার বার তাদের এটা সংশোধন করতে হয়েছে। তারাই স্বাক্ষর করে, তারাই ভাঙে, আবার সংশোধন করে। তারা আমাদের দেখাতে চায়, আমরা তোমাদের জন্য বিশ্বের জন্য অনেক কিছু করছি, যা আই-ওয়াশ ছাড়া কিছুই না। এসব কাগজ তারা আমাদেরকে দেখায়, আর নিজেদের বেলায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

---

[৩১৯] Berlin: The Downfall 1945, লেখক Antony Beevor, 'They raped every German female from eight to 80'. Guardian

[৩২০] War rape in the world, WWoW - We are NOT Weapons of War

আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ

- আফগানিস্তান: ইউএস সেনাদের হাতে আফগান বালিকা ধর্ষণ ও খুন [PeaceWomen JAN 13, 2018]
- ২০১০-২০১৬ মাত্র এই ৬ বছরে মার্কিন সেনাসদস্য কর্তৃক ৬০০০ শিশু যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। [World Socialist Website 29 JAN 2018]

শরণার্থী শিবিরে বাস্তবতা

দুর্ভিক্ষ

যদি কপাল ভালো থাকে, এসব নারীদের শেষ পরিণতি হবে— শরণার্থী শিবির। আর শরণার্থী শিবিরের বাস্তবতা হল— দুর্ভিক্ষ, মহামারি। যুদ্ধ, শরণার্থী শিবির— এই শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ হল দুর্ভিক্ষ।

- ১৯২০ সালের পর দুর্ভিক্ষে ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ মারা যায়। এর কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)
- ১৯৪০ এর দশকে দুর্ভিক্ষে মারা যায় ১ কোটি ৮০ লাখ মানুষ। কারণটা হল ২য় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)
- ২য় বিশ্বযুদ্ধে শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে দুর্ভিক্ষে মারা যায় ১ কোটি মানুষ, শুধু একটা দেশে।

অর্থাৎ একটা যুদ্ধে যে পরিমাণ মানুষ মারা যায়, তার সমপরিমাণ বা দ্বিগুণ মানুষ মারা যায় যুদ্ধের পর দুর্ভিক্ষে-মহামারিতে। শরণার্থী শিবিরে অধিকাংশ নারী এবং শিশু। একজন নারী কী খেয়ে জীবন বাঁচাবে? তার সন্তানকে কী খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবে? শিবির থেকে বেরিয়ে কাজ খুঁজে নেবে, আয়-উপার্জনের ফিকির করবে, সে সুযোগও নেই। আন্তর্জাতিক সাহায্যই সম্বল, তাও চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। আমাদের রোহিঙ্গা-শিবিরের কথা ভাবুন, সেনাবাহিনী ঘিরে রেখেছে, যাতে এলাকা থেকে সবাই বেরিয়ে আসতে না পারে, কিন্তু ভিতরে চাহিদা-অপ্রতুলতা-অভাব কিন্তু রয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে শরণার্থী শিবিরের নারীরা কী করে থাকে? আশ্রয়দাতা দেশের মানুষ দয়াপরবশ হয়ে তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করে। কী কাজ— পতিতাবৃত্তি।

পতিতাবৃত্তি

বেশিদূরে যাবো না, আমাদের দেশে বর্তমান সময়েই তাকালে দেখতে পারো। শরণার্থী শিবিরের নারীদের নিয়ে বিভিন্ন জাতীয়-আন্তর্জাতিক মিডিয়ার হেডলাইনগুলো থাকে মোটামুটি এরকম।

রোহিঙ্গা শিবির, বাংলাদেশ

- The Rohingya children trafficked for sex [BBC news, 20 March 2018]
- Rohingya refugees forced into sex work [28 November 2017, BBC News]
- Clandestine sex industry booms in Rohingya refugee camps [Stefanie Glinski, 24 OCT 2017, Reuters]
- Rohingya girls in danger: Teenage bride, missing daughter, sex worker [24 August 2018, BBC News]

সিরিয়ান শরণার্থীরা দেশে দেশে

- The Syrian women and girls sold into sexual slavery in Lebanon [Daniela Sala, 11 Feb 2020, Al Jazeera]
- Disappointed refugees driven to prostitution [GERMANY GUIDE FOR REFUGEES, Deutsche Welle]
- The Syrian refugees selling sex to survive in Lebanon [27 March 2017, BBC News]
- Syrian refugees: Women in Jordan 'sexually exploited' [29 May 2013, BBC News]
- Women in Syria 'forced to exchange sexual favours' for UN aid [Josie Ensor, 27 FEBRUARY 2018, Telegraph]
- The teenage refugees selling sex on Athens streets [Arwa Damon, March 14, 2017, CNN]
- Syrian Women In Turkey's Refugee Camps Forced Into Prostitution [3 JULY 2017, HarekAct]

এমনকি পুরুষরাও পেটের দায়ে বেশ্যাবৃত্তি বেছে নিচ্ছে—

- 'A step away from hell': the young male refugees selling sex to

survive [Kate Hodal, 21 Feb 2020, Guardian]

- 'It's about survival': Why young male refugees are turning to prostitution [22 May 2017, The Local]
- Dozens of refugee men forced to sell sex for as little as €2 to survive in Greece [Gabriel Samuels, 07 June 2016, Independent]

পিছনের ইতিহাস

- ২য় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান আগ্রাসনের পর তো ফ্রান্সের সিঙ্গেল মা-দের জার্মান সৈন্যদের পতিতাবৃত্তি করে পেট চালাতে হয়েছিল [৩২১]।
- বার্লিনের পতনের পর অনাহার থেকে বাঁচতে জার্মান মেয়েরা সোভিয়েত সেনাদের কাছে নিজেদের বিক্রি করত। [৩২২]
- ১৯৬৫-১৯৭৩ সালের ভিয়েতনাম যুদ্ধে ১০,০০০ যুদ্ধশিশু জন্ম নেয় যারা ভিয়েতনামী মেয়েদের গর্ভে আমেরিকান সেনাদের সন্তান, পতিতাবৃত্তির ফসল। হাফ-আমেরিকান প্রজন্ম বলা হয় তাদের। [৩২৩]
- আর 'কমফোর্ট উইমেন', 'জিআই হোরহাউজ', 'মিলিটারি ব্রোথেল' গুলোয় যৌনশ্রম দিত হাজার হাজার জাপানি-ফরাসি-ইতালীয় নারী।

সুতরাং শরণার্থী শিবির, দুর্ভিক্ষ ও পতিতাবৃত্তি প্রতিযুগে, প্রতিদেশে, প্রতি সভ্যতায় অনিবার্য পরিণতি। কেউ আটকাতে পারেনি। না মানবাধিকার সনদ, না জেনেভা কনভেনশন; কেউ না। এসব হৃদয়বিদারক ঘটনা উল্লেখ করার কারণ এটা স্পষ্ট করা যে, এটাই যুদ্ধকালীন সময়ে একজন নারীর বাস্তবতা। আমরা যুদ্ধ দেখিনি। এটা একালেও পরাজিত জাতির নারীদের বাস্তবতা এবং সেকালেও এমনই হতো, ১৪০০ বছর আগেও বাস্তবতা এমনই ছিল। যুদ্ধে পরাজিত জাতির নারীদের সামনে ৩টি

---

[৩২১] For single mothers, sleeping with a German was sometimes the only way to obtain food for their starving children. [This Picture Tells a Tragic Story of What Happened to Women After D-Day, time.com]

[৩২২] Berlin: The Downfall 1945, লেখক Antony Beevor, 'They raped every German female from eight to 80'. Guardian

[৩২৩] Patrick Winn (September 02, 2011). Vietnam War babies: grown up and low on luck. GlobalPost

U. S. Now A dmitting Prostitutes To Some of Its Vietnam Bases, The New York Times (Jan. 25, 1972)

পরিণতি অপেক্ষা করে—

১. হয় তাকে সন্তানসহ অনাহারে মারা যেতে হবে

২. নয়তো শত্রুবাহিনীর হাতে গণধর্ষিতা হতে হবে

৩. আর না হয় পার্শ্ববর্তী দেশে শরণার্থী শিবিরে গিয়ে পতিতাবৃত্তি করে খেতে হবে।

ইসলামের সমাধান

প্রথমত ইসলাম তার শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি মুসলিম যুবকের মাঝে একটা ভিতরগত বাধা (deterrance) তৈরি করে। পুরস্কার ও শাস্তির মাধ্যমে মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয়। যেখানে আইন নেই, শাস্তি নেই, সেখানেও এই ভিতরগত deterrence তাকে স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বাধা দেয়। সেক্যুলার শিক্ষা সেই আধ্যাত্মিক মানসগঠনকে অন্তর্ভুক্ত করে না। এখানেই ইসলামের আধ্যাত্মিক বাহিনী, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে, আর সেক্যুলার বাহিনী যারা জাগতিক স্বার্থে লড়াই করে—দু'য়ের মাঝে পার্থক্য। ইসলামি রাষ্ট্রের মুজাহিদ রেপমিথ দ্বারা তাড়িত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসে না, তারা শহীদ হবার বাসনায় আসে। উত্তম অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসে, শ্রেষ্ঠ আমলের সাথে দুনিয়া থেকে যাবার জন্য আসে, দুনিয়া ভোগ করার জন্য নয়। দুনিয়ার এই নারীদের ছোঁবার জন্য নয়, জান্নাতের নারীদের আলিঙ্গন পাবার জন্য আসে।

বিভিন্ন আইন বা বিধান তৈরি করে ইসলাম যুদ্ধকালীন প্রতিহিংসা ও গণধর্ষণের সম্ভাবনা থেকে শত্রু নারীদের রক্ষা করেছে। ইসলাম ৩টি অপশন রেখেছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় ইসলামী বাহিনীর অধিনায়ক যেকোনোটি বেছে নিতে পারেন।

১. কিছু না করা। অনিবার্য পরিণতির উপর রেখে আসা। এজন্য সে গুনাহগার হবে না।

২. এই মরণাপন্ন ও হুমকির সম্মুখীন নারীদেরকে ইসলামী আর্মি নিজেদের হেফাজতে নিবে, নিরাপত্তা দিবে, ভরণপোষণ দিবে। কেন করবে? কীসের স্বার্থে? সেই আগের 'প্রোপার্টি ফীলিংস'— এদের বাঁচিয়ে রাখলে, সুস্থ রাখলে ভালো রাখলে আমার নিজের লাভ। শুধু নৈতিক বয়ানে চিঁড়ে ভেজে না। এই সত্যটুকু ইসলাম বোঝে বলেই, ইসলাম সকল যুগের সকল কালের সমাধান। ইসলাম ইনসাফের ধর্ম। নৈতিকতা ও জৈবিকতা, ব্যক্তিস্বার্থ ও সামষ্টিক স্বার্থ, দেহ ও আত্মা ইসলামে সমানভাবে ফ্লারিশ করে। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উদ্দেশ্যে ইসলাম ব্যবহার

করে জৈবিকতাকে। জৈবিকতাকে ছেড়ে দিয়ে নয়, কঠোর অবদমন করে নয়; বরং নিয়ন্ত্রিত চর্চাই ইসলামে আধ্যাত্মিক বিকাশের সোপান। শুধু বিধান-সমাধান বলে দিয়েই খালাস নয়। কীভাবে চললে সেই তক পৌঁছনো যাবে, দেহ-মন-সহজাত স্বভাবকে ব্যবহার করে সে পর্যন্ত পৌঁছার পথও দেখায় ইসলাম। এখানেই সোকল্ড কিছু শ্রুতিমধুর কাগজ আর ইসলামের মাঝে পার্থক্য।

রোগে-শোকে-অনাহারে মৃত্যুই যাদের নিয়তি, স্বাভাবিক জীবনে ফেরার শেষ একটা সুযোগ— দাসী হিসেবে বিজয়ী সমাজে মেইনস্ট্রীমিং। যোদ্ধাদের সম্পত্তি-অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে এর বিধান ইসলাম রেখেছে। নারীদেরকে দাসী বানাতেই হবে এমন নয়। আমিরুল মুজাহিদিন যদি মনে করেন এতে কল্যাণ রয়েছে তবে সে অপশন তার কাছে রয়েছে।

৩. আত্মীয়দের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে। দেখা গেল ৭ দিনের একটা ডেডলাইন দেয়া হল, এর মাঝে যার যার আত্মীয়াকে মুক্ত করে নাও। ৭ দিন শেষেও যারা রয়ে গেল, এদের আসলেই দেখার মত কেউ নেই, বা থাকলেও তার আর্থিক সঙ্গতি নেই। এই সব অসহায় নারীদের জন্য মুসলিম বাহিনীর হেফাজতে থাকাই উত্তম, শরণার্থী শিবিরে পচে মরার চেয়ে। অনেক মানবতাবাদীর মনে হতে পারে, সকল মৌলিক জৈবিক চাহিদার চেয়ে স্বাধীনতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম এসব আলগা ডায়লগবাজিতে বিশ্বাসী না। জীবনরক্ষা সবার আগে, জৈবিক চাহিদা পূরণ হলে এরপর মানসিক চাহিদা। ক্ষুধা মিটলে আত্মসম্মান-স্বাধীনতা-মুক্তি-প্রগতি। আত্মসম্মান খেয়ে পেট ভরে না।

যতক্ষণ পর্যন্ত এই নারী-শিশুরা মুসলিম বাহিনীর সমন্বিত কাস্টডিতে থাকবে, ততক্ষণ তাদের—

জীবনের নিরাপত্তা :

ইসলামি যুদ্ধনীতিতে ভিনজাতির নারীরা শত্রু নয়, যদি না সে সামরিক দায়িত্ব বা গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করে। নবিজি যুদ্ধক্ষেত্রে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও গির্জার পাদ্রিদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন :

> “ তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে শিশু, নারী, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও গির্জার পাদ্রিদের হত্যা কোরো না।[৩২৪]

খাদ্য-বস্ত্র-বাসের নিরাপত্তা :

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

[৩২৪] বায়হাকি, ১৮১৫২।

> জেনে রেখো দাস-দাসী তোমাদের ভাই। আল্লাহ তায়ালা তাদের তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে সে যেন নিজে যা খায় তাকে তাই খাওয়ায়, নিজে যা পরিধান করে তাকেও তাই পরিধান করায়। [৩২৫]

ইজ্জতের নিরাপত্তা :

- যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মালিকানা বন্টন না হয়। এ সময় তাদের কেউ ফুলের টোকাও দিতে পারবে না। উমর রা. এর শাসন আমলে, একবার সাহাবী যিরার রা. মালিকানা বন্টনের আগেই এক দাসীর সাথে সহবাস করে ফেলেন। একথা জানতে পেরে উমর রা. তাঁকে রজম (যিনার শাস্তি) অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার আদেশ দেন। যদিও এই ফরমান মদিনা থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আগেই যিরার রা. যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাই সে বিধান কার্যকর করা সম্ভব হয় নি। [৩২৬]

- স্বামী-স্ত্রী একসাথে বন্দি হলে কোন মুসলিম সেনা স্ত্রীর গায়ে হাত দিতে পারবে না [৩২৭]। ভোগের জন্য হলে এটারও কোন দরকার ছিল? ইখতিলাফ আছে। তবে জমহুরের মত এটকাই যে, তার বিয়ে বাতিল হয়নি।

- অনেক সময় একজন বন্দিনী কয়েকজন মুসলিমের মালিকানায় দেয়া হয়। এ অবস্থায় ঐ মহিলা কারো জন্যই বৈধ না । ভোগের জন্য হলে তো সব মালিকই ভোগ করতে পারত। ইবনে কুদামা আল মাকদাসী রহ. (মৃত্যু ৬২০ হিজরী) লিখেন:

> যৌথ মালিকানাধীন দাসীর সাথে সহবাসের অনুমতি নেই। [৩২৮]

যৌথ মালিকানাধীন দাসী সন্তান প্রসব করলে সন্তানের বিধান কী হবে, ফিকহের কিতাবে এর আলোচনা রয়েছে। এর মানে কিন্তু এই না যে, যৌথ মালিকানাধীন দাসীর সাথে দুই মালিকেরই সহবাসের অনুমতি রয়েছে। নাস্তিকদের ওয়েবসাইটে ফিকহের কিতাবের স্ক্রিনশট দিয়ে দাবি করা হয় যে, দুই মালিকই সহবাস করতে পারবে। ফিকহের কাজ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আইনী বিধান বের করা। বৈধ না, কিন্তু করে ফেলেছে, এখন কী করণীয় সে আলোচনার স্ক্রীনশট দিয়ে মূল পরিস্থিতি বোইধ

---

[৩২৫] সহীহ বুখারি ৩০, সহীহ মুসলিম ১৬৬১

[৩২৬] ইমাম বায়হাকী, সুনান আল কুবরা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত,২০০৩; খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৭৭, হাদিস নং- ১৮২২২

[৩২৭] কিতাবুস সিয়ার আস-সাগীর, অনুবাদকৃত মাহমুদ আহমাদ গাযী, ইসলামাবাদ, ১৯৯৮,পৃষ্ঠা ৫১। মুওয়াত্তা মালিক, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫০।

[৩২৮] আল-মুগনী, মাকতাবা আল- কাহিরাহ, কায়রো, ১৯৬৮,৬/৬৪; ফতোয়ায়ে শামী ৪/১২৫

প্রমাণ হয় না।

মানে কৌশলে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধকালে আশ্রয়হীনা নারীর নিরাপত্তা ভরণপোষণ ও সদাচরণ নিশ্চিত হল। যুদ্ধকালে 'গণধর্ষণ' নামক নৃশংস পরিণতি থেকে নারীদের সুরক্ষা দিয়েছে ইসলাম, যেটা সেক্যুলার যুদ্ধে অনিবার্য ঘটনা, কিছু দিয়েই আটকানো যায়নি।

দাসীদের সাথে সহবাসের বৈধতা

গত অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, যুদ্ধকালীন নির্মম বাস্তবতা থেকে শত্রুপক্ষীয় নারীদেরকে সুরক্ষা দেবার অপশন ইসলাম মুজাহিদ অধিনায়কের হাতে রেখেছে। পুরুষ দাসদের মতোই এদের ক্ষেত্রেও ক্যাম্পে বন্দি রেখে রাষ্ট্রীয় খরচে পালন করা কোনো কাজের কথা না, বন্দিজীবন মানবিকভাবেও গ্রহণযোগ্য না। বন্দি ক্যাম্পও ঘুরেফিরে সেই শরণার্থী শিবিরই হয়ে গেলো। বরং পুরুষ দাসদের মতোই নারী-শিশুদেরকেও মুসলিম সেনাদের মাঝে সম্পত্তি হিসেবে বণ্টন করা হবে। ইসলামের অন্যতম মজলুম ও misinterpreted বিধান 'দক্ষিণ হস্ত মালিকানা' এখানে ত্রাতার ভূমিকায় এসেছে। সেনাপতির ইচ্ছা সাপেক্ষে custody-তে আনার মাধ্যমে শত্রুপক্ষীয় নারীদেরকে :

- হত্যা, গণধর্ষণ ও নির্যাতন ইত্যাদি যুদ্ধকালীন প্রতিশোধপরায়ণতা থেকে সংরক্ষিত রাখা হয়।
- যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ-পরবর্তী দুর্ভিক্ষ, মহামারি, পতিতাবৃত্তি গ্রহণ ইত্যাদি বাস্তবতা থেকে তাদেরকে রক্ষা করে ফেলা হয়।
- মালিকানায় গ্রহণের দ্বারা সমাজে মেইন্সস্ট্রিমিং করা হয়।
- ডিটেনশন ক্যাম্প, শরণার্থীশিবিরে ইত্যাদিতে মানবেতর জীবনে না ঠেলে দিয়ে মুসলিমদের পারিবারিক পরিবেশে সমপর্যায়ের খোরাকির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।
- পর্যায়ক্রমে মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়।
- মুসলিম পরিবেশে থেকে ইসলামে আকৃষ্ট হয়ে পরকালীন জীবনে মহাক্ষতি থেকে বেঁচে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ২: বন্দি করা হলো ভালো কথা, সহবাস কেন করা হবে?
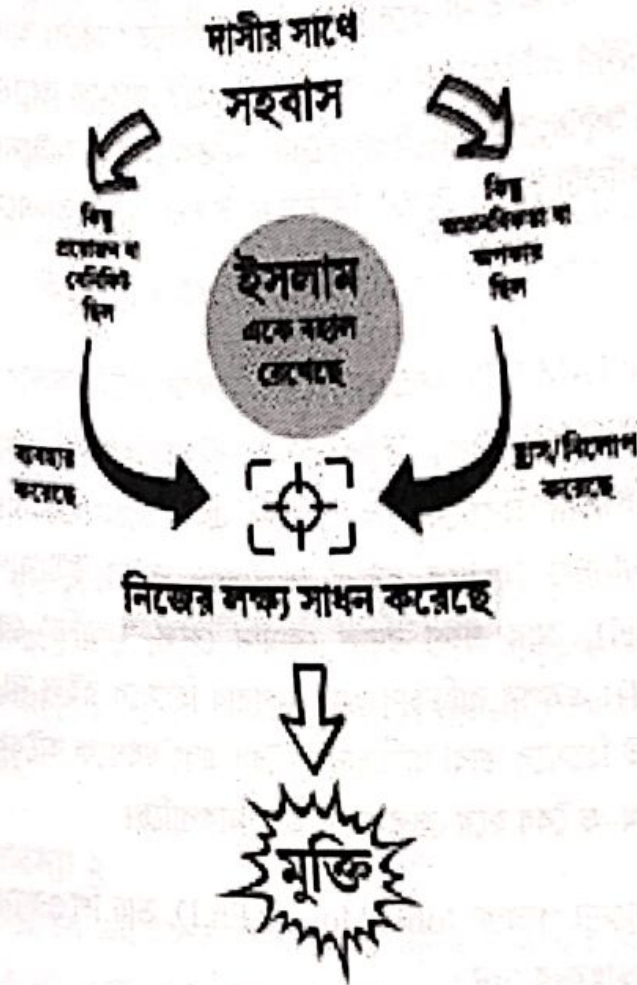
ইসলামের বিধান হল, বিবাহ ছাড়াই দাসীর সাথে সহবাসের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। সহবাস বৈধ হবার শর্ত হল: স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে বিবাহ, পরাধীন দাসীর ক্ষেত্রে মালিকানা। দাসীদের যৌনশ্রমকে ব্যবহার করার প্রাচীন সংস্কৃতিকে ইসলাম নিজ লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহার করেছে। নানান নিয়মকানুনের বেড়াজালে আটকে এর কুপ্রভাবগুলো মোচন করেছে, ভালো প্রভাবগুলো কাজে লাগিয়েছে। হোয়াট...? ধর্ষণে আবার ভালো প্রভাব? ধুর মিয়া, আপনার লেখা পড়ার কোনো মানে হয় না।

বর্তমান লিবারেল নৈতিকতায় এটাই মূল আপত্তি। লিবারেল ইথিক্সের দৃষ্টিতে একটি মেয়েকে ৩/৪ জন মিলে জোরপূর্বক সহবাসও ধর্ষণ, অ্যারেঞ্জড ম্যারেজও ধর্ষণ, স্ত্রীর অনিচ্ছা আছে যে সেশনে সেটাও ধর্ষণ, আর দাসীর সাথে সেটা ধর্ষণ তো বটেই। সহবাস তাদের চোখে কোনো সমস্যা না। নারী-পুরুষ-শিশু-পশু সবই তাদের কাছে ওকে, জাস্ট 'সম্মতি'টা যদি থাকে। সম্মতি ছাড়া সবকিছু তাদের চোখে ধর্ষণ। সুতরাং সহবাসও সমস্যা না, বিয়ে ছাড়া সহবাসও তাদের সমস্যা না। দাসীপ্রথা নিয়ে তাদের মূল আপত্তি হল:

প্রশ্ন ৩: বিয়ে ছাড়া সহবাস করবে ভালো কথা, 'সম্মতি' ছাড়া কেন?

পশ্চিমা লিবারেল মানদণ্ডে 'সম্মতি'-ই হল বৈধ-অবৈধের মাপকাঠি। দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ পারস্পরিক সম্মতিতে কারও ক্ষতি না করে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে। আর সম্মতি না থাকলে বৈধ সম্পর্কের দাবিও হয়ে যাবে অবৈধ। সম্মতি থাকলে তাদের হিসেবে ব্যভিচার, সমকাম, শিশুকাম, পশুকাম ইত্যাদি বৈধ। নৈতিকতা এবং আইনের মানদণ্ড হিসেবে 'সম্মতি'-র ফাঁকিটা হলো: কোনো জিনিস যতই ঘৃণ্য হোক, তা এসে বৈধ হয়ে যাবে 'সম্মতি'-তে।

সমস্যা ১

- খ্রিস্টবাদের যুগে ব্যভিচার ছিল নিষিদ্ধ। একে সমাজ-পরিবার-জাতির জন্য ক্ষতিকর ন্যাক্কারজনক পাপাচার হিসেবে দেখা হতো। এনলাইটেনমেন্ট-এর পর নৈতিকতা-আইনের মানদণ্ড হিসেবে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করল ইউরোপ (morality-based model), আর গ্রহণ করল রোমান স্কেল 'সম্মতি'-কে (consent-based model)। এরপর ব্যভিচার আর অপরাধ হিসেবে রইল না, হয়ে গেল মানবাধিকার। সেই হিসেবে তারা ব্যভিচারকে বৈধ এবং ধর্ষণকে অবৈধ সাব্যস্ত করে। এরপর সমকাম-ও বৈধ হয়ে গেল 'সম্মতি'র মারপ্যাঁচে।
- নেক্সট... পশ্চিমা যৌন বিজ্ঞানের পুরোধা John Money, Ph.D. ডাচ শিশুকাম জার্নাল PAIDIKA-তে সাক্ষাৎকার দেন :

  > " বয়স্ক পুরুষ আর ছোট বালকের যৌন সহবাস গঠনমূলক হতে পারে, যদি উভয়ের সম্মতি থাকে। [৩২৯]

  তিনি আরও বলেন :

  > " আমাকে যদি এমন ঘটনা দেখানো হয়, যেখানে ১০/১১ বছরের বালক ২০/৩০ বছরের পুরুষের প্রতি যৌন-আকর্ষণ বোধ করছে, আর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে, সম্পূর্ণ মিউচুয়ালি; তাহলে আমি একে কোনোভাবেই অস্বাভাবিক বলব না। [৩৩০]

---

[৩২৯] 'If it [man-boy sexual contact] is consensual, it can be constructive'. https://www.josephnicolosi.com/collection/psych-association-loses-credibility-say-insiders

[৩৩০] 'If I were to see the case of a boy aged ten or eleven who's intensely erotically attracted

তাহলে শিশু-সমকাম এবং শিশুকামের পক্ষে যুক্তিও এই 'সম্মতি'।

- নেক্সট... সেক্সোলজিস্ট Hani Miletski দাবি করেছেন : এমনকি জন্তুরাও যৌনসম্মতি দানে সক্ষম, তাদের নিজেদের মতো করে (Miltski, 1999)। যেমন কুকুররা লেজ নাড়ে। মালিক বুঝতে পারে তার সম্মতির ইশারা।

- Princeton University-র Professor of Bioethics অস্ট্রেলীয় দার্শনিক Peter Singer তার *Heavy Petting* আর্টিকেলে বলেন :

> " প্রাণীকে আঘাত না করলে বা ক্ষতি না করলে প্রাণীর সাথে যৌনতা খারাপ কিছু না, যদি উভয়েই ব্যাপারটা এনজয় করে। [৩৩১]

পশুকামীদের সংগঠন ZETA-র চেয়ারম্যান Michael Kiok জানিয়েছেন, 'স্রেফ একটা নীতি-মূল্যবোধ কখনও আইন হতে পারে না। পশুকামের বিরুদ্ধে আইন করার চেষ্টা করলে আমরাও আইনী লড়াই চালাব।' খবর *Daily Mail* এর। [৩৩২]

যত যৌন-স্বেচ্ছাচারিতা, সবই বৈধ করা যায়, সবকিছুর পক্ষেই চ্যালেঞ্জ করা যায় 'সম্মতি'-কে মানদণ্ড ধরলে। ব্যভিচার > সমকাম > শিশু-সমকাম > পশুকাম > অজাচার > ... ... > ∞. সম্মতির পাগলা ঘোড়া কোথায় গিয়ে থামবে কেউ জানে না।

সমস্যা ২

সম্মতির এই উচ্চতরল ও স্বেচ্ছাচারী মানদণ্ড ধ্রুব কি না, পুরো দুনিয়া মানতে বাধ্য কি না, এমন ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাওয়া মাপকাঠিকে 'অপরাধ' নির্ণয়ের মতো নাজুক ক্ষেত্রে ব্যভার করা উচিত কিনা, সেটা আগে আলোচনা করে নেয়া প্রয়োজন। Yale University-র জেন্ডার স্টাডিজের প্রোফেসর Joseph Fischel বলছেন:

> " সম্মতি ব্যাপারটাই Flimsy (যুক্তিহীন, দৃঢ়তাহীন, লগবগে)। 'যৌনতার ক্ষেত্রে ন্যায়-নির্ণয়'-এর যে দায়িত্ব আইন বা সমাজ একে দিয়েছে, তা সব এ পালন করতে পারে না। আইনগতভাবে সম্মতিভিত্তিক সম্পর্কের ভিতরেও এমন মিলন

---

toward a man in his twenties or thirties, if the relationship is totally mutual, and the bonding is genuinely totally mutual...then I would not call it pathological in any way.'

Interview: John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol. 2, no. 3, p. 5.

[৩৩১] Singer Peter. Heavy Petting, Nerve, 2001.

[৩৩২] Matt Blake (1 July 2013) Bestiality brothels are 'spreading through Germany', Dailymail.

হতে পারে যা ক্ষতিকর, তিক্ত কিংবা অপরাধবোধে জর্জরিত। আবার আইনত সম্মতিহীন যৌনসম্পর্কেও এমন মিলন হতে পারে, যা ফর্মেটিভ (ব্যক্তিত্ব গঠন করে), ট্রান্সফর্মেটিভ (ব্যক্তিত্ব বদলে দেয়), ভাল, দারুণ, ওকে কিংবা একেবারেই সমস্যাজনক না। যেমন: দু'জন অপ্রাপ্তবয়স্ক, বা প্রাপ্তবয়স্ক-অপ্রাপ্তবয়স্ক মিলন।[৩৩৩]

রোমান আইন অনুসারে *volenti non fit injuria* (to a willing person, no injury is done.); যে কাজ ভিকটিমের সম্মতি নিয়ে করা হয়, তা ক্ষতি না। সুতরাং যেহেতু তা কারও ক্ষতি করছে না, সুতরাং তা আইনত অপরাধ না; নৈতিকভাবে মন্দ না, অবৈধ না। তাই কি? যেখানে সম্মতি আছে, সেখানে ক্ষতি নেই? সম্মতি নেই, আবার ক্ষতিও নেই এমন অনেক ক্ষেত্রও তো রয়েছে। চলুন দেখা যাক।

ক. সম্মতির মাঝেও ক্ষতি আছে

- এইডসের টিকা দেয়া সমকামীদের মধ্য থেকে প্রতি বছর ৪০ হাজার নতুন এইডস রোগী তৈরি করছে [৩৩৪]। City University of New York-এর ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট প্রোফেসর Margaret Rosario তাঁর স্টাডিতে বলেন [৩৩৫], নিজেদের যারা LGBT দাবি করে, সেসব তরুণ-তরুণীদের মাঝে—
  - high risk sexual behaviors-এ অংশ নেওয়া
  - early age for sexual initiation
  - high numbers of sexual partners
  - exchanging sex for goods
  - unprotected sexual activity-তে লিপ্ত হতে দেখা যায় (Rosario, et al., 1999).

---

[৩৩৩] Joseph Fischel, Sex and Harm in the Age of Consent, p10 associate professor of women's, gender and sexuality studies at Yale University.

[৩৩৪] ইউরোপের ১,২৭,৭৯২ জন গে-পুরুষের ৯৪% এন্টি-রেট্রোভাইরাল প্রোফাইল্যাক্সিস নিচ্ছে। গে, লেসবিয়ানদের জন্য আলাদা কেয়ার আলাদা ডিপার্টমেন্ট করার পরও বছরে ৩০-৪০ হাজার এইডস কেস সমকামীদের ভিতর থেকে।

TECHNICAL REPORT, EMIS-2017 The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey, Key findings from 50 countries.

[৩৩৫] Rosario, Margaret, Meyer-Bahlburg, Heino F.L., Hunter, Joyce and Gwadz, Marya. (1999). "Sexual Risk Behaviors of Gay, Lesbian, and Bisexual Youths In New York City: Prevalence and Correlates". AIDS Education and Prevention. Vol. 11, No.6, Pg. 476-496.

- মাদকের থাবায় ৩১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ ধুঁকছে [৩৩৬]। মাদকাসক্তকে জোর করে দেয়া হয় না। সে নিজেই স্বেচ্ছায় নেয়।

- সম্মতির ভিত্তিতে যে ব্যভিচার বা লিভটুগেদার কালচার, তার ফলে [৩৩৭]:

  ➡ ব্যভিচারের কারণে ৪০% বিবাহিত পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। রিসার্চ জানাচ্ছে, মোট ডিভোর্সীর ৪২%-এরই বিয়ে থাকা অবস্থায় ব্যভিচারের ইতিহাস আছে (Janus, 1993)। এজন্যই আমেরিকার ৫০% ১ম বিয়ে বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয় (Bramlett & Mosher, 2001)।

  ➡ আর ব্যভিচারের ভিত্তিতে গঠিত লিভ-টুগেদার পরিবারের ৬৫%-ই ভেঙে যাচ্ছে। (Osborne, 2007)।

ফলে...

➡ ব্রিটেনের ১/৩ বাচ্চা ও আমেরিকার ৫০% বাচ্চা ব্রোকেন ফ্যামিলিতে বড় হতে বড় হতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ৫০% বেশি, সাইকোলজিস্টের সাহায্য প্রয়োজন পড়ে ৩০০% বেশি, আত্মহত্যা-প্রচেষ্টার সম্ভাবনা দ্বিগুণ, স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ, কারাগারে যাবার সম্ভাবনা নর্মাল পরিবারের চেয়ে ১২ গুণ বেশি।

➡ ডিভোর্সী পুরুষের আত্মহত্যার হার স্বাভাবিক পুরুষের চেয়ে আড়াই গুণ

➡ লিভ-টুগেদারে যারা যায়, এইসব 'ভঙ্গুর' পরিবারের বাবা-মা'দের—

– কমিটমেন্ট ভাঙার সম্ভাবনা বেশি

– দারিদ্র্য বেশি

– হতাশায় ভোগার হার বেশি

– মাদকাসক্তির হার বেশি

– জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সম্মতি থাকলেই সেখানে শারীরিক-মানসিক-সামাজিক ক্ষতি নেই; পুরোপুরি ভুল। এই ভুল নৈতিকতা কীভাবে জোর করে চাপানো যায় পুরো দুনিয়ায়?

---

[৩৩৬] United Nations Office on Drugs and Crime এর ২০১৫ সালের হিসাব, WORLD DRUG REPORT 2017

[৩৩৭] রেফারেন্সের জন্য লেখকের রচিত 'মানসাঙ্ক' বইটির পরিশিষ্ট ২ দেখুন।

খ. সম্মতি নেই, কিন্তু কোনো ক্ষতিও নেই

- মৃত লাশের সাথে সঙ্গম। এখানে কারও কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কিন্তু কল্যাণ অর্জন হচ্ছে, সুখ হচ্ছে।

- মেয়েদের বাথরুমের ভিডিও চেহারা ব্লার করে ছড়িয়ে দেয়া মেয়েদেরও ক্ষতি হল না, ওদিকে বহু দর্শকামীর (voyeurism) সুখ লাভ হচ্ছে।

- বাজার থেকে মৃত মুরগী কিনে এনে সেক্স করা। কারও ক্ষতি না করেই সুখ লাভ হচ্ছে।

তাহলে পাঠক বুঝা যাচ্ছে যে, এই 'সম্মতি'র স্কেলটা ধ্রুবসত্য না বা প্রশ্নের উর্ধ্বে না। যেভাবে একে মহাপবিত্র,অলঙ্ঘনীয় ও কাণ্ডজ্ঞান বলে উপস্থাপন করা হচ্ছে তা মোটেই যৌক্তিক নয়। **সম্মতি থাকলেও কোনো কাজ ক্ষতিকর হতে পারে, সুতরাং অবৈধ সাব্যস্ত করা যেতে পারে। আবার সম্মতি নেই এমন কোনো কাজেও সর্বোচ্চ কল্যাণ অর্জিত হতে পারে কারও বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে।**... এরকম একটা ক্রটিপূর্ণ স্কেলকে নৈতিকতার মাপকাঠি ধরে আরেকজনের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন কীভাবে যৌক্তিক?

তার মানে ইসলাম দাসীকে ধর্ষণ সমর্থন করে?

প্রশ্নকারীকে আগে ক্লিয়ার করতে হবে: ধর্ষণ কী? অপরাধের সংজ্ঞা ধোঁয়াশাপূর্ণ হতে পারে না। অপরাধের সংজ্ঞা অস্পষ্ট হতে পারে না। অপরাধের সংজ্ঞা যদি হয় অস্পষ্ট, তাহলে অপরাধী ফসকে যাবে, নিরপরাধ ফেঁসে যাবে।

আধুনিক সংজ্ঞা

'সম্মতি' নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার আরেক নজির হল ধর্ষণের সংজ্ঞায়নে সম্মতির ধারণা। মিলনে সম্মতি না থাকলেই ধর্ষণ, ঠিক আছে। **কিন্তু সম্মতি যে নেই, এর প্রমাণ কী?** সুইডেনের মতো কিছু অত্যাধুনিক দেশে ২০১৮ সালের নতুন আইনে বলা হয়েছে : *জোর করুক বা না করুক, হুমকি দিক বা না দিক, মনে মনে সম্মতি নেই, এমন সহবাস মানেই ধর্ষণ। ভিকটিমের পক্ষ থেকে শারীরিক প্রতিরোধ থাকা জরুরি না, এমনকি মুখে 'না' বলাও জরুরি না।* (sex without consent is rape, even when there are no threats or force involved.) [৩৩৮]

[৩৩৮] Press release from Ministry of Justice (26 April 2018). Consent – the basic requirement

সমস্যা ৩

জোর করতে হয়নি, নারীর পক্ষ থেকে শারীরিক কোনো প্রতিরোধও নেই। এরপরও একে ধর্ষণ বলা হচ্ছে, কেননা মনে মনে তার সায় নেই। বা যদি ঘটনার ৬ মাস পর মেয়েটি বলে আমার সায় ছিল না, তা প্রমাণও করার প্রয়োজন নেই। **নারী প্রমাণের দায়বদ্ধতার উর্ধ্বে?** সুইডেনে এক লোকের ৮ মাসের জেল হয়েছে। তার অপরাধ হল:

- সে আর ভিকটিম একই বিছানায় শুয়েছে। ভিকটিম বলে দিয়েছে: সে সেক্সে আগ্রহী নয়।
- একই বিছানায় শোবার সময় ভিকটিম কেবল অন্তর্বাস পরিহিতা ছিল।
- লোকটি এক পর্যায়ে সেক্স ইনিশিয়েট করে (ফোরপ্লে)
- এসময় ভিকটিম নীরব ছিল, কোনো কথা বলেনি, প্রতিরোধও করেনি। কোর্টে সে জানিয়েছে, আমি নিথর-বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম।
- আসামী বলছে, আমি আসলে ভেবেছি ঘুমন্ত বলে সাড়া দিচ্ছে না। পরে মনে হয়েছে ভিকটিমের শারীরিক সায় আছে।
- এক পর্যায়ে আসামী বুঝতে পারে ভিকটিমের সায় নেই, সে সেক্স বন্ধ করে দেয়।

এই নতুন অপরাধের নাম Negligent Rape, এর দায়ে আসামীর ৮ মাস জেল ও অন্যান্য অপরাধ মিলেঝিলে ২ বছর ৩ মাস জেল হয়েছে। সুইডিশ ইংরেজি পত্রিকা The Local জানাচ্ছে, নারীবাদী-মানবাধিকার এক্টিভিস্টরা এই আইনে খুব খুশি হলেও, Sweden's Council on Legislation জানিয়েছে: আইনটি খুবই ধোঁয়াশাপূর্ণ। [৩৩৯] মানে নারী যদি বলে আমার সায় ছিল না, তাহলেই বয়ফ্রেন্ড শ্যাষ, **নারীর অপ্রামাণ্য স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ রয়েছে এই 'সম্মতি'র মারপ্যাঁচে।** অত্যন্ত তরল ও অপব্যবহারযোগ্য একটি সংজ্ঞা। Yale University-র প্রফেসর Joseph J Fischel বলেন:

> “
> যদিও এখন আওয়াজ তোলা হচ্ছে 'consent is sexy', বাস্তবে গিয়ে যৌনভাবপ্রকাশ, ভুলবার্তা দেয়া কিংবা নিজেদের ব্যাপারে সঙ্গীর কাছে সত্যগোপন- এসব ক্ষেত্রে সম্মতি তেমন কাজের জিনিস না। সম্মতি-র কেবল পাল্লাই সীমিত তা না, এটা যথেষ্টও না, প্রয়োগযোগ্যতাও কম। ... সেদিন এক ডানপন্থী উপস্থাপক

---

of new sexual offence legislation. Government Offices of Sweden.

Sweden approves new law recognising sex without consent as rape, BBC [24 May 2018]

[৩৩৯] Catherine Edwards (12 July 2019), 'Negligent rape': Has Sweden's sexual consent law led to change? The Local

বলছিল: #MeToo আন্দোলনের একটা অংশ বাজে সেক্স আর ধর্ষণকে গুলিয়ে ফেলেছে। অথচ ধর্ষণ ছাড়াও বাজে যৌন অভিজ্ঞতা হতে পারে। এগুলো মূলত sexual politics. [৩৪০]

বিশেষ করে যৌনসম্মতি জিনিসটা তো অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ধোঁয়াশাময়। শুনুন কানাডার ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির আইনের অধ্যাপক Heidi Matthews-এর মুখে:

> “ মনে হয়, আমরা 'সম্মতি'র যুগে বাস করছি। সামাজিকভাবে কাম্য এবং আইনত বৈধ সেক্স কাকে বলা হবে, তার মাপকাঠি হওয়া উচিত 'সম্মতি'— এই ধারণাটা বাস্তবতা থেকে বহুদূরে। কারণ সেক্স কী জিনিস, এটা ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দেয়। নারীবাদীরাও স্বীকার করে যে, সম্মতি থাকলে যৌনকামনা আছে, সম্মতি নাই মানে যৌনকামনা নাই—চিন্তাটা বাস্তব না। সেক্স সেশনের ভিতরে-বাইরে সম্মতির ব্যাপারটা খুবই জটিল ও আগে থেকে বলা যায় না (শুরুতে প্রকাশ না পেলেও সেক্সের মাঝে সম্মতি তৈরি হতে পারে)। একই সেক্স সেশনে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতিও হতে পারে: 'অপমানজনক তবে উত্তেজনাকর' মনে হতে পারে। কখনও বিরক্তিকর কখনও তৃপ্তিদায়ক মনে হতে পারে। কখনও ভীতিকর কিন্তু 'বার বার করতে ইচ্ছে করছে' এমন মনে হতে পারে। আরও যদি বলি, সম্মতির সেক্স মানেই আমি এখন চাচ্ছি, তা না। আবার অসম্মতির সেক্স মানেই আমি চাচ্ছি না, তা-ও না। (What is more, consensual sex is not the same thing as wanted sex; conversely, non-consensual sex is not the same as unwanted sex.)
>
> “ পুরুষের চেয়ে নারীর যৌন-আনন্দকে প্রায়ই বেশ জটিল ও কম অনুমানযোগ্য বলে মনে করা হয়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এটাই নিয়মের মত যে, নারী কী চায়, এবং কীভাবে সেই চাওয়াটা প্রকাশ করা উচিত, এটা তার নিজের কাছেই অস্পষ্ট থাকে। কখনও কখনও আমরা কী চাই, তা আগেই বুঝা যায় না। কামনা ও তৃপ্তির বিস্তারিত ব্যাপারটা প্রায়ই সেক্স চলমান সময়ে আবিষ্কৃত হয় বা তৈরি করে নিতে হয়। সম্মতি-ইচ্ছার মাধ্যমে প্রকাশের চেয়ে দুজনের যৌন-আচরণের ভিতর দিয়েই বরং স্বাধীনতাটা প্রকাশ পায়। [৩৪১]
>
> “ একটা সেক্স অপরাধ নাকি অপরাধ না, এই পার্থক্য করতে সম্মতি-র ধারণাটা আইন ব্যবহার করে। কিন্তু আমরা কীভাবে জানবো যে, সম্মতি আছে নাকি নেই? অনুমতি আছে নাকি নাই, এই দু'য়ের মাঝে যে দোলাচল (Liminal trust) সেখানে উভয়েই যৌনতার সবচেয়ে নির্ভুল উপলব্ধিটা পেতে পারে।

---

[৩৪০] Joseph J Fischel (23 October 2018) What do we consent to when we consent to sex? Aeon
[৩৪১] Heidi Matthews (6 March 2018) Aeon

ধর্ষণের আগের সংজ্ঞা

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি- ১৮৬০ এর ৩৭৫ ধারায় ধর্ষণের সংজ্ঞা দেওয়া আছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর-সহ আরও বহু দেশ যারা ব্রিটিশপ্রণীত এই 'দণ্ডবিধি-১৮৬০' আত্মীকরণ করে নিয়েছে, সে সব দেশে ধর্ষণের সংজ্ঞা এটাই।[৩৪২] সংজ্ঞাটা বুঝে নিতে হবে। কেননা আমাদের পরবর্তী বিভিন্ন আলোচনায় এটা কাজে আসবে।

> কোনো পুরুষ (A man) 'ধর্ষণ' করেছে বলা হবে, যদি নিচের ৫টা শর্তের যে-কোনো ১টায় পড়ে, যদি সে এমনভাবে কোনো নারীর (a woman) সাথে যৌনসঙ্গম করে (sexual intercourse) :
>
> প্রথমত, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে (Against her will)
>
> দ্বিতীয়ত, তার সম্মতি ছাড়া (Without her consent)
>
> তৃতীয়ত, সম্মতি আছে। কিন্তু সম্মতি নেওয়া হয়েছে মৃত্যুভয় দেখিয়ে বা আহত করার হুমকির মুখে।
>
> চতুর্থত, সম্মতি আছে। কিন্তু মহিলা তাকে নিজ বৈধ স্বামী মনে করে ভুলে সম্মতি দিয়েছে। আর লোকটা কিন্তু ঠিকই জানে যে, সে তার স্বামী না।
>
> পঞ্চমত, ১৪ বছরের নিচের নারী, তার সম্মতি থাকুক আর না-ই থাকুক।
>
> ব্যাখ্যা : লিঙ্গ প্রবেশ করানোই (Penetration) ধর্ষণ প্রমাণে যথেষ্ট।
>
> ব্যতিক্রম : স্ত্রী যদি ১৩ বছরের নিচে না হয়, তবে স্বামী কর্তৃক যৌনসঙ্গম ধর্ষণ নয়।

প্রথম ২টি শর্ত লক্ষ্য করুন। সামনে আমাদের লাগবে।
প্রথমত, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে (Against her will)
দ্বিতীয়ত, তার সম্মতি ছাড়া (Without her consent)

[৩৪২] Sec# 375 (Of Rape), CHAPTER XVI (OF OFFENCES AFFECTING THE HUMAN BODY), The Penal Code, 1860 (ACT NO. XLV Of 1860) [bdlaws.minlaw.gov.bd]

সমস্যা ৪

সংজ্ঞাগুলো অত্যন্ত ধোঁয়াশাপূর্ণ। আইনের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে: ইচ্ছে হল আকাঙ্ক্ষা। আর সম্মতি হল আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ (মৌখিক বা অমৌখিক)। তার মানে ৫টা অবস্থা হতে পারে—

	ইচ্ছা / আকাঙ্ক্ষা	সম্মতি / আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ (মৌখিক/ অমৌখিক)	প্রতিরোধ	জোর করা
১	আছে	আছে	নাই	নাই
২	নাই	আছে	নাই	নাই
৩	আছে	নাই	নাই	নাই
৪	নাই	নাই	নাই	নাই
৫	নাই	নাই	আছে	আছে

প্রথম ৪টা ক্ষেত্রেই যে 'জোর করা' ব্যাপারটা থাকবে তা নয়। সুতরাং জোর করা আরেকটা ভিন্ন পয়েন্ট। ইচ্ছের সাথেই অমৌখিক সম্মতি থাকে। আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ না থাকলেও আকাঙ্ক্ষা যে নেই, তার কী প্রমাণ? অসম্মতিও জানানো হয়নি, আবার ইচ্ছাও প্রকাশ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে ধর্ষণ বলাটা কতটুকু যুক্তিগ্রাহ্য। ৫ নং কেস নিশ্চিত ধর্ষণ, কিন্তু ৪ নং কেস ধর্ষণ কিনা, এটা কীভাবে নির্ধারণ হবে? নারীর মুখের কথায়? কীভাবে প্রমাণ হবে যে তার সম্মতি আসলেই ছিলো না? এখানে ইসলামের সংজ্ঞায়ন খুব ক্লিয়ার-কাট। ৪ নং ক্ষেত্রে ধর্ষণ হবে তখনই, যদি প্রতিরোধ না করার কারণ হয় ভীতি প্রদর্শন। ভীতি প্রদর্শনের দরুন নারী যদি প্রতিরোধ না করে, তবে নারী অপরাধী না। কোনো ভয়ভীতি নেই, কিচ্ছু নেই, এরপরও নারী প্রতিরোধের চেষ্টা করেনি মানে ডাল মে কুছ কালা হ্যায় [৩৪৩]। সম্মতির নামে নারীকে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ করে দেয়া কোনো যৌক্তিক আইনের ভিত্তি হতে পারে না।

বাস্তবে, ধর্ষণ (৫ নং ক্ষেত্রটা) অনেকগুলো অপরাধের সমষ্টি। ধর্ষিতার মেডিকেল পরীক্ষায় সেটা স্পষ্ট বুঝা যায়। জোর করে সঙ্গম, বাধার দরুণ শারীরিক প্রহার, চড়-থাপ্পড়-জখম, বাধা দেবার চেষ্টার (ক্রস লেগ) বিপরীতে প্রচণ্ড আঘাত করা, যোনিপথ জখম, দংশন— এই অপরাধ কয়টির সম্মিলিত রূপ হল ধর্ষণ। নিজ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বাধা থাকবে দুর্বল-সাময়িক; ফলে সহবাসে অসম্মতি থাকতে পারে, তবে প্রতিরক্ষা থাকবে না (৪ নং)। ফলে ধর্ষণের পাশবিকতা বা ভায়োলেন্স এখানে অনুপস্থিত।

---

[৩৪৩] ইসলামে ধর্ষণ (যিনা বিল জবর) নিয়ে আলাপ (পরিশিষ্ট ৩)

অসম্মতিতে সহবাস (৪) আর ধর্ষণ (৫) বাস্তবে এক জিনিস না, বাস্তবতা এক না। এক্টিভিস্টদের জোরাজুরিতে একটা ধোঁয়াশাপূর্ণ আইন করে দিলেই বাস্তবতা বদলে যায় না।

নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাসটা অসম্মতিতেও হতে পারে, কেননা ইসলামে 'নিকাহ' ধারণায় 'সঙ্গম'-ই কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য। একজন স্বাধীন নারীর যৌনাঙ্গ একজন পুরুষের জন্য বৈধ হবার আইনী ভিত্তি— নিকাহ। পশ্চিমা সভ্যতায় এই ভিত্তি হলো 'সম্মতি', আর আমাদের হলো নিকাহ। যৌনমিলন সম্ভব না হলে, নিকাহ (union) নিরর্থক। নিকাহের মাহরের দ্বারা স্ত্রীর যৌনসম্মতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অধিকাংশ আলিমের মতে (হাম্বলি ছাড়া বাকিদের মতে), মাহর নেবার পর যদি স্ত্রী সহবাসে অসম্মতি জানায় (শারঈ কারণ ছাড়া), তাহলে স্বামী মাহর ফেরত চাইতে পারবে। [৩৪৪] এবং স্ত্রী ভরণপোষণ পাবার অধিকার হারাবে। [৩৪৫] **সুতরাং 'আইনত বৈধ যৌনমিলনে অনিচ্ছায়' স্ত্রীর অবস্থান হবে ৪ নং, যা কখনই ধর্ষণ (৫ নং) নয়।** ৪ নং এবং ৫ নং কখনই এক নয়, ইনসাফের দাবি এটা না।

এজন্য পরিভাষার গুরুত্ব এত ব্যাপক। পশ্চিমা marriage বা বিবাহে ধর্ষণ হতে পারে, আমাদের 'নিকাহ'-তে ধর্ষণ বলে কিছু নেই। আমরা মুসলিমরা 'marriage' বা বিয়ে করি না, আমরা নিকাহ করি। ইসলামের বিবাহ-দর্শনে (নিকাহ) 'বৈবাহিক ধর্ষণ'-এর কোনো স্থান নেই। এটা কোনো খেয়ালখুশি না যে, যা মনে চাইল তা-ই করলাম। একে বলে 'আকদ' (عَقْد), যার অর্থ চুক্তি, মৈক্য, বন্ধন ইত্যাদি। যে-কোনো চুক্তির ফলে উভয় পক্ষের পরস্পর দায়বদ্ধতা থাকে, পরস্পরের উপর অধিকার থাকে, কর্তব্য থাকে, চুক্তি পূরণের প্রতিশ্রুতি থাকে, চুক্তি রক্ষার চেষ্টা থাকে। যখন খুশি বিনা উস্কানিতে চুক্তি বাতিল করে দেওয়া গেলে, তা কোনো চুক্তিই নয়। স্বামীর সহবাসের অধিকার স্ত্রী খামোখাই হরণ করতে পারে না। ইসলাম স্ত্রীকেও স্বামীর উপর জুলুম করতে দেয় না (৫ নং), স্বামীকেও স্ত্রীর উপর জুলুম করতে দেয় না। স্ত্রী যদি মনে করে স্বামী তার উপর জুলুম করেছে, সে জুলুমের বিচার চাইতে পারবে, ধর্ষণের নয় (যেহেতু এটা যিনা না)। কেননা স্বামী দ্বারা ধর্ষণ হতে পারে না, ইসলামের ডেফিনেশনে। স্বামী দ্বারা ৫ নং হল জুলুম, স্বামী দ্বারা ৪ নং কোনো অপরাধ না। লিবারেল সংজ্ঞায় 'ধর্ষণ' মেনে নিতে ইসলাম বাধ্য নয়, এগুলো প্রশ্নের ঊর্ধ্বে না, স্বার্থ-জুলুমের ঊর্ধ্বে না।

---

[৩৪৪] আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ৪/১৪২-১৪৫

[৩৪৫] হিদায়াহ, ২/৫২।

আর স্বাভাবিক তো এটাই যে, দাসীর ক্ষেত্রেও তাই হবে। যেহেতু এটা আইনত বৈধ যৌনসম্পর্ক (নট যিনা), সুতরাং দাসীর সর্বোচ্চ অবস্থান হবে ৪ নং। দাসীকে যদি মালিক বুঝায় যে, এটা বৈধ হালাল সম্পর্ক, পজিটিভ দিকগুলো আলোচনা করে নেয়; দাসী অবশ্যই নিজের ভালো থাকার স্বার্থেই দৈহিক প্রতিরোধ প্রত্যাহার করে নেবে মনে অসম্মতি থাকলেও (৪ নং)। ফলে **স্ত্রী/দাসীর ক্ষেত্রে 'ধর্ষণ' শব্দটাই অযথার্থ, অবাস্তব। কেননা এখানে ধর্ষণের মতো তার উপর পাশবিক নির্যাতনের ব্যাপার ঘটছে না।** কিছুটা জোরাজুরি থাকতে পারে, যা নির্যাতন-প্রহার জাতীয় নয়। প্রহার করে সহবাস করা যাবে না। স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আছে হাদিসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন :

> “ দাস-দাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের খুশি করে তাদেরকে তোমাদের খানা ও পোশাক থেকে খাওয়াও এবং পরাও। আর যারা তোমাদের খুশি করে না তাদেরকে বিক্রি করে দাও। আল্লাহর সৃষ্টজীবকে কষ্ট দিও না। [৩৪৬]

অর্থাৎ সে এই মালিককে পছন্দ না করলে, বিক্রি করার পর হয়তো নতুন মালিককে পছন্দ করবে। যদি কেউ এমন করে তবে,

– কাফ্ফারা স্বরূপ তাকে মুক্ত করে দিতে হবে
– মালিক যুলম করলে সে বিচারকের কাছে নালিশও করতে পারবে।

আমাদের পয়েন্ট হল : অসম্মতি মানেই ধর্ষণ-নির্যাতন নয়। 'সম্মতি'র মত একটা তরল অপব্যবহারযোগ্য লিবারেল ধারণার ভিত্তিতে ইসলাম ভালোমন্দ ঠিক করে না। ইসলামে ভালোমন্দ ঠিক হয় আল্লাহর বুঝের দ্বারা। **ইসলাম যা হালাল করেছে, তা একপক্ষের অসম্মতির দ্বারা অবৈধ হয় না। ইসলাম যাকে হারাম করেছে তা দুইপক্ষের কেন, সকল পক্ষের সম্মতির দ্বারাও বৈধ হয় না।** সুতরাং আমাদের শুরুর প্রস্তাবনায় ফিরে যাই: ইসলাম তার লক্ষ্য অর্জনে দাসপ্রথার পরাধীনতাকে যেভাবে ব্যবহার করেছে, একই ভাবে সহবাসের সুফলগুলোকে ব্যবহার করেছে, এর কুফলগুলো দূরীভূত করেছে। মাঝখান দিয়ে পূরণ হয়েছে ইসলামের কল্যাণময় উদ্দেশ্য। বলেন কী? সহবাসের মাঝেও কল্যাণ?

যৌনশ্রম

খুব আশ্চর্যজনকভাবে যারা পতিতাবৃত্তিকে একটা বৈধ পেশা হিসেবে, যৌনশ্রমকে একটা 'সার্ভিস' বা 'সেবা' হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করতে উচ্চকণ্ঠ, তারাই ইসলামের

---

[৩৪৬] সহীহ মুসলিম ১৬৬১

'দক্ষিণহস্ত মালিকানা' বিধানে এসে তাদের নিজেদের দাবিই বেমালুম ভুলে যায়। **যৌনশ্রম যদি শ্রমই হবে, আর দাসপ্রথা মানে যদি বাধ্যশ্রমই হবে, তাহলে যৌন দাসত্বের উপর আলাদা করে নৈতিকতা আরোপ করার কী আছে? দাসত্বে অন্যান্য শ্রমে** যেমন বাধ্যতা আরোপ করা হয়, তেমনিভাবে যৌনশ্রমেও বাধ্যতা থাকবে। আলাদা করে একে 'অনৈতিক' প্রমাণের চেষ্টা কেন? **আর শ্রমের উদ্দেশ্য যদি ভালো থাকা (wellbeing)-ই হয়, তবে আর এতো কথা আসছে কেন? কী সমস্যা যদি যৌনশ্রমের দ্বারা দাসীদের জীবনমান উন্নত হয়, আপনারা তো এটাকে শ্রমই মনে করেন, না কি?** আমেরিকান ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপিকা Elke Stockreiter বলেন:

> যদিও সব দাসীই উপপত্নী ছিল না, তবে সব দাসীরই মুক্তির এই রাস্তাটা খোলা ছিল যে, মনিব তার যৌনশ্রম থেকে উপকৃত হবে, আর দাসীর মুক্তি ত্বরান্বিত হবে। [all slave women had the potential to access this path out of bondage, since masters may avail themselves of their unwed domestic slaves' sexual labour] [৩৪৭]

সুইডেনের গটেনবার্গ ইউনিভার্সিটির আরবি সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক Pernilla Myrne বলছেন:

> মনিবের উপপত্নী হিসেবে যে দাসীগুলোকে বেছে নেয়া হত, তারা সচরাচর বেশি মর্যাদা, বেশি নিরাপত্তা এবং বৈষয়িক সুযোগসুবিধা পেত; কিছুদিনের জন্য হলেও। আর যদি সে মনিবের সন্তান জিন্ম দেয় আর মনিব স্বীকার পিতৃত্ব স্বীকার করে (হানাফি ফিকহ মতে পিতা স্বীকার করতে হবে), দাসীটি তখন 'উম্মে ওয়ালাদ' নামক আরও সুবিধাজনক অবস্থান অর্জন করে। **সেক্ষেত্রে তার প্রাত্যহিক জীবন অন্য স্বাধীনা স্ত্রীর চেয়ে খুব একটা ভিন্ন হয় না,** মর্যাদা কিছুটা কম থাকে স্বাধীনা স্ত্রীদের চেয়ে।... **মনিব ছাড়া অন্য যে কারও কাছে বেপর্দা হওয়া ও যৌন-সুবিধা দেয়া থেকে ইসলামী আইন দাসীদের রক্ষা করতো। আর মনিবও তাদেরকে খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয় দিতে এবং নির্যাতন না করতে বাধ্য ছিল।** [৩৪৮]

যেহেতু ওনাদের চোখে যৌনসেবা একটা শ্রম, আর শ্রমের উদ্দেশ্য 'ভালো থাকা', সুতরাং ওনাদের জবাব হয়ে গেছে। কুল্লু খালাস। প্রতিটি মানবরচিত চিন্তাধারাই পরস্পরবিরোধিতায় পরিপূর্ণ। ইসলাম যৌনতাকে কোনো শ্রম হিসেবে দেখে না। যৌনতা ইসলামের চোখে অন্যান্য চাহিদার মতোই একটি মানবীয় শারীরবৃত্তীয় চাহিদা,

[৩৪৭] Elke E. Stockreiter, Child Marriage and Domestic Violence, p 138-158

[৩৪৮] Pernilla Myrne, Slaves for Pleasure in Arabic Sex and Slave Purchase Manuals from the Tenth to the Twelfth Centuries, Journal of Global Slavery 4 (2019) 196-225

যা একই সাথে পূরণও হতে হবে, আবার নিয়ন্ত্রণও হতে হবে। একটা সহবাসের সাথে জটিল আবেগিক বন্ধন, পরিবার গঠন, সন্তানের জন্য সুষ্ঠু বিকাশের পরিবেশ বজায় রাখা, সামাজিক দায়িত্ব, পরিবারে-পরিবারে গোত্রে-গোত্রে সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাকার নানান উদ্দেশ্য ইসলাম অর্জন করেছে। ইসলামের প্রতিটি বিধানই এমন, একটি বিধান একাধিক লক্ষ্য অর্জনে অংশ নেয়। আবার একাধিক বিধানের সামষ্টিক প্রয়োগে একটি লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জন হয়, একটা বুনটের মতো।
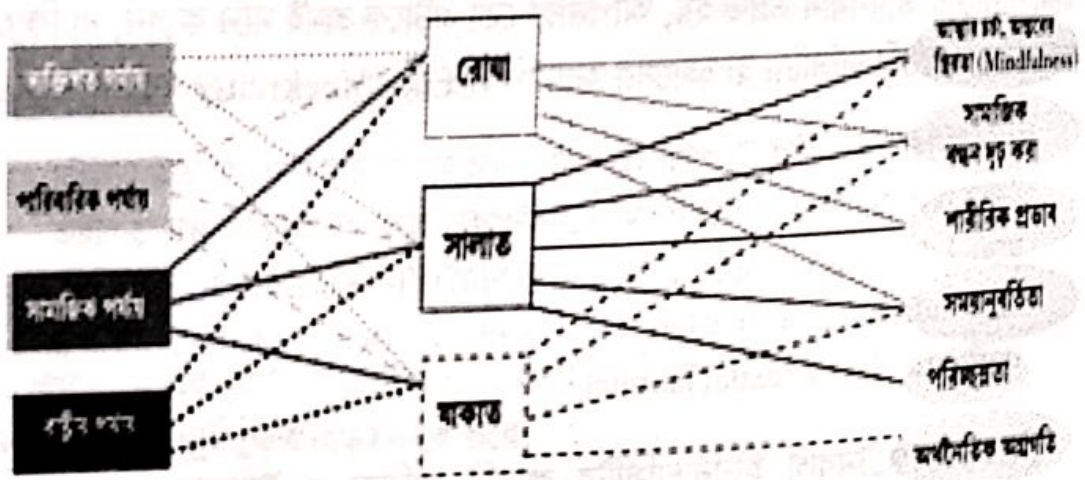
ইসলাম একটা বুনটের মতো
বিভিন্ন পর্যায় দিয়ে একটি বিধান বাস্তবায়ন করবে। একটি বিধান একাধিক উদ্দেশ্য পূরণে অংশ নেবে।
একটি উদ্দেশ্য পূর্ণতা পাবে একাধিক বিধানের সম্মিলিত ইফেক্টে।

সহবাসের মাঝে কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ছাড়াও আরও অনেক উপাদান রয়েছে, যা শরীর-মনে-চিন্তাচেতনায় প্রভাব ফেলে। শুরুতেই ইসলামের লক্ষ্য অধ্যায়ে আমরা ইসলামের মৌলিক লক্ষ্য হিসেবে বলেছিলাম 'কনভার্শন' এর পরিবেশ তৈরি। ইসলাম জোর করে কনভার্শন করে না, তবে জোর করে কনভার্শনের পরিবেশ তৈরি করে, যেমন স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে বা যুদ্ধের মাধ্যমে। এটা সব মতবাদই করে— সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিজম, লিবারেলিজম— সবাই। কিন্তু ইসলামের পার্থক্যটা হল, ইসলাম ব্যক্তিকে মতাদর্শ গ্রহণে জোর করে না, বরং পরিবেশে আনানোর প্রয়োজনে সকল বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে। লাস্টলি ইসলাম অন্তরে আকর্ষণ তৈরি করতে চায়, যাতে কেউ স্বেচ্ছায় ইসলামের ছায়াতলে আসার সিদ্ধান্তটা নিতে পারে।

সহবাসের মধ্য দিয়ে কল্যাণ: অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ

'সহবাসের মাঝে কল্যাণ' কথাটা বুঝার সবচেয়ে চমকপ্রদ বাস্তব উদাহরণ হল 'অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ'। বিয়ের পশ্চিমা ধারণায় পূর্বশর্ত হল বর-কনের বিবাহপূর্ব

ভালোবাসা (লাভ ম্যারেজ)। কিন্তু এখন পৃথিবীর অধিকাংশ বিয়ে হয় মা-বাবা বা ঘটকের মাধ্যমে (Mackay 2000, Mitchell 2004, Penn 2011) কীভাবে এসব বিয়েতে 'আগে বিয়ে, পরে ভালোবাসা' জন্মে সেটা পশ্চিমাদের কাছে এক বিস্ময়ের ব্যাপার। ব্যাপারটা তাদের আক্কেলে ধরে না বলে দেখবেন তারা এবং তাদের এদেশীয় গোলামরা অ্যারেঞ্জড ম্যারেজকেও যৌনদাসত্ব মনে করে। এদেশীয় নারীবাদীদের লেখাজোকায় প্রায়ই বিবাহ এবং অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ নিয়ে তাদের এলার্জি টের পাওয়া যায়। অ্যারেঞ্জড বিয়ের উপর রিসার্চের রেজাল্টগুলো মোটাদাগে এমন :

- **লাভ ম্যারেজে ভালোবাসা সময়ের সাথে কমতে থাকে, অ্যারেঞ্জড বিয়েতে সময়ের সাথে বাড়ে।** আলটিমেটলি এই ভালোবাসা অতিক্রম করে যায় লাভ ম্যারেজের ভালোবাসার লেভেলকে। (Gupta & Singh 1982)
- প্রেমের বিয়েতে শুরুতে যে পরিমাণ ভালোবাসা ছিল, ১৮ মাসে গিয়ে হয়ে গেছে অর্ধেক। আর অ্যারেঞ্জড বিয়েতে ভালোবাসা সময়ের সাথে বাড়তে থাকে। প্রেমের বিয়ের শুরুর পয়েন্টে যে ভালোবাসা, ৫ বছরে গিয়ে তাকে অতিক্রম করে ফেলে অ্যারেঞ্জড বিয়ে। ১০ বছরে গিয়ে ভালোবাসা হয় দ্বিগুণ শক্ত।[৩৪৯]
- **ভারতে অ্যারেঞ্জড বিয়েতে পরিতৃপ্তির লেভেল আমেরিকার লাভ ম্যারেজের চেয়ে বেশি** (Athappily 1988)
- **পরিতৃপ্তির লেভেল একই থাকলে দম্পতির একে অপরকে প্রতিদিন যত আবিষ্কার করতে থাকে ততই পরস্পরের ভালোবাসা বাড়তে থাকে, অ্যারেঞ্জড বিয়ের ক্ষেত্রে যেটা বেশি হয়** (Myers, Madathil & Tingle 2005)।

অ্যারেঞ্জড বিয়েগুলো ভালোবাসা থেকে হয় না, কিন্তু এরপর সময়ের সাথে ভালোবাসা তৈরি কীভাবে হয়, সেটা বুঝতে চেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।[৩৫০] ৩০ জন এমন বিবাহিত দম্পতির মাঝে এক জরিপে অনেকগুলো কারণই এসেছে, তার মাঝে খুবই ইন্টারেস্টিং হল ৩ জন বলেছে :

– একটা খুব জরুরি টার্নিং পয়েন্ট ছিল আমাদের ১ম সহবাসটা।

---

[৩৪৯] Robert Epstein, Mayuri Pandit, and Mansi Thakar, How Love Emerges in Arranged Marriages: Two Cross-cultural Studies, Journal of Comparative Family Studies 2013 44:3, 341-360

PAUL BENTLEY (4 March 2011) Why an arranged marriage 'is more likely to develop into lasting love, DAILY MAIL

[৩৫০] ibid..

– তার প্রতি আমার যৌন আকর্ষণটাও একটা ফ্যাক্টর ছিল।
– আমি আমার স্বামীর প্রেমে পড়ি আমাদের বাসর রাতের পর।

অর্থাৎ **শুধু 'প্রতিরোধহীন সেক্স'-টাই একটা ফ্যাক্টর 'সময়ের সাথে ভালোবাসা বাড়ানো'র ক্ষেত্রে।** এবং নারীর যৌনতা নিয়ে যাদের জানাশোনা আছে তারা বুঝবেন, অপরিচিত মানুষের প্রতি নারীর যৌন আকর্ষণ অত্যন্ত বিরল, সুতরাং **প্রথম দিকে স্বাভাবিকভাবেই ইচ্ছা-স্পষ্ট সম্মতি বিষয়গুলো থাকে অনুপস্থিত।** সেখানে থাকে মৌন **সম্মতি** (tacit consent) **ও প্রতিরোধ না থাকা।** সময়ের সাথে সাথে ভালোবাসা **এবং তৃপ্তি বাড়তে থাকে।** যেই সেক্সের মধ্যে ভালোবাসা নেই, সেই সেক্স কীভাবে ভালোবাসা তৈরি করতে থাকে, ব্যাপারটা রহস্যময়। রহস্যের সমাধান হল—

মনস্তত্ত্ব ১ : খলনায়ক অক্সিটোসিন:

মানবদেহের এক আশ্চর্য প্রক্রিয়ার কথা শোনাব আপনাদের। আমাদের মগজ থেকে অক্সিটোসিন নামক একটি হরমোন বেরোয়। মা-শিশু, স্বামী-স্ত্রী, ইয়ার-দোস্ত ইত্যাদি সকল যুগল বন্ধনের জন্য দায়ী এই হরমোন। আদর করে একে ডাকা হয় bonding hormone, cuddle hormone (জড়িয়ে ধরা) কিংবা love hormone. ইদানীং জানা যাচ্ছে, ইনি বহু কাজের কাজী। যৌনমিলন, লিঙ্গোত্থান, বীর্যপাত, গর্ভধারণ, প্রসব, বুকের দুধ তৈরি, মাতৃত্বের অনুভূতি, সামাজিক বন্ধন, স্ট্রেস দূরীকরণ এবং আর কী কী যে আছে, আল্লাহ মালুম। [৩৫১]

মেয়েদের ৩টা সময়ে প্রচুর অক্সিটোসিন ক্ষরণ হয়— প্রসব বেদনা, নিপল স্টিমুলেশন এবং ... সেক্স। মানসিকভাবে, অক্সিটোসিন অপরকে পজিটিভ মুল্যায়ন করায়, অপরকে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে (more accepting of others)। [৩৫২] **মেয়েরা যে ব্যাডবয়দের প্রেমে পড়ে, এর পিছনেও এই হরমোনকে দায়ী করা হয়। যদিও ব্যাডবয়রা আবেগ থেকে যথেষ্ট সাড়া দেয় না** (not reciprocal), তবু ব্যাডবয়দের প্রেমে তারা পড়ে সামাজিক নিরাপত্তা বা সুরক্ষাপ্রদান জাতীয় ভিত্তিহীন পজিটিভ মূল্যায়ন থেকে। এই উটকো অহেতুক পজিটিভ মূল্যায়নের জন্য অক্সিটোসিন দায়ী।

---

[৩৫১] Magon, N., & Kalra, S. (2011). The orgasmic history of oxytocin: Love, lust, and labor. Indian journal of endocrinology and metabolism, 15 Suppl 3(Suppl3), S156–S161.

[৩৫২] Valentina Colonnello et al (2013), Frances S. Chen, Jaak Panksepp, Markus Heinrichs, Oxytocin sharpens self-other perceptual boundary, Psychoneuroendocrinology, Volume 38, Issue 12, Pages 2996-3002,

সেক্সের ক্ষেত্রে মেয়েদের একটা ধোঁকা দেয় এই হরমোনটা। Loretta Graziano Breuning, Ph.D. বলেন:

> অর্গাজমের (চরমানন্দ) ফলে যে অক্সিটোসিন রিলিজ হয়, তা অল্প সময়ের জন্য বিপুল আস্থা তৈরি করে। 'ভালো লাগার' এই অনুভূতির পর পুরুষ তো দ্রুত তাদের জগতে ফিরে যায়, মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন। অক্সিটোসিন মেয়েদেরকে জানায়: এই তোমার পারফেক্ট সঙ্গী। ভালো লাগা, আস্থা, পজিটিভ মূল্যায়ন– সব মিলিয়ে তার কাছে মনে হয় 'এই তো প্রেম'। [৩৫৩]

সুতরাং দাসীর সাথে সহবাসে প্রথম অবস্থায় অনিচ্ছা-অসম্মতি আছে। ধীরে ধীরে দিন গড়ানোর সাথে তা মালিকের সাথে মানসিক এটাচমেন্ট তৈরি করবে, তৈরি করবে আস্থা ও ভালোবাসা। কেবল সামাজিক মেইনস্ট্রীমিং-ই না, পারিবারিক মেইনস্ট্রীমিং করা হচ্ছে এর দ্বারা। কাফির যুদ্ধবন্দি নারী একটা সমাজের সাথে পাচ্ছে একটা পরিবারও, একজন ভালোবাসার মানুষও। এবং ব্যাপারটা জৈবিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। হরমোনঘটিত জৈবিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয় আরেক আজীব মানসিক প্রক্রিয়া।

মনস্তত্ত্ব ২: কত অজানা

যুদ্ধকালীন বাস্তবতায় খাপ খাইয়ে নেবার আরেকটি প্রক্রিয়া হল স্টকহোম সিনড্রোম (Stockholm syndrome)। এটি একটি মানসিক প্রক্রিয়া, যেখানে বন্দি তার আটককারীর প্রতি অনুরক্ত হতে থাকে, এমনকি এক পর্যায়ে তার আদর্শ ও দাবির সাথেও একাত্মতা পোষণ করে। Encyclopaedia Britannica জানাচ্ছে :

> Stockholm syndrome, psychological response wherein a captive begins to identify closely with his or her captors, as well as with their agenda and demands.

এর ব্যাখ্যায় মনোবিদগণ বলেছেন, আটককারীর থেকে যে মৃত্যুভয়টা ভিকটিম পাচ্ছিল, সেটা কেটে যায়। ভিকটিম একটা মানসিক প্রশান্তি পায়। এবং তাকে মেরে যে ফেলেনি, এইজন্য আটককারীর প্রতি জন্ম নেয় কৃতজ্ঞতা। আটককারীর ছোট ছোট ভালো আচরণে এই মনোভাব আরও বাড়তে থাকে। একই ঘটনা ঘটে আটককারীর ক্ষেত্রেও, তার মনেও ভিকটিমের প্রতি অনুরাগ জন্মে, যাকে বলে Lima Syndrome. মানে পারস্পরিক ভালোবাসা তৈরি হয়।

---

[৩৫৩] Rita Watson MPH (October 14, 2013), Oxytocin: The Love and Trust Hormone Can Be Deceptive,Psychology Today.

এগুলো স্বাভাবিক মানসিক সাড়া। মনোচিকিৎসক, দার্শনিক ও লেখক Neel Burton, M.D বলেন, Stockholm syndrome বিবর্তনগতভাবে অর্জিত একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া (capture-bonding psychological response)। যাযাবর জীবন থেকেই নারী-শিশুদের অপহরণ মানবসভ্যতার খুব সাধারণ ঘটনা। এটাও এক ধরনের 'খাপ খাইয়ে নেবার প্রবণতা' (adaptive trait), ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় টিকে থাকার সম্ভাবনা বেড়ে যায় (promotes survival in times of war and strife)। [৩৫৪]

এ ধরনের বহু উদাহরণ দেয়া যায় ইসলামী সভ্যতা থেকে। বইয়ের কলেবর বিবেচনায় দুই-একটা উল্লেখ করছি পাঠকের ধারণার জন্য। ফারাজ আল-ইস্পাহানী তাঁর গ্রন্থ 'ইমা আল-শাওয়াইয়ির' (দাসী কবিদের আখ্যান)-এ রাজকর্মকর্তা আলী ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩২ খ্রি:) ও তাঁর দাসী মুরাদ-এর ঘটনা উল্লেখ করেন। দুজনার মাঝে ঝগড়া হয়, যেমন প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে হয়ে থাকে। প্রেমিক রাগ করে দাসীকে এড়িয়ে চলতে থাকে। দাসীকবি মুরাদ সেই বেদনায় কবিতা লেখে:

> “ দু'দফা দাস হয়েছি তোমার— একবার তোমার, আরেকবার প্রেমের।
> সে জ্বালা সইতে তো আমাকে হবেই।
> হোক সে জ্বালা সইবার অতীত।
> খচখচে বালি বুকে নিয়েই বুঁজে আসে চোখ। সঁপে দেয় নিজেকে আনুগত্যে ও বাধ্যতায়।
> দাসের যা মানায়... তাতেই। [৩৫৫]

কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ী উসমানী খলিফা মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ও তাঁর দাসী গুলবাহারের কৈশোরপ্রেম তো প্রসিদ্ধ।

তাহলে **স্টকহোম সিনড্রোমের সাথে আগের** goodgirl-badboy syndrome **আর অক্সিটোসিনকেও মিলিয়ে নিলে বিষয়টির সম্ভাব্যতা নিশ্চিতভাবে বুঝা যায়।** ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় বন্দিনীরা দেখবে: এই বিজয়ী মুসলিমরা তো তাদের উপর জুলুম করছে না, তাদেরকে ধর্ষণ করছে না। বরং তাদের নিরাপত্তা-অভয় দিচ্ছে, স্ত্রী-কন্যাদের মত ভরণপোষণ দিচ্ছে। মুসলিমদের উত্তম আচরণ-ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক জীবনমান দেখে বন্দিনীরা তাদের প্রতি অনুরক্ত হবে, স্বাভাবিক মানসিক সাড়া এটাই। তাকে বুঝানো হলে একসময় সে সম্মতও হবে সহবাসের জন্য (অধিকতর ভালো

---

[৩৫৪] Neel Burton (March 24, 2012). What Underlies Stockholm Syndrome? Psychology Today.
[৩৫৫] Kilpatrick, "Poets and Chattels," 169.

থাকার উদ্দেশ্যে) এবং **এক সময় সে বিজয়ীর আদর্শ ও এজেন্ডা (ইসলাম) গ্রহণ করে** জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচার সুযোগ পাবে। নিশ্চয়ই এই ব্যবস্থা আল্লাহর তরফ থেকে, যিনি মানুষের সাইকোলজির স্রষ্টা। মানবমনের এতো অলিগলি, বিজ্ঞান সব কিছুর খোঁজ না পেলেও মানুষের যিনি স্রষ্টা তিনি তো আর বেখবর নন, বিধানগুলো তিনি মানবমনের সাথে মিলিয়েই দিয়েছেন।

এটা ধীরে ধীরে হতে থাকবে। কিন্তু শুরুর দিকে ব্যাপারটা মেয়েটির জন্য চাপের, এটা অনস্বীকার্য। কিন্তু যুদ্ধকালীন সাইকোলজি অনুসারে এটা আসলেই কি চাপের? কতটুকু চাপের? নাকি প্রশস্তির ও নিশ্চয়তার? এই প্রশ্নের উত্তর পরের পয়েন্ট।

মনস্তত্ত্ব ৩: একটু ভালো থাকা

অনেকে প্রশ্ন রেখে থাকেন: নিজ ভাই-পিতা-স্বামীর হত্যাকারীর সাথে সহবাস একটা মেয়ে কীভাবে মেনে নেবে? বাস্তবতা হল, আজ এই মুহূর্তে আপনার পেট ভরা আছে, শরীর সুস্থ আছে, আগামীকাল কী করবেন-কী খাবেন-বাঁচবেন কীভাবে তার নিশ্চয়তা আছে। তাই Abraham Maslow-র হায়ারার্কি অব নীডস মোতাবেক পরের ধাপের চাহিদা আপনার তৈরি হচ্ছে। আপনি আত্মমর্যাদা নিয়ে ভাবছেন, আপনি স্বাধীনতা-সমতা-সম্মতি নিয়ে ভাবছেন। অধিকার নিয়ে ভাবছেন। যুদ্ধকালে মানুষের বেসিক নীড পূরণই অনিশ্চিত থাকে, সে জানে না কাল সে বেঁচে থাকবে কি না, পরের বেলায় কী খাবে, রাতে মাথার উপর ছাদ থাকবে কিনা। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-জীবনের জন্য যে কোনো কিছু করতে সে তৈরি থাকে, আত্মমর্যাদা-অধিকার-সম্মতি এসব নিয়ে ভাবার সময় তার থাকে না।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষে বার্লিন পতনের কথা। সোভিয়েত আর্মি ১০ দিনে ১ লক্ষ জার্মান নারীকে ধর্ষণ করে। ৯-১০-১২ জন মিলে একজনকে। বার্লিনের প্রধান ২ হাসপাতালে ১০ দিনে ভর্তি হ ৯৫০০০-১৩০০০০ নারী। **যাতে অন্য সেনাদের থেকে নিরাপদ থাকা যায়, এজন্য একজনের কাছে নিজেকে পেশ করত।** [৩৫৬] **একজনের কাছে** নিজেকে বিক্রি করত যাতে অন্যদের হাত থেকে বাঁচা যায়, আবার কিছু খাবারটাবারও পাওয়া যায়। যেখানে জীবনই অনিশ্চিত, সেখানে সকল তাত্ত্বিক বুলি অপাংক্তেয়। যুদ্ধক্ষেত্রে একজন বন্দি নারীর একমাত্র চাওয়া এটাই যে, তাকে হত্যা না করা হোক, গণধর্ষণ না করা হোক। একজনের সাথে সহবাসে

[৩৫৬] Berlin: The Downfall 1945, লেখক Antony Beevor, 'They raped every German female from eight to 80'. Guardian

সম্মতি সেই পরিস্থিতিতে নারীর জন্য একটা রক্ষাকবচ। হোক সে নিজ পুরুষদের হন্তারক, বেঁচে থাকার কাছে বাকি দুনিয়া গৌণ।

আগের যুদ্ধ-কালচার কেমন ছিল সেটা দেখলে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে আরেকটু সুবিধা হবে। Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature-এর বরাতে :

> " যে সকল নারীরা তাদের বাবা অথবা স্বামীদের সাথে রণক্ষেত্রে যেত, তারা সবচেয়ে ভালো মানের পোশাক ও অলঙ্কার পরিধান করত যাতে যুদ্ধে পরাজিত হলে বন্দী অবস্থায় বিজয়ীদের দয়া পাওয়া যায়। [৩৫৭]

একই কথা পাদ্রী Samuel Burder লিখেছেন Oriental Customs বইয়ে। [৩৫৮] Wayne State University-র গবেষক Dr. Matthew B. Schwartz লেখেন:

> " বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণে (Deuteronomy ২১:১০-১৪) যেসব নারীরা যুদ্ধে বন্দি হয়েছে তাদের বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।... তারা এমন কাপড় পরিধান করতো, যা বিজয়ী সৈন্যদের আকর্ষণ করবে।...আর এটা যুদ্ধের ক্ষেত্রে চিরন্তন সত্য যে, বিজয়ী সৈন্যরাই নারীদের 'মনজয়' করে থাকে। [৩৫৯]

বুঝা যাচ্ছে, যোদ্ধাদের ও যোদ্ধার পরিবারের সাইকোলজি কেমন হতো। আমি মারা গেলে আমার পরিবার যেন ভালো থাকে, এটাই তাদের শেষ ইচ্ছা। আর নারীরাও জানতো যে, আমার সর্বোচ্চ 'ভালো থাকার' পদ্ধতি এটাই যে, আমি শত্রুর পরিবারে আশ্রয় পাব। নিজ পুরুষদের হত্যাকারীর সাথে শারিরীক সম্পর্ক স্থাপন করা মোটেই আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল না। বাস্তবতাকে দ্রুত মেনে নেবার মানসিক প্রস্তুতি সবারই থাকতো। যুদ্ধের অনিবার্য বাস্তবতাই তাদের মানসিকতাকে পরিচালিত করত, যা এখন আপনি-আমি ভাবতে পারছি না। বন্দি অবস্থায় আত্মসম্মান, নারীমুক্তি, প্রগতি, স্বাধীনতা ইত্যাদির চেয়ে 'টিকে থাকা' 'বেঁচে থাকা' 'ভালো থাকা' ব্যাপারগুলো বেশি সেন্স মেক করে। এই সাধারণ সাইকোলজিটা বুঝলে দাসপ্রথা বুঝা সহজ।

---

[৩৫৭] John McClintock, James Strong, "Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature" [Harper & Brothers, 1894, p. 782

[৩৫৮] Samuel Burder (1822), Oriental Customs Or, an Illustration of the Sacred Scripture, Williams and Smith, London, 1807 vol.2 p.79, no. 753

[৩৫৯] Matthew B. Schwartz, Kalman J. Kaplan, "The Fruit of Her Hands: The Psychology of Biblical Women" Wm. B. Eerdmans Publishing, 2007 , pp. 146-147

ইসলামের দাসীপ্রথায় দাসীরা কেমন ছিল

কিছু উদাহরণ দেখি, সেসময় দাসীরা ব্যাপারটাকে কীভাবে নিত। জার্মান ডাক্তার Gustav Nachtigal ১৮৭০-এর দশকে 'সাহেল' (সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাঞ্চল মৌরিতানিয়া থেকে সুদান পর্যন্ত) এলাকা ভ্রমণ করেন। তিনি জানিয়েছেন:

> " দাসমার্কেটে যুবতী মেয়েদেরকে অন্যান্য দাসদের চেয়ে খুশি মনে হত। যেহেতু মধ্যবিত্ত কোন পরিবারেও যদি উপপত্নী হওয়া যায়, তো সেখানে কর্তৃত্ব করা যাবে, ভালো আচরণ পাওয়া যাবে এবং সন্তান ধারণ করলে অবিক্রয়যোগ্যও হতে পারা যাবে।[৩৬০]

দাসী উপপত্নী ছিল একজন ধনী প্রভাবশালী লোকের জন্য ইজ্জত-সম্মান-মর্যাদার বিষয়। এমন কাউকে প্রকাশ্যে অপদস্থ করতে চাও, তো তার দাসীকে অপদস্থ করো। এমন ছিল ব্যাপারটা– দাসীর সম্মান, নিজের সম্মান। ব্রিটিশ পর্যটক রিচার্ড বার্টন লিখেছেন তাঁর ছদ্মবেশে মক্কা-মদীনা সফরের কথা। এক মিসরীয় দাস-মার্কেটের বিবরণ দিচ্ছেন তিনি:

> " আবার উটে চড়ে আমরা বাসার দিকে রওনা দিলাম। পথিমধ্যে আমরা প্রধান দাস-বাজার অতিক্রম করলাম। এটা চটের ছাউনি দেয়া একটা বিরাট রাস্তা, আশপাশে প্রচুর কফি-হাউস। দেয়ালের গায়ে লাগোয়া দোকান। সবচেয়ে উঁচু বেঞ্চে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েগুলো বসা, তার নিচে মোটামুটি যারা। আর একেবারে নিচে সব ছেলেরা। সুশোভিত গোলাপি ও অন্য হালকারঙা মসলিনের পোশাক পরা সবাই। মাথায় স্বচ্ছ ঘোমটা। এমন অভাবনীয় জাঁকজমকের কারণেই হোক, আর লম্বা সফরের সফল সমাপ্তির দরুনই হোক, তাদেরকে একদম প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। অচেনা ভাষায় গল্পগুজবে মত্ত সবাই। তাদেরকে কেনা হচ্ছে, এমন অস্বস্তিকর নাজুক অবস্থায়ও উচ্চস্বরে হাসাহাসি করছিল। প্রশ্ন করে যাচ্ছিল ক্রেতাদের। সেখানে সুন্দরী মেয়েও ছিল, মনে হয় হাবশী। বাজে দেখতে আফ্রিকানও ছিল, আধা-আরব সোমালি থেকে নিয়ে বেবুন-মুখো সোয়াহিলি পর্যন্ত।[৩৬১]

তিনি জানিয়েছেন, মিসরে তিনি যেখান এ থাকতেন, তার উল্টোদিকেই ছিল দাসীদের মেস। দাসীদের সাইকোলজি বুঝাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: কোন দাসীর সাথে ফ্লার্ট করা হলে তার রেসপন্স হয় এমন—

– তুমি কত সুন্দর মারিয়াম, কত সুন্দর তোমার চোখ, কত সুন্দর তোমার....

[৩৬০] Fisher and fisher, Slavery and Muslim Society in Africa, 108-109

[৩৬১] Burton, Richard Francis, Sir, 1821-1890. "Personal narrative of a pilgrimage to el Medinah and Meccah." Apple Books." P275

– তাহলে তুমি আমাকে কিনছ না কেন?
– আমরা একই ধর্মের, একই বিশ্বাসের। পরস্পরের জন্যই আমাদের জন্ম।
– তাহলে আমাকে কিনছো না কেন?
– ভাবো মারিয়াম, আমাদের দুটি হৃদয়ের স্পন্দন...
– তাহলে কেন কিনছো না আমাকে। [৩৬২]

কেনা-বেচা, নতুন মানুষের কাছে হাতবদল হওয়া— ব্যাপারগুলোকে তারা কীভাবে দেখছে দেখুন। অত্যন্ত স্বাভাবিক, সম্পর্কের সোপান হিসেবে ব্যাপারটাকে দেখত তারা। এরপরও ইসলাম নানান বাহানায় তাকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই নতুন বাস্তবতা মেনে নেবার জন্য সময় দিয়েছে বিভিন্ন বিধানের দ্বারা সময়ক্ষেপণ করে। যাতে এই মধ্যবর্তী সময়ে মালিকের সাথে কিছুটা হলেও ইমোশনাল এটাচমেন্ট তৈরি হবার একটা সুযোগ দেয়া যায়।

- যেমন গনিমত বণ্টনের নিয়ম হল শত্রুসীমায় বণ্টন করা যাবে না (বাধ্য না হলে)। নিজ দেশের সীমায় এসে এরপর বণ্টন হবে। অবশ্য যদি অধিকৃত ভূমি ইসলামী সাম্রাজ্যে যুক্ত হয় (annexation), তাহলে ভিন্ন কথা।

- মূর্তিপূজক দাসী তার মালিকের জন্যও বৈধ নয় যতক্ষণ সে ইসলাম-খ্রিষ্ট-ইহুদি ধর্মের কোনটা গ্রহণ না করে। আল-আইনী রহ. (মৃত্যু ৮৫৫ হি.) লিখেন :

> “ মুজতাহিদ ইমামগণ একমত যে, মুশরিক দাসীর সাথে সহবাসের অনুমতি নেই। [৩৬৩]

হানাফি মাযহাবের আইনশাস্ত্রের কিতাব ফতোয়ায়ে আলমগিরিতে রয়েছে:

کوئی شخص مشرکہ و مجوسیہ عورت کا مالک ہو تو اس سے وطی نہیں کر سکتا ہے

> “ কেউ মালিকানার দরুন মুশরিক ও মাজুসী (অগ্নিপূজক) নারীর সাথে সহবাস করতে পারবে না। [৩৬৪]

- মালিকানায় আসার সাথে সাথেই সহবাস করা যাবে না। একবার মাসিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ফলে শক কাটিয়ে বাস্তবতা মেনে নেয়ার জন্য সময় পাবে। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আওতাসের যুদ্ধবন্দিনী নারীদের সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

[৩৬২] ibid, p60
[৩৬৩] উমদাতুল কারী, দারুল আহইয়া আল-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরুত, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১০৩
[৩৬৪] ফতোয়ায়ে আলমগীরী ২/১৪৪, মাকতাবাতুর রহমানিয়া (উর্দু)

" গর্ভবতী মহিলার সাথে সহবাস নিষিদ্ধ যতদিন না পর্যন্ত সে প্রসব করে, আর যে গর্ভবতী নয় তার সাথে প্রথম মাসিক পর্যন্ত নিষিদ্ধ। [৩৬৫]

কলোনিয়াল আলজেরিয়ার প্রথম ফরাসি গভর্নর Thomas Bugeaud জানাচ্ছেন:

" দাসেরা একই লাইফস্টাইলে চলে স্বাধীনদের মত। কালেভদ্রে খারাপ আচরণের ঘটনা ঘটে। প্রায়ই আরবরা কালো নারীদের বিয়ে করে। আর উপপত্নীদের সন্তানদের হুবহু অন্যান্য সন্তানদের মতোই দেখা হয়। [৩৬৬]... আমেরিকার মত দাসপ্রথা মুসলিম উত্তর আফ্রিকার কোথাও নেই, যাদেরকে লাগাতার ভারি কাজে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। বরং তাদেরকে গৃহস্থালিতে নেয়া হয়, এবং মনিবের নিগ্রো দাসীদের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। মালিকেরা নিজেরাও নিগ্রো দাসীদের প্রায়ই বিয়ে করে। এসব নিগ্রোদের অবস্থা বেশ স্পষ্টতই বেশ ভালো (gentle) [৩৬৭]

একই উচ্চারণ বার বার জোর দিয়ে বলা হয়েছে পরবর্তী মিলিটারি রিপোর্ট ও ভ্রমণকাহিনীগুলোতে। দাসী-মালিক সম্পর্কটাকে 'বিয়ের মতোই' মনে করাটা আলজেরীয় দাসীদের কাছে দাসত্বকে মৃদু করে তুলেছে।

উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম আফ্রিকার নানান জায়গার বেশ কজন নারীর সাক্ষাতকার নেয়া হয়। ২ জন ছিল গৃহকর্ত্রী (Baba ও Bi Kaje) বাকিরা ছিল দাসী (Aichata, Minata, Fatma, Medeym, 'Faytma' and Faida), উপপত্নী বা উম্মে ওয়ালাদ। বাজারে কেনা দাস আর পরিবারের দাসের সন্তানের (mzalia) মধ্যে পার্থক্য হল : পরিবারের দাসদের সন্তানরা যেন নিজেরই বাচ্চাকাচ্চা। এমনকি মুক্তির পরেও দাসীরা গৃহকর্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক চালিয়ে যেত : বিবাহশাদী, ঘরোয়া অনুষ্ঠানাদি, বাচ্চা প্রসব, ভরণপোষণ ইত্যাদি ইস্যুতে। দাসপ্রথাটা ছিল এক বিশেষ প্রকার যৌথ পরিবার (created very particular forms of extended family)।

গৃহকর্ত্রী দুজনের সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে, কীভাবে তারা দাসদের শিক্ষাদীক্ষায় সাহায্য করেছে যাতে তারা নিজেরাই মুসলিম হবার প্রস্তুতি নিতে পারে, সোয়াহিলি সমাজে যা তাদের মুক্তি ত্বরান্বিত করবে। ফলে এই দাসদের পরের জেনারেশনও মুসলিম হিসেবেই বেড়ে উঠার সুযোগ পেল। ভালো মনিবের দায়িত্ব হল, দাসদাসীকে ইসলামে দীক্ষিত করার চেষ্টা করা। গৃহকর্ত্রী হিসেবে তাদের কাজ ছিল, দাসদাসীদের

---

[৩৬৫] আবু দাউদ, হাদিস নং- ২১৫৭

[৩৬৬] Sarah Ghabrial, The 'Slave Wife' Between Proivate Household and Public Order in Colonial Algeria (1848-1906), Slavery in the Islamic World, Ed. Mary Ann Fay, 2019

[৩৬৭] Paul Soleillet, L'Afrique occidentale:` Algerie, Mzab, Tildikelt (Avignon, 1877) সূত্রে প্রাগুক্ত।

বিয়েথা দেয়া, মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা, এদের সন্তানরাও মুসলিম হিসেবে বড় হচ্ছে কি না, লক্ষ্য রাখা।

গৃহকর্ত্রী-দাসী সবার কথাতেই যে কমন ব্যাপারটা উঠে এসেছে: দাসত্বের অভিজ্ঞতাটা কেমন সেটা নির্ভর করেছে 'মুসলিম হবার' উপর। আর গৃহকর্ত্রীদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি ভূমিকাটা ছিল মা-বোন-চাচি-খালা জাতীয়। গৃহকর্ত্রী ও উপপত্নীদের মাঝে সম্পর্ক কেমন ছিল? long-term relationships... পুরুষ মনিব-দাসের মত না।[৩৬৮]

সামাজিক নিরাপত্তা :

দাসী নিজ মালিকানায় আসার পর ইসলাম দাসী-সংক্রান্ত হুকুম-বিধান প্রদান করে তার সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। প্রথমে দেখি কি কি নির্দেশনা ইসলাম দিচ্ছে।

- দাসদাসীরা যেকোনো সময় ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে। এক দাসী তার মনিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, আমার মালিক আমাকে যিনার অপবাদ দিয়ে লজ্জাস্থানে আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে শাস্তি দিয়েছে। উমার রা. দাসীকে মুক্ত ঘোষণা করে মালিককে ১০০ বেত্রাঘাতে দণ্ডিত করেন।

- ইসলামের পূর্বে দাসীদেরকে দিয়ে পতিতাবৃত্তি করানো হতো এবং মালিক এর লাভ নিতো। ইসলাম এসে তা হারাম ঘোষণা করেছে।

- মালিক ঘোষণা দেবে এই দাসীর সাথে তার সম্পর্কের ব্যাপারে। যাতে সমাজে দাসীর পরিচিতি হয় 'অমুকের সুররিয়া' হিসেবে। মালিকের স্ট্যাটাসে দাসীর স্ট্যাটাসও প্রভাবিত হত।

- নিজ সহবাসে আসা দাসীর সাথে আর কেউ সহবাস করতে পারবে না।

- নিজ মালিকানার দাসী ছাড়া অন্যের মালিকানার দাসীর সাথে সহবাস যিনার সমান অপরাধ ও যিনার হদ সাব্যস্ত হবে। ব্যতিক্রম: সন্তানের বা নাতির দাসীর ক্ষেত্রে হদ হবে না। আর নিজ পিতা-মাতা-স্ত্রীর দাসীর সাথে 'হালাল মনে করে' করলে হদ হবে না, হারাম জানা সত্ত্বেও করলে হদ বর্তাবে। বাকি সকল ক্ষেত্রে যিনার শাস্তি বর্তাবে।

---

[৩৬৮] Ann McDougall, What is Islamic about Slavery in Muslim Societies?, Slavery in the Islamic World, Ed. Mary Ann Fay, 2019

- দাসীর গর্ভে মনিবের সন্তান এলে সে সন্তান জীবিত বা মৃত যা-ই হোক, সেই দাসী 'উম্মু ওয়ালাদ' হিসেবে গণ্য হবে। সে হবে অবিক্রয়যোগ্য। এবং মনিবের মৃত্যুর পর অটোমেটিক মুক্ত। অর্থাৎ সহবাসের দরুন মুক্তির পথ খুলে গেল।

সুইডেনের গটেনবার্গ ইউনিভার্সিটির আরবি সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক Pernilla Myrne বলছেন:

> "মনিবের উপপত্নী হিসেবে যে দাসীগুলোকে বেছে নেয়া হত, তারা সচরাচর বেশি মর্যাদা, বেশি নিরাপত্তা এবং বৈষয়িক সুযোগসুবিধা পেত; কিছুদিনের জন্য হলেও। আর যদি সে মনিবের সন্তান জিন্ম দেয় আর মনিব স্বীকার পিতৃত্ব স্বীকার করে (হানাফি ফিকহ মতে পিতা স্বীকার করতে হবে), দাসীটি তখন 'উম্মে ওয়ালাদ' নামক আরও সুবিধাজনক অবস্থান অর্জন করে। সেক্ষেত্রে তার প্রাত্যহিক জীবন অন্য স্বাধীনা স্ত্রীর চেয়ে খুব একটা ভিন্ন হয় না, মর্যাদা কিছুটা কম থাকে স্বাধীনা স্ত্রীদের চেয়ে।... মনিব ছাড়া অন্য যে কারও কাছে বেপর্দা হওয়া ও যৌন-সুবিধা দেয়া থেকে ইসলামী আইন দাসীদের রক্ষা করতো। আর মনিবও তাদেরকে খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয় দিতে এবং নির্যাতন না করতে বাধ্য ছিল। [৩৬৯]

লক্ষ্য করলে দেখবেন, সহবাসের দ্বারা দাসী সামাজিকভাবে একটা অবস্থান বা পরিচয় (অমুকের সুররিয়া) এবং নিরাপত্তা লাভ করলো। অর্থাৎ সহবাস দাসীর জন্য সামাজিক মর্যাদার ক্রমোন্নয়নের সোপান (social ladder) হয়ে উঠেছে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে যদি আমরা হারেম সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করি।

হারেম

জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির প্রোফেসর John L. Esposito বলেন: প্রাচীন সমাজগুলো যখন মুসলিমরা জয় করছিল, মুসলিমদের নতুন শাসকেরা তাদের দেখাদেখি হারেম-এর ধারণাকে গ্রহণ করে নেয়।

হারাম থেকে হারেম/হেরেম শব্দের উদ্ভব। যার অর্থ, এমন স্থান যেখানে প্রবেশ নিষেধ। মূলত ইতিহাসে, রাজা বা সম্রাটের অন্দরমহল যেখানে রাজপরিবারের নারীরা অবস্থান করতেন, তাকে বলা হত হারেম/হেরেম। সর্বসাধারণ এমনকি রাজকর্মচারীদের পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। পশ্চিমা সাহিত্য-চিত্রকর্মে মুসলিম

---

[৩৬৯] Pernilla Myrne, Slaves for Pleasure in Arabic Sex and Slave Purchase Manuals from the Tenth to the Twelfth Centuries, Journal of Global Slavery 4 (2019) 196-225

সভ্যতার হেরেমকে হুবহু রোমান পতিতাপল্লী জাতীয় কিছু একটা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। যেন সুলতান ও শাহজাদারা যখন ইচ্ছে যাকে ইচ্ছে ভোগ করার জন্য 'শাহী পতিতাপল্লী' বানিয়ে রেখেছে। হারেম সম্পর্কে পশ্চিমা বয়ান মূলত নিছক গালগল্প আর ইউরোপীয় গ্রীক-রোমান কালচারের সাথে মিলিয়ে 'ধরে নেয়া' ছাড়া আর কিছু না। কেননা মুসলিম হারেম-এ প্রবেশ ও এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য মেলা দুষ্কর ছিল। চিত্রকর্ম, উপন্যাস, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, ব্যাখ্যাগ্রন্থ, নারীবাদী বয়ান সবখানেই 'প্রাচ্যের দাসপ্রথার প্রতি ইউরোপীয় বাতিক' প্রকাশ পেয়েছে [৩৭০]। Mary Roberts দেখিয়েছেন, কীভাবে উসমানী হারেমের প্রভাবশালী, বুদ্ধিমতী ও সংস্কৃতিবান নারীরা হারেম নিয়ে পশ্চিমের এইসব একপেশে উপস্থাপনাকে বেইজ্জত করে ছেড়েছে। [৩৭১]

হারেমে রাজপরিবারের নারীরা ছাড়া সুলতানের সরাসরি মালিকানাধীন দাসীরা থাকত, আর থাকত শিশুরা। এসব দাসীরা বিভিন্ন যুদ্ধ-চুক্তি-উপহার বা ক্রয়সূত্রে প্রাসাদে আসত। এখানে তারা ধর্মীয় জ্ঞান, সেলাই ও কুটির শিল্পের কাজ, নাচগান, আবৃত্তি ও রান্না শিখত। শেখানো হত তুর্কি-আরবি ভাষা, ফার্সি সাহিত্য। নিজ নিজ মাতৃভাষা চর্চার সুযোগও ছিল। বিজ্ঞান-গণিত-রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত বিষয়েও পড়াশোনা করতে পারত। [৩৭২] কেন তাদের এভাবে যোগ্য করে গড়ে তোলা হত তার একটা কারণ আছে। মুসলিম হারেমগুলোর মাঝে সবচেয়ে বিখ্যাত অটোমান হারেম নিয়ে আমরা কথা বলছি।

তার আগে আমাদের দুটো জিনিস জানতে হবে। সুলতানের মা হচ্ছেন পুরো সাম্রাজ্যের সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি সরাসরি সুলতানের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। আরেকজন হলেন শাইখুল ইসলাম (আলিমদের প্রধান)। সুলতানের মাকে বলা হত 'ওয়ালিদা সুলতান' (Valide Sultan)। কয়েকজন উসমানী সুলতানের মা অর্থাৎ সাম্রাজ্যের ওয়ালিদা সুলতানের সাথে পরিচিত হওয়া যাক।

---

[৩৭০] Diane Robinson-Dunn, French and English Orientalisms and the Study of Slavery and Abolition in North Africa and the Middle East: What Are the Connections?

[৩৭১] Mary Roberts, The Harem in Ottoman and Orientalist Art and Travel Literature, Durham, Duke UP, 2007.

[৩৭২] Pierce L.P. (1993) The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, Studies in Middle Eastern History. (পাঠকগণ চাইলে প্রিন্স মুহাম্মদ সজল রচিত 'সানজাক-ই-উসমান বইটি দেখতে পারেন))

সুলতান	ওয়ালিদা সুলতান (সুলতানের মা)	পরিচয়	আগের নাম
সুলাইমান কানুনী	হাফসা	খ্রিস্টান দাসী	অজানা
৩য় মুরাদ	নুরবানু	ইহুদি বা গ্রীক দাসী	Rachel
৩য় মেহমেদ	সাফিয়া	আলবেনিয়ান দাসী	Sofia
আহমেদ	হান্দান	বসনীয় দাসী	Helena
৪র্থ মুরাদ ইবরাহীম	মাহপয়কর কোসেম	গ্রীক দাসী	Anastasia
৪র্থ মেহমেদ	তুরহান খাদিজা	ইউক্রেনিয়ান দাসী	Nadya
২য় সুলাইমান	সালিহা আশুব	সার্বিয়ান দাসী	Katarina
২য় মুস্তফা ৩য় আহমেদ	রাবেয়া গুলনুশ	গ্রীক দাসী	Evmania Voria
১ম মাহমুদ	সালিহা	সার্বিয়ান দাসী	Elizaveta
৩য় উসমান	শাহসুওয়ার	রাশিয়ান বা সার্বিয়ান দাসী	Maria

এভাবেই একজন সাধারণ কৃষক বা যাজক পরিবারের কিশোরীর জন্য একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে যাবার সুযোগ করে দিত হারেম। হারেমে একটা বিশেষ পদক্রম ছিল। সবাইকে সুলতান ভোগ করতেন ব্যাপারটা এমন না। অটোমান সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের হারেমে দাসী ছিল প্রায় ৩০০, যাদের অধিকাংশই সুলতানকে সামনাসামনি দেখেনি।

- সাধারণ দাসীদের মাঝে যারা রূপে-গুণে -বিদ্যায় দ্রুত উন্নতি করত, তাদেরকে সুলতানের মা 'কালফা' (দাসীনেত্রী) হিসেবে বেছে নিতেন। প্রত্যেকের অধীনে থাকত আরও দাসী।
- কালফাদের মাঝে যারা অনন্যা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করত, তারা হত সুলতানের মায়ের খাস বাঁদি। বা সুলতানের জলসার জন্য মনোনীত হত। মায়ের সাথে সাক্ষাতের সুযোগে বা জলসায় সুলতানের সাথে এদের দেখা হত। সুলতানের পছন্দ হলে এরা সুলতানের সাথে রাত কাটানোর অনুমতি পেত, এদের পদ হত 'গোজদে' (Gözde)। অধিকাংশই জীবনে একবারই সুলতানের দেখা পেত।
- কেউ কেউ গুণপনা ও কথোপকথনে সুলতানের প্রিয় হয়ে যেত। তারা পদোন্নতি পেয়ে হত 'ইকবাল'। তাদের সৌভাগ্যের দরজা খুলে যেত।
- ইকবাল-দের মাঝে সাধারণত জনকে সুলতান বেছে নিতেন কাদিন (Kadin) হিসেবে। সাধারণ দাসীদের চেয়ে কাদিনদের বেতন ও উপহার ছিল অনেক বেশি।

এরা মূলত সুলতানের পুত্রসন্তানদের মা হতেন (উম্মে ওয়ালাদ)। ক্ষমতা ও মর্যাদায় তারা সুলতানের স্ত্রীদের সমান। এভাবেই হারেমের দাসীরা যোগ্যতাবলে ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে রাণীর মর্যাদায় পৌঁছে যেত। পুত্র সন্তান হলে কাদিন-কে সন্তানসহ চলে যেতে হত কোনো প্রদেশে। শাহজাদাকে ভবিষ্যৎ সুলতান হিসেবে বড় করতে হত।

➡ আর যারা এতোদূর যেতে পারত না, তারা কোনো পাশা বা বেগের (প্রাদেশিক গভর্নর) কিংবা পদস্থ অফিসারের স্ত্রী হয়ে যেত। এর যোগ্যও যারা হতে পারত না, ৩-৯ বছর হারেমে কাজ করার পর সুলতানের মা ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দিতেন। [৩৭৩]

ঠিক একারণেই হারেমের প্রতিটি দাসীকে এমনভাবে তৈরি করা হত, যেন সে শাহজাদার মা এবং ওয়ালিদা সুলতান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। সুলতানের মায়েদের গড়ে তোলার প্রতিষ্ঠান ছিল হারেম। ওরিয়েন্টালিজমের বিষাক্ত চশমায় প্রাচ্যের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে — সে পরিবার, হারেম, দাসপ্রথা যাই হোক, বানানো হয়েছে খলনায়ক। লেখিকা Merryn Allingham স্বীকার করেছেন—

> "It's clear that the stereotype lodged in the European mind was a long way from the truth! [৩৭৪]

হুবহু একই চিত্র আব্বাসি খলিফাদের হারেমেও বিদ্যমান, একই পদবিন্যাস, একই রূপ-গুণের প্রতিযোগিতা। [৩৭৫] ঐতিহাসিক Judith Still জানিয়েছেন: Lady Mary Wortley Montagu নিজে হারেমে প্রবেশ করেছেন, আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন: হারেম কোনো কয়েদখানা নয়, বরং নারীদের একান্ত চারণভূমি। তিনি এও বলেছেন, যেসব পুরুষ পর্যটকরা আমাদের ভুলভাল বিশ্বাস করিয়েছে, তাদের চেয়ে তুর্কী নারীরা অনেক বেশি বিচরণশীল। [৩৭৬]

আব্বাসী খলিফা হারুনুর রশীদের মা 'খাইজুরান', আল-মুকতাদিরের মা 'শাগাব' এবং মামুনুর রশীদের মা 'মারাজিল' ছিলেন দাসী। উম্মে ওয়ালাদ খাইজুরানকে পরে অবশ্য বাবা খলিফা আল-মাহদী মুক্ত করে বিবাহ করেন ৭৭৫ সালে। প্রতিবার নতুন খলিফা আসেন, সাথে তার মা-ও হারেমের ভিতর ক্ষমতায় আসেন। তিনি ছাড়াও

---

[৩৭৩] প্রাগুক্ত

[৩৭৪] Merryn Allingham, Ottoman Women And The Harem

[৩৭৫] Linda Webber (2013), Comparing Harems: Abbasid and Ottoman Harem Organization, The College at Brockport: State University of New York

[৩৭৬] Judith Still, "Hospitable Harems? A European Woman and Oriental Spaces in the Enlightenment," Paragraph, 32, no. 1 (2009), 96.

হারেমের পদস্থ নারীরা বিভিন্ন জায়গীর পেতেন, যা দ্বারা বিলাসবহুল জীবন কাটাতেন। কেবল ৩ জন ছাড়া সকল আব্বাসী খলিফার মা ছিলেন দাসী। [৩৭৭]

প্রশ্ন ৪: সহবাস করবে ভালো কথা, বিয়ে ছাড়া কেন?

ইসলামের সিদ্ধান্ত হল: 'নিজ মালিকানা'ভুক্ত দাসীর লজ্জাস্থান নিজ বিবাহভুক্ত স্ত্রীর লজ্জাস্থানের মতই বৈধ। সুতরাং এখানে বিবাহ নিষ্প্রয়োজন। দাসীর সাথে সহবাস বিয়ে ছাড়াও বৈধ। একজন নারী ও পুরুষের যৌন সম্পর্ক হালাল হয় দুইভাবে। যথা—

১) স্বাধীন নারীকে নির্দিষ্ট মোহর দিয়ে বিয়ে করার দ্বারা।

২) পরাধীন নারীর (দাসী) সাথে মালিকানার দ্বারা।

স্বাধীন নারী	পরাধীন দাসী
সহবাস বৈধ হয় বিয়ের দ্বারা।	সহবাস বৈধ হয় মালিকানার দ্বারা।
স্বামী ছাড়া কেউ সহবাস করতে পারবে না	মালিক ছাড়া অন্য কেউ সহবাস করতে পারবে না।
অন্য স্ত্রীর সন্তানদের জন্য বাপের স্ত্রী হারাম।	অন্য স্ত্রীর সন্তানদের জন্য বাপের সুররিয়া দাসী হারাম।
দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করা যাবে না।	দুই বোনকে একই সাথে উপপত্নী হিসেবে নেয়া যাবে না।
জন্ম নেয়া সন্তান স্বাধীন ও বৈধ উত্তরাধিকারী।	জন্ম নেওয়া সন্তান স্বাধীন ও বৈধ উত্তরাধিকারী।
স্বামীর সচ্ছলতা অনুপাতে স্ত্রীর খোরপোষ দিতে হবে।	মনিবের সমমানের খাবার-পোশাক দেয়া অপরিহার্য না, তবে দেয়া মুস্তাহাব। মনিব যদি নিজে কৃপণ হওয়ার কারণে নিম্নমানের খানা-পোশাক ব্যবহার করে, তবুও দাসদাসীদেরকে সাধারণ মানুষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ খানা-পোশাক দিতে হবে, অপরিহার্য। [৩৭৮]
মূর্তিপূজক নারীর সাথে বিবাহ বৈধ নয়।	মূর্তিপূজক দাসীর সাথে সহবাস বৈধ নয়। [৩৭৯]

[৩৭৭] Jahiz, Mahasin, 230-231.
[৩৭৮] ফতোয়ায়ে আলমগীরী ২/৭১৪
[৩৭৯] ফতোয়ায়ে আলমগীরী (ই.ফা.) ২/৫৫

দুটোই স্বীকৃত বৈধ হালাল জৈবিক বন্ধন। বিয়ে ছাড়াই দাসীর সাথে সহবাস বৈধ এবং এটি যিনা নয়। এই সম্পর্কটাকে দাসী , যৌনদাসী না বলে 'উপপত্নী' বা concubine বললে পুরো ব্যবস্থাটা বুঝে আসে। উপপত্নী, পত্নীই তবে মর্যাদা পত্নীর চেয়ে কম। যেহেতু সে পরাধীন দাসী।

পার্থক্যটা এটাই যে, 'বিয়ের উদ্দেশ্যই থাকে সহবাস কিন্তু দাসী গ্রহণের উদ্দেশ্যই সহবাসের জন্য নয়'। স্ত্রী মানেই সহবাস করা, দাসী মানেই সহবাস করা না। আবু বকর রা. , তাঁর এক দাসীর সাথে নিজের ছেলের বিয়ে দেন। যদি দাসী মানেই সহবাস হতো তবে, তার ছেলের জন্য ঐ দাসী হারাম হতো। তিনি বিয়ে দিতেন না নিজের ছেলের সাথে। মুসলিম সমাজে তিন প্রকার দাসী ছিল:

১. আমাহ

২. সুওয়াইবা/সুররিয়া/জারিয়া

৪. উম্মুল ওয়ালাদ: যদি মনিবের ঔরসে কোনো দাসীর সন্তান হয় জীবিত/মৃত তবে ঐ দাসীকে মালিক আর বিক্রি করতে পারবে না। এবং মালিকের মৃত্যুর পর সে অটোমেটিক মুক্ত হয়ে যাবে।

প্রোফেসর ডেভিসের বক্তব্যেও একই বিষয় ফুটে ওঠে:

> " মনে হয় বহুসংখ্যক দাসী, প্রকৃতপক্ষে প্রায় সবই বলা যায়, দাসীদেরকে উপপত্নী হিসেবে কেনা হত না: D'aranda লিখেছেন তার নিজের মনিব Ali Pegelin-এর ২০ জন খ্রিস্টান দাসী ছিল, যারা মূলত তাঁর স্ত্রীর পরিচারিকা ছিল।

মূল উদ্দেশ্য আশ্রয়, নিরাপত্তা, ভরণপোষণ দেওয়া। তবে সহবাস হয়ে গেলে উপপত্নী হয়ে যাবে। কাইন্ড অব প্রমোশান, দাসী থেকে উপপত্নী। নামেমাত্র দাসী থাকলো, আর স্ত্রীর মতো সবই পেল। আর যদি গর্ভে সন্তান চলে আসে, তাহলে তো অনিবার্য 'মুক্তি'—উম্মুল ওয়ালাদ। আমেরিকান ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপিকা Elke Stockreiter বলেন:

> " যদিও সব দাসীই উপপত্নী ছিল না, তবে সব দাসীরই মুক্তির এই রাস্তাটা খোলা ছিল যে, মনিব তার যৌনশ্রম থেকে উপকৃত হবে, আর দাসীর মুক্তি ত্বরান্বিত হবে। [all slave women had the potential to access this path out of bondage, since masters may avail themselves of their unwed domestic slaves' sexual labour] [৩৮০]

[৩৮০] Elke E. Stockreiter, Child Marriage and Domestic Violence, p 138-158

আরেকটা পার্থক্য হল, সুররিয়া (উপপত্নী) দাসীও যেহেতু দাসী; তাকে বিক্রি করা যাবে, অন্যত্র বিবাহ দেয়া যাবে। কিন্তু উম্মে ওয়ালাদ হয়ে গেলে আবার বিক্রি করা যাবে না। বিয়ের ইজাব-কবুল ছাড়া ছাড়া দুটোর মধ্যে অধিকাংশ বিধান মিল। ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণ দাসীর বহু বিধান বের করেছেন বিবাহের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে।

দ্বিতীয়ত

মুসলিম দাসীকে বিয়ে করার কথাও ইসলাম বলেছে, বেশি জোর দিয়ে উৎসাহ দিয়েছে। উপপত্নী হিসেবে নেবার চেয়ে মুসলিম দাসীকে মুক্ত করে বিবাহ দ্বারা পূর্ণ পত্নী করে নেয়াকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে, দ্বিগুণ প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন:

> “ মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না যদি না তারা মুসলমান হয়। মুশরিক নারীর চেয়ে তো মুসলিম দাসীই উত্তম, যদিও মুশরিক নারী তোমাদের কাছে মুগ্ধকর লাগে। [৩৮১]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

> “ যার একটি দাসী আছে, সে তাকে উত্তম শিক্ষা দেয়, ভাল ব্যবহার করে, মুক্ত করে বিয়ে করে নেয়, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। [৩৮২]

গরিব সাহাবীদেরকে দাসী মুক্ত করে বিয়ে করতে বলেছেন আল্লাহ কুরআনে। যদি স্বাধীন নারী মোহরানা দিয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকে তবে দাসীকে মুক্ত করে বিয়ে কর। যেহেতু দাসীর মোহরানা দিতে হয় না, দাসীর মুক্তিই হল তার মোহরানা [৩৮৩]। নিজের দাসীকে বিবাহের আগে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে, নইলে বিবাহ সহীহ হবে না। (কাযীখান) ফকীহগণ বলেন, এই জমানায় উত্তম হল, নিজ দাসীকেও বিবাহ করে নেয়া। (সিরাজিয়া)।[৩৮৪]

বুঝা গেল দাসীর সাথে বিয়ে ছাড়া সহবাস বৈধ, তবে বিয়ে করে নেয়াটাই উত্তম।

---

[৩৮১] কুরআন ২/২২১

[৩৮২] আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, হাদিস নং-২০৫৩ (iHadis app) বুখারী ই.ফা., খণ্ড ৪, হাদিস নং-২৩৭৬,২৩৭৯।

[৩৮৩] [কুরআন ৪/২৫]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজান সাফিয়্যা (রা.) কে মুক্ত করে বিবাহ করেন। মোহরানা ছিল তাঁর মুক্তি। (বুখারী iHadis app, হাদিস নং- ৫০৮৬)

[৩৮৪] ফতোয়ায়ে আলমগীরী ২/৫৬

তৃতীয়ত

কিছু দাসীকে অন্য দাসের সাথেও বিবাহ দেয়া হত। কুরআন বলছে

> “ তোমাদের অবিবাহিতদের জন্য বিয়ের ব্যবস্থা কর। এবং তোমাদের সক্ষম দাসদাসীদের জন্যও। [৩৮৫]

দাসদাসীদের মধ্যে কেউ যদি বিয়ে বসতে চায় তবে অধিকাংশ আলিম বলেছেন, মালিক তাদেরকে বাধা দিবে না। কেউ কেউ মালিকের উপর ওয়াজিবও বলেছেন। আর বিয়ের পর ঐ দাসী আর মালিকের জন্য বৈধ থাকবে না [৩৮৬]।

প্রশ্ন করেন অনেকে: ইসলাম তো বলেছে, দাসীর সাথে বিয়ে ছাড়া সহবাস করার চেয়ে বিয়ে করে নেয়াই উত্তম। 'বিয়ে ছাড়া' বৈধ না রাখলেই তো হত? দাসীদের ব্যাপারে বিয়েকেই কেন একমাত্র বিধান হিসেবে দেয়া হল না? জি না, তাতে ইসলামের উদ্দেশ্য পূর্ণ হত না। আমরা আগেই বলে এসেছি যে, দাসপ্রথা ইসলামের যুদ্ধনীতি। যদি সবাই বিজয়ীর স্ত্রীর মর্যাদাই পায়, তবে কাফিররা ভয় পাবে না। যে Deterrence-এর দ্বারা ইসলাম আর দশটা যুদ্ধ এড়াতে চাচ্ছে, তা আর হয় না। শত্রুরা যখন দেখছে, তাদের স্ত্রী-বোন-মেয়েকে মুসলিমরা বিয়ে করে নিচ্ছে, স্ত্রীর মর্যাদা দিচ্ছে, তখন আর চিন্তা কি? তাই ইসলামে বিয়ে ছাড়া সহবাসও বৈধ রাখা হয়েছে, যাতে 'নিজেদের নারীদের দাসী হতে হবে'— এই চিন্তাটা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে বাধা দেয়। আমরা আগেই দেখেছি, ঘরের মেয়েরা পরের দাসী হবে, এই ভয় দেখিয়েও শত্রুদের ফেরানো যেত না, সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে চলে আসতো। আর বিয়েকে একমাত্র বিধান বানিয়ে দিলে তো আর কথাই নেই। আরও বেশি নিশ্চিন্ত হয়ে শত্রুরা যুদ্ধের ময়দানে আসতো তাহলে। 'দাসত্ব' কনসেপ্টটাই তাহলে আর রইল কোথায়। যেমন ধরুন আওতাসের যুদ্ধের পর হাওয়াযিন গোত্রের ঘটনা।

আওতাসের যুদ্ধবন্দি

ইসলামবিদ্বেষী মহলের খুব প্রিয় টপিক এই আওতাসের যুদ্ধবন্দিদের ঘটনা। বিভিন্ন জায়গায় নানা ঢঙে এই যুদ্ধের ঘটনার বিকৃত উপস্থাপন পাওয়া যায়। আমরা একটু বিস্তারিত জেনে নেব, আসলে কী কী হয়েছিল।

---

[৩৮৫] কুরআন ২৪/৩২

[৩৮৬] ঐ আয়াতের তাফসীর 'তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন', মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ.।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা বিজয়ের ঘটনায় আশপাশের আরব গোত্রগুলো হতভম্ব হয়ে পড়ে। তারা মুসলিমদের মোকাবিলায় সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। এর মাঝে ছিল তায়েফের বনু সাকীফ (নবিজির উপর পাথর বর্ষণকারী), বনু হাওয়াযিন, বনু সাদ বিন বকর (নবিজির দুধমা হালিমার কওম), বনু মুজার জুশাম ও বনু হেলালের কিছু লোক। তারা মালিক বিন আওফের নেতৃত্বে রওনা হল। আওতাস নামক স্থানে তারা শিবির স্থাপন করল। মালিক বিন আওফ গোত্রের সব নারী-শিশু-পশু নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে আসে। তার উদ্দেশ্য ছিল নিজ পরিবার ও পশু রক্ষা করার জন্য সৈন্যরা যেন জান বাজি রেখে লড়ে। যুদ্ধে পরাজয়ের পর যোদ্ধারা পালিয়ে যায় আর এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়। তার মধ্যে ছিল ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার ছাগল, দেড় লক্ষ দিরহাম পরিমাণ রূপা এবং ৬ হাজার নারী-শিশু।

মুসলিম যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টনের পর তারা দেখলেন কিছু বিবাহিতা বন্দিনীদের স্বামীরা জীবিত রয়েছে। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত : আমরা কিছুসংখ্যক মহিলাকে আওতাস যুদ্ধের দিন বন্দী করলাম। তাদের মধ্যে অনেকেরই স্বামী ছিল তাদের নিজ সম্প্রদায়ে। লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিষয়টি জানালেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হল [৩৮৭]

> "কারো বিয়ে বন্ধনে যেসব স্ত্রীলোক আবদ্ধ আছে তারাও তোমাদের জন্য হারাম; অবশ্য যারা (যুদ্ধে) তোমাদের হস্তগত হবে তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়" [সূরা নিসা : ২৪]

অর্থাৎ স্বামীওয়ালা স্বাধীন মেয়েরা তোমাদের জন্য হারাম, বন্দিনী দাসী মেয়েদের ক্ষেত্রে তা নয়। তাদের সাথে সহবাস করা বৈধ। তবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

> "সন্তান প্রসবের আগে গর্ভবতীর সাথে সঙ্গম করা যাবে না। আর গর্ভবতী নয় এমন নারীর মাসিক ঋতু শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথেও সঙ্গম করা যাবে না। [৩৮৮]

নিজ স্ত্রী-সন্তানদের দাসত্ব থেকে বাঁচাতে বনু হাওয়াযিন গোত্র ইসলামও গ্রহণ করে নেয়। হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিরা ইসলাম গ্রহণ করে নবিজির কাছে আসে।

— মুহাম্মাদ! আমাদের ও আপনার মূল তো একই, আমরা পরস্পরের আত্মীয়।

---

[৩৮৭] আবূ দাউদ ১৮৭১
[৩৮৮] [illegible] দাউদ ২১৫৭

আমাদের প্রতি দয়া করুন, আল্লাহও আপনার প্রতি দয়া করবেন। আপনি তো জানেনেই আমাদের বিপর্যয়ের কথা।

– আমি তোমাদের আগমনেরই অপেক্ষায় ছিলাম। আমার সাথে কারা আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছ (অর্থাৎ যোদ্ধারা আছে, তাদের প্রাপ্য আছে লব্ধ সম্পদে; সুতরাং সবকিছু ফেরত দেয়া যাবে না) তোমাদের নারী-শিশু কিংবা সম্পদের মাঝে কোনটা নেবে, বলো। হয় পরিবার, নয়তো সম্পদ।

– আমরা আমাদের পরিবারদের বেছে নিলাম।

– ঠিক আছে, আমার ও বনু আবদুল মুত্তালিবের অংশ তোমাদেরকে দেয়া হল। এরপর নবিজি দাঁড়িয়ে মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন: লোকেরা শোনো, মূলকথা হল— তোমাদের ভাইয়েরা অনুতপ্ত হয়ে আমাদের কাছে এসেছে। আমি তাদের যুদ্ধবন্দিদের ফেরত দিতে চাই। তোমরা কেউ চাইলে খুশিমনে ফেরত দিতে পার। আর যদি কেউ তার অংশ না ছাড়তে চাও, তাকে দেয়া হবে ৬ গুণ (১ যুদ্ধবন্দির বদলে ৬ উট) কিংবা তবে পরের যুদ্ধের গনিমত থেকে তার অংশ আগে শোধ করে দেয়া হবে।

নবিজির এই কথা শুনে আনসার-মুহাজিররাও নিজেদের অংশ ছেড়ে দিল। ইতোপূর্বে বণ্টনকৃত সকল নারী-শিশু হাওয়াযিন গোত্রকে ফেরত দেয়া হল। [৩৮৯] অর্থাৎ বণ্টনের ২-৩ দিনের মাঝেই বন্দিনীরা নিজ পরিবারে ফেরত গিয়েছিল।

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ

ইসলামবিদ্বেষীদের খুব প্রিয় হাদিস এটা... আবূ সাঈদ রা. বলেন:

> “ আমরা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধাভিযানে বের হই। তখন আমাদের হাতে কিছু মহিলা বন্দী হয়। ঐ সময় আমরা স্ত্রীদের থেকে দূরে অবস্থান করায় নারী বন্দীদের প্রতি আমাদের আকাঙ্খা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর আমরা তাদেরকে **অধিক মূল্যে বিক্রি করার ইচ্ছায় তাদের সাথে আযল (যোনির বাইরে বীর্যপাত) করার সিদ্ধান্ত নিলাম**। আমরা ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সাথেই আছেন। কাজেই তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস না করে আযল করা উচিৎ হবে না। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : **'তোমরা এরূপ না করলেই বা কি ক্ষতি? কেননা কিয়ামাত**

[৩৮৯] মুসনাদে আহমাদ ২/১৮৪-৩২৬-৩২৭, আবু দাউদ ২৬৯৩-২৬৯৪, বুখারি ৪৩১৮-৪৩১৯ [শাইখ ইবরাহিম আলি, সীরাতুন নাবি, ৪/৭৩৭-৭৩৮, মাকতাবাতুল বায়ান]

পর্যন্ত যারা সৃষ্টি হবে বলে নির্ধারিত তারা তো জন্মাবেই'। [৩৯০]

মানে হল, দীর্ঘদিন স্ত্রীসঙ্গ-বঞ্চিত থাকায় সেনাদলের মাঝে নারীসঙ্গের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়েছে। আবার ওদিকে বন্দিনী রাখার মত আর্থিক সঙ্গতিও নেই, ফলে বিক্রি করে দিতে হবে। কিন্তু গর্ভবতী হয়ে গেলে আবার মূল্যহ্রাস হয়ে যায়। তাই নিজ নিজ মালিকানাধীন বন্দিনীদের সাথে আযল বা যোনির বাইরে বীর্যপাত করা যাবে কি না। জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী, কোন কোন পদ্ধতি অনুমোদিত—এসব নিরূপণে অত্যন্ত জরুরি হাদিস এটা।

আমাদের এতক্ষণের আলোচনার সাথে এর কোনো বৈপরীত্য নেই। বন্দিনীকে সম্পত্তি হিসেবে গ্রহণ, ক্রয়-বিক্রয়, যৌন-সুবিধা গ্রহণ এগুলো আমরা আলোচনা করে এসেছি। সমস্যা হল, এর পরে কী ঘটেছে, সেটুকু আপনাকে আর জানানো হবে না। ইসলামবিদ্বেষী মহল সেটুকু আর উচ্চারণ করবে না। বনু মুস্তালিক উহুদের যুদ্ধে কুরাইশের পক্ষে যুদ্ধ করে। এই দফা তারা নিজেরাই নবিজির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এ খবর পেয়ে নবিজি নিজেই আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করেন। মুস্তালিকের যুদ্ধে ২০০ পরিবার বন্দি হয়, প্রচুর গবাদিপশু গনিমত হিসেবে গৃহীত হয়। তাদের গোত্রপ্রধান হারেস বিন আবু যিরার খুযাঈ-র কন্যা (যিনি সাবিত বিন কায়েস রা. এর ভাগে পড়েছিলেন) ইসলাম গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা থেকে গোত্রপতির কন্যার প্রতি সম্মানার্থে স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মুক্ত করে বিবাহ করেন। নবিজির 'শ্বশুর বংশের লোক' বলে সম্মানার্থে মুসলিমরা যার যার বন্দিকে মুক্ত করে দেন ও সমস্ত গনিমতের মাল ফিরিয়ে দেন [৩৯১]। সাহাবিদের এই মহানুভবতায় গোত্রপতি হারেস-সহ পুরো গোত্র মুসলিম হয়ে যায় ও খাঁটি মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করে। [৩৯২]

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাসী

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুইজন দাসী থাকার কথা প্রসিদ্ধ (তবে আবু উবায়েদ রহ. বলেছেন তাঁর সাকুল্যে ৪ জন দাসী ছিল [৩৯৩])। একজন হলেন বনু নাযির গোত্রের রাইহানা রা. (সাবেক ইহুদি), এবং অন্যজন মিসরের শাসক কর্তৃক

[৩৯০] বুখারী ২৫৪২, মুসলিম ১৪৩৮
[৩৯১] সুনানে আবু দাউদ ৩৯৩১
[৩৯২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬/১৮১, ইবনু হিশাম ২/২৮৯-২৯৫
[৩৯৩] যাদুল মাআদ ১/১১১

উপহার হিসেবে পাঠানো মারিয়া রা. (সাবেক খ্রিষ্টান)।

দুইজনের ব্যাপারেই এই বিতর্ক রয়েছে যে, তাঁরা নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাসী-ই (উপপত্নী) ছিলেন শেষ পর্যন্ত, নাকি তাঁদেরকে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করে নিয়েছিলেন। পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথাবার্তা রয়েছে, সেই বিতর্ক আমাদের বিষয়বস্তু না। বিয়ে করে নিলে তো আর কোনো কথাই থাকে না। আমরা ধরে নিচ্ছি, তাঁরা দুজনা দাসী-ই ছিলেন। এবং নবিজি তাঁদের সাথে শারীরিক সম্পর্কে ছিলেন। দুটি মতের ভিতরে এটাই বেশি প্রমাণিত মত, বিভিন্ন হাদিস ও বিশুদ্ধ ঘটনা দ্বারা এটাই বুঝা যায় [৩৯৪]।

এই ইস্যু টেনে ইসলামবিদ্বেষীরা রসিয়ে রসিয়ে বুঝাতে চায়, নবিজি বিবাহবহির্ভূত 'অনৈতিক' সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। আমরা দেখেছি—

১.

আধুনিক যুগের আগে (১৫০ বছর আগেও) দাসীর সাথে সহবাস 'অনৈতিক' পরিগণিত হত না। দাসীর সাথে সহবাস অনৈতিক, এটা আধুনিক কালের ধারণা।

২.

ইসলামে নিজ মালিকানাধীন দাসীর সাথে শারীরিক সম্পর্কে বিবাহের প্রয়োজন নেই। স্বাধীনা নারীর জন্য বিবাহ, পরাধীনা নারীর জন্য মালিকানার দ্বারা আইনত বৈধ যৌন-অধিকার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং নবিজির সম্পর্কও না অনৈতিক, আর না অবৈধ।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। হিন্দুধর্মে কাজিন বিয়ে করা (চাচাতো-মামাতো-ফুফাতো-খালাতো) নিষিদ্ধ ও অজাচার (incest)। ইসলাম ধর্মে বৈধ। হিন্দুদের পরিচালিত ইসলামবিদ্বেষী সাইটগুলোতে বলা হয়: মুসলিমরা 'অজাচার' করে, কারণ তারা কাজিন বিয়ে করে। ব্যাপারটা সঠিক হলো? ইসলাম তো একে অজাচার হিসেবে ধরেই না। কেবল আপন ভাইবোনদের মাঝে হলে সেটাকে অজাচার বলে। এখন কোন বেকুব হিন্দুদের আপত্তি শুনে যদি ভাবে ইসলাম আপন ভাইবোনদের অজাচারকে বৈধ করেছে, ইসলাম কী জঘন্য! তাহলে এই মূর্খতাকে কী বলবেন? ইসলাম তো নিজ দাসীর সাথে 'বিয়ে ছাড়া মিলন'-কে বৈধ সম্পর্কই মনে করে। নবিজি যেটা করেছেন, আল্লাহর হুকুম ও ইসলামের নৈতিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে করেননি। এর দ্বারা তাঁর চরিত্র হনন হয় না। ১৪০০ বছর পর এসে নতুন নতুন

---

[৩৯৪] তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৪৪২

সভ্য হয়ে 'দুইদিনের বৈরাগী, ভাতকে বলে অন্ন', নাকি?

তাফসীরে তাবারির একটা ঘটনা উল্লেখ করে বদ্ধমনা গোষ্ঠী প্রমাণ করতে চায়, নবিজি স্ত্রীদের অগোচরে দাসীদের সাথে মিলিত হতেন এবং ধরা পড়ে বদনামির ভয়ে গোপন রাখতে বলেছেন। অথচ ঘটনাটার মধ্যেই উত্তর রয়েছে।

ঘটনাটি হল, রাত্রিযাপনের জন্য স্ত্রীদের মাঝে নবিজির দিন ভাগ করা ছিল। হাফসা রা. এর পালার দিনে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারিয়া রা. এর সাথে মিলিত হন। এতে হাফসা রা. কষ্ট পান। নবিজি তাঁকে খুশি করার জন্য বললেন:

– তুমি এ কথা কাউকে বলো না। ইবরাহীমের মা (মারিয়া)-কে আমি নিজের উপর হারাম করে নিলাম।
– আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি নিজে তা নিজের উপর হারাম করছেন?
– আল্লাহর শপথ, আমি আর কখনও তার কাছে একান্তে যাবো না।

উমার রা. বলেন: নবিজি এরপর থেকে আর গেলেন না মারিয়ার কাছে, ওদিকে হাফসা রা. বিষয়টি গোপন না রেখে আম্মাজান আয়িশা রা. কে বলে দিলেন ঘটনাটা। এর উপরেই আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন:

> “ হে নবী, আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনায় তুমি কেন তা হারাম করছ? আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। নিশ্চয় তোমাদের জন্য শপথ হতে মুক্তির বিধান দিয়েছেন; আর আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান। [সূরা তাহরীম ৬৬: ১-২]

নবিজির প্রতিজ্ঞার বিপরীতে আম্মাজান হাফসা রা. এর কথাটি খেয়াল করুন: 'আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি নিজে তা নিজের উপর হারাম করছেন?' অর্থাৎ আম্মাজান নবিজির চরিত্র বা নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন না। তিনি জানেনই যে এটা হালাল এবং অনৈতিক কিছু না। সুতরাং, হে স্বামী! আপনি আমার কারণে নিজের উপর ঐ জিনিস হারাম করবেন না, যা স্বয়ং আল্লাহ আপনার জন্য বৈধ করেছেন। মানে, যার বিয়ে তার খবর নেই, ১৪০০ বছর পর পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।

আরেকটা আপত্তি এভাবে তোলা হয়, মারিয়া রা. তো যুদ্ধবন্দি ছিলেন না। প্রাচীন কালে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উপঢৌকন হিসাবে দাস-দাসী প্রেরণ করা খুবই স্বাভাবিক ও প্রচলিত রীতি ছিলো। এভাবে উপঢৌকন হিসাবে দাস-দাসী পেলে তা গ্রহণ করাও ইসলামে বৈধ। যেমন, আম্মাজান খাদিজা রা. নিজ

স্বামী রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপহার দিয়েছেন দাস যায়েদ বিন হারিসা রা.-কে।

আমরা দেখেছি ইসলামে স্বাধীন মানুষকে দাস বানানোর একমাত্র প্রক্রিয়া 'ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। আর দাস-দাসীর সন্তান আসলে মুক্ত-ই হয়নি, 'দাস' স্ট্যাটাসেই আছে, সুতরাং সেও স্বাধীন নয়। 'দাস সাপ্লাই'-এর অন্যান্য পদ্ধতি (অপহরণ, নিজ সন্তানকে বা নিজেকে দাসত্বে সমর্পণ ইত্যাদি) ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামের নিষিদ্ধ অনেক কিছুই মুসলিমরা করেছে ও করছে। মদ খাচ্ছে, সুদ খাচ্ছে, চুরি-দুর্নীতি-যিনা করছে, নামায পড়ছে না। একইভাবে দাস রিক্রুট, দাসের সাথে সদাচরণের ক্ষেত্রেও নিষিদ্ধ পন্থা অবলম্বন করছে গুনাহগার মুসলিম দাসব্যবসায়ীরা। এটা অস্বীকারের সুযোগ নেই। তবে যেভাবেই হোক 'দাস' স্ট্যাটাসে আসার পর তাকে ক্রয় করা এবং পুনরায় বিক্রয় করায় আর কোনো বাধা নেই। গুনাহ হয়েছে প্রথম যে ব্যক্তি অবৈধ পন্থায় তাকে দাস বানিয়েছে, তার। এজন্য উপহার হিসেবে গ্রহণ ও বাজার থেকে ক্রয় করা অনুমোদিত, তার প্রথম রিক্রুটমেন্ট বৈধ বা অবৈধ, যা-ই হোক। রাসুলুল্লাহ(ﷺ) সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হুকুমের ভেতরে থেকেই মারিয়া কিবতিয়া রা.-কে গ্রহণ করেছেন।

দাসের সন্তান ইস্যু

দাসত্বে গ্রহণের কারণ কী? ইমাম শাওকানী বলেন: দাসত্বের কারণ হল কুফর ও ইসলামের বিরুদ্ধে লাগতে আসা। হিদায়া গ্রন্থে আছে দাসত্বে আনার কারণ হল: তার দুষ্কর্মের দ্বারা ইসলামের যে ক্ষতি হতো, সেটা আটকানো। কিন্তু দাস-দাসীর সন্তান কেন দাস হবে? তার কী দোষ? সে তো ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেনি, ইচ্ছে করে দাস-পরিবারে জন্মও নেয়নি? ইসলাম তো একজনের পাপ আরেকজনের ঘাড়ে চাপানো-তে বিশ্বাস করে না। কয়েকটা ইস্যু আছে এখানে—

- কী দোষ? একই প্রশ্ন দাসীর ক্ষেত্রেও করা যায়। দাসীদের কেন দাসী বানানো হয়, তাদেরও তো অপরাধ নেই। আমরা আলোচনা করেছি, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা সত্ত্বেও কাফির নারীদেরকে দাসত্বে গ্রহণ করা হয়েছে কেন:
  - Deterrence সৃষ্টি: নারীরা দাসী হয়ে যাবে, এই ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ এড়ানো
  - কাফির নারীদের দ্বারা ইসলামের ক্ষতির সুযোগ মথিত করা: কাফিরদের সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা তারা ইসলামের ক্ষতির যোগ্যতা রাখে। সেটা বন্ধ করা।
  - মুমিনদের উপকৃত করা

– প্রাণ বাঁচিয়ে হিদায়াতের পরিবেশে রাখা
– ভরণপোষণ

এই ৫ টি কারণ যুদ্ধরত কাফিরদের শিশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। খেয়াল করে দেখুন।

- দ্বিতীয়ত, যেহেতু বাবা-মা দাস, সুতরাং দাস-দাসীর সন্তানও সামাজিকভাবে 'দাস' স্ট্যাটাসেই আছে। ফিকহের গ্রন্থে রয়েছে, যে যে কারণে তার স্ট্যাটাস পরিবর্তন হবার কথা, সেই কারণগুলো ঘটেনি বলে সে পরাধীনই থাকবে। যেমন
  – গর্ভবতী দাসীকে মুক্ত করলে গর্ভের সন্তান মুক্ত হয়ে যাবে, কেননা সে দাসীর শরীরের অংশ, মুক্ত হবার পক্ষে একটা 'কারণ' রয়েছে।
  – বা মালিক মুক্ত করে দিয়েছে, এটাও মুক্ত হবার একটা কারণ।
  – মালিকের সন্তান হলে মুক্তির কারণ আছে। (মালিকের বংশ)।

তার অপরাধের কারণে সে দাস হয়ে গেছে, এমন না ব্যাপারটা। 'দাস' মর্যাদা থেকে বের হবার জন্য একটা কারণ তো লাগবে। ফকীহরা বলেছেন: দাসের সন্তানের মাঝে মুক্তির কারণ পাওয়া যায় না। সেটা অনুপস্থিত বলে সে দাস।

- দাসত্বের আরেকটা কারণ কুফর থেকে বের করার পরিবেশে আনা। অমুসলিম দাসদাসীর সন্তান এখনও কুফরের পরিবেশেই আছে। সুতরাং দাসত্বে থাকা তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য দরকার, যেমনটা তার মা-বাবার জন্য।

সামগ্রিকভাবে বুঝার চেষ্টা করলে বুঝা যায়।

শেষ কিংবা শুরু

বড় আজব এক টালমাটাল সময়ে বাস করছি আমরা। মানবসভ্যতা ইতিপূর্বে এতো ব্যাপকভাবে এতো অস্থির সময় পার করেনি। হাজার হাজার বছরের মানবসভ্যতার ইতিহাসে গত ২০০ বছর এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। আমাদের চিন্তা-চেতনায়, জীবনযাপনে, জীবনোপকরণে,পদ্ধতি-প্রতিষ্ঠানে। এতো বেশি সংখ্যক মানুষ এর আগে কখনো ব্যভিচার-সমকামকে স্বাভাবিক ভাবেনি। এতো বেশি সংখ্যক মানুষ গর্ভধারণকে এর আগে কখনও শত্রু ভাবেনি। ইতিপূর্বে কখনও পরিবারকে-সমাজকে আপদ হিসেবে, ব্যক্তিস্বাধীনতার শত্রু হিসেবে দেখা হয়নি। মানুষে মানুষে পরস্পর দায়িত্ববোধ বাণিজ্যিকীকরণ হয়ে যায়নি।

- মায়ের মমতা নিয়ে ব্যবসা (ডে-কেয়ার/ দত্তক সার্ভিস),
- মায়ের গর্ভ নিয়ে ব্যবসা (সারোগেট মাদার),
- সামাজিক অর্থসাহায্য নিয়ে ব্যবসা (মাইক্রোক্রেডিট),
- জীবনরক্ষাকারী ওষুধ নিয়ে মনোপলি (বিগ ফার্মা),
- স্ত্রীর আলিঙ্গন নিয়ে ব্যবসা (কাডলিং সার্ভিস),
- শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা (প্রাইভেট এডুকেশন),
- যৌনতা নিয়ে ব্যবসা (সেক্সডল, সেক্সটয়, এসকর্ট সার্ভিস) ...

এতো চিত্রবিচিত্র ব্যবসা...অকল্পনীয়। পরিবারকে অকেজো করে দিয়ে, সমাজকে অকেজো করে দিয়ে মানুষগুলোকে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কিছু রোবটে পরিণত করে ছেড়েছে আধুনিক সভ্যতা। যে রোবটগুলো নিয়ন্ত্রিত হবে রাষ্ট্র দিয়ে, আর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হবে ব্যবসায়ীদের দিয়ে। ব্যবসায়ীরা ভালো না লাগলে বছর বছর রাষ্ট্রের খোলনলচে বদলে নিতে পারবে (গণতন্ত্র)। যে চাহিদা পরিবার পূরণ করত (মমতা, বাল্যশিক্ষা, যৌনতা, খাবার,স্ট্রেসমুক্তি, বয়স্কযত্ন, সন্তানধারণ) সেগুলোর বিকল্প পণ্য-সেবা সৃষ্টি করেছে এই ব্যবসায়ীরা, করে ব্যবসা জমিয়েছে। যে চাহিদা সমাজ পুরা করত (বিচারিক,

অর্থনৈতিক, অনুষ্ঠানাদি), ব্যক্তিস্বাধীনতা দিয়ে সমাজকে ধ্বংস করে, সেখানে ব্যবসা পণ্য-সেবা দিয়ে বিকল্প নিয়ে এসেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার উত্তরাধিকারী আজকের মাল্টিন্যাশন্যাল কোম্পানিরা। স্থানীয় কোম্পানিগুলোও কোনো না কোনোভাবে তাদের উপরই নির্ভর করে (কাঁচামাল বা প্রযুক্তি বা কেমিক্যাল বা অর্ডার)।

বর্তমান চিন্তাকাঠামোয় অতীত জঘন্য, অমানবিক, বর্বর। অতীতের সকল মূল্যবোধ, সকল প্রথা-প্রতিষ্ঠান, সকল আবেগ-অনুভূতি পরিত্যাজ্য। অতীতের কথা মনেও আনা যাবে না, অতীতের কোনো স্থান নেই। কেননা অতীত ব্যবসাবান্ধব না। ইনফ্যাক্ট মানুষকে ব্যবসাবান্ধব ও ভোগমুখী করতে হয়েছে-ই অতীতকে ধ্বংস করে। অতীত ব্যবসার শত্রু। এজন্য আধুনিক হতে হবে, অতীতের প্রতিটি উপাদানকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। যা যা মানুষকে শৃঙ্খলিত করে (পড়ুন সুশৃঙ্খল করে), যা যা মানুষের ভোগকে সীমিত করে পরার্থপরতা শেখায় (পরিবার-সমাজ-ধর্ম), সেগুলোকে ভিলেন সাব্যস্ত করতে হবে। নারীকে বলতে হবে 'পরিবার তোমার ভালো চায় না, বেরিয়ে এসো, কোনো কম্প্রোমাইজ নেই' 'সমাজ তোমাকে থামিয়ে রেখেছে, ন-ডরাই'। পুরুষকে বলতে হবে 'একটাই জীবন, এনজয়' (পড়ুন ভোগ করো, ভোক্তা হও)। শিশুদের বলতে হবে 'গাড়িঘোড়া চড়ে সে, লেখাপড়া করে যে'। ভোক্তা হবার জন্য পড়ো, শেখার জন্য না। এ খতিয়ান চললে বই আর ফুরবে না।

এই চিন্তাকাঠামোয় যেহেতু অতীতের সবকিছুই প্রবলেম, দাসপ্রথা তো আরও বড় প্রবলেম, আরও আগে থেকেই প্রবলেম। আসলে ইসলামের যুগেও দাসপ্রথা একটা সমস্যা-ই ছিল। সমস্যা ছিল বলেই একে মানবিক করার প্রয়োজন পড়েছে। বিদ্যমান প্রতিটি অর্গানিক প্রতিষ্ঠানে সমস্যা ছিল বলেই ইসলাম এসেছে। পরিবারকে রিডিফাইন করেছে, সমাজ-আইন-অর্থনীতি-সংস্কৃতি-রাষ্ট্র-সমরনীতিকে সংস্কার করেছে, নীতিমালা দিয়েছে। একইভাবে দাসপ্রথা-কেও। আর বিপরীতে প্রচলিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে পশ্চিমা সভ্যতা ন্যাক্কারজনক পর্যায়ে নিয়ে গেছে। গ্রীক-রোমান সভ্যতার দাসপ্রথাকে পেরিয়ে আমেরিকার দাসপ্রথা আরও পাশবিক দৃষ্টান্তে পৌঁছে গেছে। আধুনিক যুদ্ধে বেসামরিক হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি অতীতের যেকোনো রেকর্ডকে ভেঙে দিয়েছে। জাপান আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবছে, এমন খবর মার্কিনীদের কাছে থাকা সত্ত্বেও কেবল বিশ্বশক্তি হিসেবে নিজেদের জানান দিতে দুটো শহর পারমাণবিক বোমা দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, এই পশুত্ব তো অতীতে চেঙ্গিজ খানও করে দেখাতে পারেনি। গত শতাব্দীতে যে পরিমাণ যুদ্ধ ও কষ্ট মানুষ ভুগেছে,

গত ১ হাজার বছরে সে পরিমাণ মানুষ একসাথে ভোগেনি। বলা হয়, ইসলাম তরবারির জোরে ছড়িয়েছে। তাহলে সেক্যুলার লিবারেল মডার্নিটি ধর্ম কী দিয়ে ছড়িয়েছে, ফুল না চকলেট? কলোনি গেড়ে আমাদের যে এসব ছাইপাশ শেখালে, এখনও যে বোমা ফেলে নারী-অধিকার, এলজিবিটি অধিকার শেখাচ্ছো, এগুলো তাহলে কী?

University of Illinois এর প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার প্রোফেসর Lawrence H. Keeley তাঁর *War Before Civilization* বইয়ে তথ্য-উপাত্তের দ্বারা দেখিয়েছেন, আধুনিক যুগের আগের যুদ্ধগুলোর প্রধান নিয়ামক ছিল 'মানুষ'। যাদের যোদ্ধাসংখ্যা বেশি, তারা জিতবে। এখন যেমন যুদ্ধে প্রধান অস্ত্র হল প্রযুক্তি; প্রযুক্তিহীন যুগে ছিল— মানুষ। এজন্য সেসময় গণহত্যা এবং দাসপ্রথা ছিল শত্রুজাতিকে শক্তিহীন করার কালচার। গণহত্যা ছিল শত্রুর অস্ত্র ধ্বংসের মত একটা বিষয়। গণহত্যা ও দাসপ্রথার মাঝে ইসলাম দাসপ্রথাকে বেছে নিয়েছে। এবং ইফেক্টিভলি দাসপ্রথাকে 'নিজের মানুষ' বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করেছে। দাসদের হাতে ইসলামের আইনশাস্ত্র বিকশিত হয়েছে। দাসরাই ইসলামের পক্ষে লড়েছে নিজ জাতির বিরুদ্ধে। মধ্য-এশীয় মামলুক দাসদের হাতেই হেরেছে মোঙ্গলরা... স্তেপের হাতে স্তেপ পরাজিত হয়েছে। জ্যানিসারি কমান্ডার রাদু বে লড়েছে আপন ভাই ভ্লাদ ড্রাকুলার সাথে। নিজ জাতির সাথে যুদ্ধ করে মুসলিম বিশ্বের সীমানা বাড়িয়েছে অটোমান জ্যানিসারিরা। ভারতবর্ষে মামলুক শাসন পোক্ত করেছে মুসলিম আমলকে।

মানুষ রাফলি ৩ বছরে একটি সন্তান জন্ম দেয়। দুধপানের সময়টাকে আমরা আপাতভাবে গর্ভধারণ-বিরোধী কাল হিসেবে গণ্য করি (natural contraception), বহু ব্যতিক্রম সহই। একটি গোত্রের সক্ষমতা (জনসংখ্যা) বৃদ্ধিতে এটা একটা বাধা, কেননা গর্ভসংখ্যা সীমিত। এজন্য প্রাচীনকাল থেকে পরাজিত জাতির নারীদের দাসী বানানো এবং তাদের সাথে সহবাসের কালচার তৈরি হয়েছে। গর্ভসংখ্যা বেড়েছে, গোত্রশক্তি বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। শত্রুনারীদের জুটেছে আশ্রয় ও জীবনের নিরাপত্তা। আমরা কেবল আধুনিক চিন্তাকাঠামোয় ইসলামকে সেট করে বিচার করছি। ইসলাম তো সেযুগের জন্যও এসেছিল, যে যুগে গোত্রশক্তি বাড়াতে শত্রুনারীদের গর্ভগুলো প্রয়োজন ছিল। আজ যা আমাদের কাছে নৈতিকভাবে খারাপ মনে হচ্ছে, সেটাই ওই যুগে ছিল 'প্রয়োজন', যুদ্ধ করে টিকে থাকার জরুরি উপায়। তখন দাসপ্রথা ও দাসী-সহবাসকে বিলোপ করে দেয়াটাই হতো অপরিণামদর্শী ও আত্মবিধ্বংসী সিদ্ধান্ত। দাসপ্রথা ও দাসীমিলন বজায় রাখার লাভটা কী ছিল, তা ইসলামী ভূখণ্ডের এই বিস্তার, ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রের এই গভীরতা ও বিকাশ থেকে সুস্পষ্ট। দাসপ্রথা ও

দাসীমিলন বিলোপ করে দিলে ইসলাম সেই উমাইয়া যুগেই দাফন হয়ে যেত (বস্তুগত নজরে)।

দাসপ্রথার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান আবারও প্রমাণ করে যে, ইসলাম ঐশী ব্যবস্থা। সবযুগে সবকালে সবযুদ্ধে ইসলাম দাসপ্রথাকে আবশ্যক করেনি, বরং খলিফার (যিনি আইনশাস্ত্রবিদদের পরিষদ দ্বারা চালিত) এখতিয়ারে বিষয়টি সমর্পণ করেছে। যে যুগে দাসগ্রহণ একটা বাস্তব প্রয়োজন ছিল, ইসলাম সে যুগেরও সিস্টেম। প্রয়োজনীয় ব্যাপারটাকে সর্বোচ্চ মানবীয় রূপ দিয়েছে। বর্তমান খিলাফতবিহীন যুগেরও সমাধান ইসলামে, যে যুগে দাসপ্রথাকে ছাড়াও ইসলাম অনুসরণে কোন সমস্যা নেই। আবার ভবিষ্যতে মানবজাতি একই বাস্তবতার মুখোমুখি হলে, তখনও ইসলামই ফয়সালা। এজন্য দাসপ্রথাকে ইসলাম যুগের ইমামদের (নেতৃত্বে যারা) হাতে সোপর্দ রেখেছে। নামায-রোযা-যাকাত-হদ্দ ইত্যাদির মত অ্যাবসলিউট কোনো বিষয় না। এখানেই ইসলামের আবেদন চিরন্তন।

তবে আধুনিকতার নামে যে ব্যবস্থা পশ্চিমা সভ্যতা দিচ্ছে, তা কোনো দিক দিয়েই ইসলামের সমাধানের চেয়ে উত্তম তো নয়-ই, বরাবরও নয়। যুদ্ধকালীন অনেক সমস্যার সমাধান পশ্চিমের কাছে নেই, সে সমাধান ইসলাম দাসপ্রথার দ্বারা করেছিল। জেনেভা কনভেনশন কী প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যর্থ ও অপব্যবহৃত হয়েছে ও হচ্ছে, তা দিবালকের মত স্পষ্ট। মানুষের সাইকোলজির স্রষ্টা সেই নাজুক জায়গা থেকেও বাঁচানোর জন্য, সেইসাথে আখিরাতের চিরশাস্তি থেকে বাঁচার শেষ সুযোগ হিসেবে কাফির সেনার জন্য রহমত হিসেবে দাসপ্রথার লঘুতম বিধান দিয়েছিলেন। যা আজকের আধুনিক দুনিয়ায়ও প্রাসঙ্গিক। অসহায় কাফির নারীকে পারিবারিক আবহ দেবার জন্য, অনিশ্চিত ভবিষ্যত থেকে সুনিশ্চিত মুক্তি ও সচ্ছল জীবন দেবার জন্য একটা ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। আজও তো শরণার্থী শিবিরে নারী পতিতাবৃত্তি করেই খাচ্ছে, এককেটা যুদ্ধে হাজারো লাখো নারী গণধর্ষিতা হচ্ছে। আজও তো ৪ কোটি মানুষ দাস হিসেবে বাধ্যতামূলক স্বাধীনতাহীন শ্রম দিয়েই যাচ্ছে। বাস্তবতা দুই হাজার বছর আগে যা ছিল, এখনও তা-ই আছে। মাঝখান দিয়ে ইসলামের আরোপিত মানবতাটুকু, মুক্তির অঢেল সুযোগের ব্যবস্থাটুকু 'নাই' হয়ে গেছে।

আমেরিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশে দাসপ্রথা ছিল পুরো মানবেতিহাসে দাসপ্রথার সবচেয়ে কলঙ্কজনক ভার্সন। গ্রীক-রোমান-মিসরীয় সভ্যতায়ও এতো নীচে নামার নজির নেই। ফলে যখন শুনি 'ইসলাম অনুমোদন দিয়েছে দাসপ্রথাকে', তখন আমাদের মনে আমেরিকার চিত্রটাই ভেসে ওঠে, চেপে বসে হীনম্মন্যতা— এতো পাশবিক একটা

জিনিস আল্লাহ কীভাবে অনুমোদন দিলেন? আমরা কাঠগড়ায় তুলে বসি কুরআন-হাদিসকে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যারা আপত্তি উত্থাপন করেন, তাদের একটা সাধারণ মাইন্ডসেট এটা। পশ্চিমের চিত্রগুলোকে ইসলামের উপর আরোপ করে প্রশ্ন ছুঁড়তে থাকা। ইউরোপীয় দাসপ্রথা, ইউরোপীয় গীর্জার শাসন, ইউরোপীয় খৃষ্টধর্ম—চশমার মত চোখে সেঁটে আছে। ইসলামের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও চিত্রের সাথে ইউরোপের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সাথে গুলিয়ে ফেললে আপনি বাস্তবতা বুঝতে ব্যর্থ হলেন। ঠিক যেমন ইসলামের শাসনের সাথে খৃষ্টবাদের শাসন মিলিয়ে ফেললে আপনি ইতিহাস পাঠে ব্যর্থ। ইসলামের স্বর্ণালী মধ্যযুগের সাথে খৃষ্টবাদের অন্ধকার মধ্যযুগ মিলিয়ে ফেললে আপনি ব্যর্থ। 'ধর্ম' ক্যাটাগরিতে হিন্দুধর্ম, খৃষ্টধর্মের সাথে ইসলাম-কে রাখলে আপনি ব্যর্থ। নারীর প্রতি ইউরোপীয় গীর্জার আচরণ আর ইসলামের আচরণ এক করে ফেললে আপনি ব্যর্থ। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সম্পর্ক পড়তে গিয়ে যদি আপনি ইসলামকে আলাদা করতে না পারেন, আপনি ব্যর্থ। ঠিক তেমনি ইউরোপ-আমেরিকার করা এই যুলুম দিয়ে ইসলামের দাসপ্রথাকে বুঝতে চাইলে আপনি অন্যায় করলেন। ইসলামে দাসপ্রথার কনসেপ্টটাই পুরোপুরি ভিন্ন। এবং ইসলামের দাসপ্রথাকে ইসলামের মতো করেই চিত্রায়ন করতে হবে, পশ্চিমা ধারণার উপর নয়। এটাই জ্ঞানতত্ত্বের দাবি। ক্যাপ্টেন রিচার্ড বার্টন ছদ্মবেশে মক্কা-মদীনা ভ্রমণ করে মন্তব্য করেন:

> " দাসদের অবস্থা নিয়ে আমি আর কিছু লিখলাম না, কারণ ইংল্যাণ্ড অলরেডি জেনে গেছে যে দাসরা এ মুলুকে সবচেয়ে নিপীড়িত জনগোষ্ঠী না। কেউ কেউ তো ব্রিটিশ জনগণকে বলেছে: ওরিয়েন্টাল মুলুকে মুক্ত কাজের লোকের চেয়ে দাসরা বেশি বেতন পায়। 'মুহাম্মদীয় আইন তার অনুসারীদের আদেশ করে দাসদের সাথে সর্বোচ্চ মৃদু ব্যবহার করতে। আর মুসলিমরা সাধারণত তাদের নবীর কথা যথাযথ পালন করে। দাসদেরকে পরিবারের সদস্যই মনে করা হয়। যেসব বাসাবাড়িতে মুক্ত কাজের লোকও থাকে, সেখানে দাসরা এই পাইপে জল ভরা, কফি পরিবেশন, বাইরে বের হবার সময় মালিকের সাথে থাকা, দুপুরে ঘুমের সময় পা টেপা, মাছি তাড়ানো— এসব ছাড়া অন্যান্য কাজ কমই করে। কোনো দাস সন্তুষ্ট না থাকলে, আইনত মালিককে বাধ্য করতে পারে তাকে বিক্রি করতে অন্য কোথাও। থাকা-খাওয়া-পরা নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা নেই। তাদের কোনো ট্যাক্স নেই। সেনাবাহিনীতে যেতে হয় না, খাজনাপাতি দিতে হয় না। দাসত্ব সত্ত্বেও তারা মিশরের সবচেয়ে মুক্ত লোকের চেয়েও মুক্ত'। আমি মনে করি, এই কথাগুলো সত্য। কিন্তু তবু দাসপ্রথা ব্যাপারটাই প্রশ্নবিদ্ধ থেকেই যায়। [৩৯৫]

[৩৯৫] Captain Sir Richard F. Burton (১৮৯৩), Personal Narrative Of A Pilgrimage To Al-Madinah And Meccah

হ্যাঁ, প্রশ্ন তো থাকবেই। অন্ধের অনেক প্রশ্ন ! এক অন্ধকে বলা হল:

– দুধ খাবেন?
– দুধ কেমন?
– শাদা।
– শাদা কেমন?
– শাদা রঙের... যেমন বক।
– বক কেমন?
– বক হলো... বড় শক্ত ঠোঁট আছে, আর শাদা রঙের পালক।
– ওরে বাবা... দুধ এমন জিনিস? না বাবা, দুধ খেয়ে আমার কাজ নেই। গলায় আটকে যাবে।

বিশ্বাস এক ইন্দ্রিয়ের নাম। যার বিশ্বাসের ইন্দ্রিয় নেই, তার প্রশ্নের শেষ নেই। মাত্রই স্বীকার গেল মুসলিম দেশে দাসেরা 'মুক্ত লোকের চেয়েও মুক্ত', আবার বলে: তবু একটা 'কিন্তু' আছে। যার বিশ্বাসের ইন্দ্রিয় আছে, সে আল্লাহ বললেই বুঝে ফেলে আল্লাহ কী? রাসুল বললেই বুঝে ফেলে, শরীয়াহ বললেই বুঝে ফেলে, আখিরাত বললেই বুঝে ফেলে। যেমন চোখওয়ালার 'দুধ' শুনলেই আর কোনো প্রশ্ন নেই; দুধ বললেই বুঝে ফেলেছে দুধ কী? আর যার বিশ্বাসের ইন্দ্রিয় অন্ধ, সে বলে: ওরে বাবা, শরীয়া চাই না, গলায় আটকে যাবে যে। আমার প্রশ্ন আছে।

বিশ্বাস নিজেই কি অন্ধ? না, একথা যারা বলে তারা 'বিশ্বাস' সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না। এবং তারা নিজেরাও বিজ্ঞানকে বা বিজ্ঞানীদেরকে অন্ধভাবেই বিশ্বাস করে। শতচ্ছিন্ন কাপড়ের এক ভিক্ষুককে একজন ধোপদুরস্ত ব্যক্তি গলা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। কাউকে চুরি করতে দেখলে, গালিগালাজ করতে দেখলে, যে কেউ প্রথম দেখাতেই বলবে, কাজটা নিতান্ত অন্যায় হয়েছে। ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-ভুলের এই অংশটা, এই বিশেষ বোধ কেউ কাউকে শিখিয়ে দেয় না। এটা মানুষের গভীর গহীন সত্তাগত। ঠিক একই রকম বিষয় হল মনুষ্য গুণাবলীর ঊর্ধ্বে একক স্রষ্টায় বিশ্বাস, মানুষের সত্তার গহীনে প্রোথিত। বইয়ের একেবারে শুরুতে এ বিষয়ে আমরা কিছু রিসার্চের কথা জেনেছি। নাস্তিকতা কোনো 'ডিফল্ট পজিশন' না, বরং ছবিহীন অকল্পনীয় একক স্রষ্টায় বিশ্বাসই ডিফল্ট। এডিনবরা ইউনিভার্সিটির Prof. Duncan Pritchard বলেছিলেন: We don't merely believe, We believe because we know it'. ইয়েস উই নো ইট বিফোর উই বিলিভ। হৃদয়গহীনে আমরা জানি, আমরা উপলব্ধি করি, অনুভব করি যে, এই সব কিছুর একজন সর্বকর্তৃত্বময় স্রষ্টা আছেন।

এটা আমরা পরিপার্শ্ব থেকে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে আসি (infer), এবং আশপাশ বুঝে বিশ্বাস করি। আর কেবল বিশ্বাস করার জন্য বিশ্বাস করি না। বরং আমরা বিশ্বাস করি, কারণ আমরা সত্তার গহীনে তা জানি। জানি বলেই, এটা আমরা শাহাদা দেই, সাক্ষ্য দেই। যা জানি না, তার সাক্ষ্য দেব কীভাবে?

আমরা মনে প্রাণে জানি, মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, জীবনে ৪০ বছরে কোনোদিন মিথ্যা বলেননি, যা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে তাঁর জানের দুশমনরাও।

- সাফা পাহাড়ের পাদদেশে কুরাইশরা বলেছে: বলো মুহাম্মাদ, অবশ্যই তোমার কথা বিশ্বাস করব আমরা। যেহেতু ইতিপূর্বে তোমার থেকে মিথ্যা কথা তো আমরা শুনিনি। [৩৯৬]
- মানহানি করার সুযোগ পেয়েও আবু সুফিয়ান হিরাক্লিয়াসের দরবারে পর্যন্ত মানসম্মানের ভয়ে বলতে বাধ্য হয়েছে: ইতিপূর্বে সে কখনও মিথ্যা বলেনি।[৩৯৭]
- যে যে কারণে মানুষ মিথ্যা বলে, তার প্রতিটি (নারী, ক্ষমতা, অর্থ, নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব, সম্মান) উতবা ইবনে রবীআ তাঁকে এক বসায় অফার করেছিল। [৩৯৮] সকল প্রলোভন আর হুমকির মুখে তাঁর জবাব ছিল একটাই—

> “ আপনারা যদি সূর্যের আগুন দিয়ে একটা মশাল জ্বালিয়ে এনে দেন, তাতেও আমি আমার কার্যক্রম ছাড়তে পারবো না। আমাকে যে কাজ দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তা ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। [৩৯৯]

> “ যদি আমার বামহাতে সূর্য ও ডানহাতে চন্দ্র এনে দেয়া হয়, তারপরও আমি এই কাজ (তাওহীদের দাওয়াহ) ছাড়তে পারবো না। [৪০০]

---

[৩৯৬] বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, ৪৭৭০-৪৯৭১-৪৯৭২; মুসলিম ঈমান অধ্যায়, ২০৮ সূত্রে সীরাতুন নবি, শাইখ ইবরাহীম আলী, মাকতাবাতুল বায়ান, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১০৯)

[৩৯৭]আবু সুফিয়ান (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর স্বীকার করেছেন, আমি যদি এই ভয় না করতাম যে, আমার সাথে থাকা মক্কার লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে, তাহলে অবশ্যই আমি ঐদিন মুহাম্মদের নামে মিথ্যা কথা বলে আসতাম। সম্রাটের একটা প্রশ্ন ছিল, 'তাঁর দাবীর পূর্বে তোমরা কি কখনো তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ?' আমি বললাম, 'না'। [বুখারী ০৬ (ইফা), ০৭ (iHadis)]

[৩৯৮] হাকিম, ইবনে আবী শাইবা, আবু ইয়ালা, ইবনে হিশাম, বাইহাকী সূত্রে প্রাগুক্ত। এবং হায়াতুস সাহাবা, ১/৬৩-৬৯

[৩৯৯] মুসনাদে আবু ইয়ালা, তাবারানী আওসাত ও তাবারানী কাবীরে বিশুদ্ধ সনদে। সীরাতুন নবি সা., শাইখ ইবরাহীম আলী, মাকতাবাতুল বায়ান।

[৪০০] বাইহাকী থেকে বর্ণিত, হায়াতুস সাহাবাহ, দারুল কিতাব ৩/৬৪

মি'রাজের মত অবিশ্বাস্য কথা শুনে আবু বাকর রা. বলেছেন: 'যদি এ কথা মুহাম্মদ বলে থাকে, তবে তা-ই সত্য'। এটাকে কি আপনি অন্ধ-বিশ্বাস বলবেন? এটা বলার আগে আবু বকর রা. এর সামনে ৪০ বছরের একটা empirical knowledge ছিল। সেই 'অভিজ্ঞতালব্ধ ও পর্যবেক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান' ছিলেন স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আবু বকরের ৪০ বছরের রিসার্চ। রিসার্চের ফলাফল হল: 'এই ব্যক্তি, ৪০টা বছর যাকে আমি একবারের জন্যও মিথ্যা বলতে দেখিনি, এখনও সে মিথ্যা বলছে না'। আবু বাকর কেবলমাত্র বিশ্বাস করতেন না, বরং 'জানতেন' মুহাম্মদ মিথ্যা বলেন না। আমরাও তা-ই সাক্ষ্য দিই, কেননা আমরা জানি, তিনি মিথ্যা বলেননি। নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রাসূল। এই দুই 'অন্তর্জ্ঞান' আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের যোগ্য নয়, মুহাম্মাদ সেই আল্লাহর 'প্রেরিত ব্যক্তি'।

এই জ্ঞানভিত্তিক বিশ্বাসের ইন্দ্রিয় যার আছে, তার কোনো প্রশ্ন নেই। তার কাছে শুধু উত্তর আর উত্তর। সমাধান আর সমাধান। আল্লাহ আমাদের এই ইন্দ্রিয় নসীব করুন। এই ইন্দ্রিয় সহকারে দুনিয়া ছেড়ে যাবার তাওফিক দিন।

পরিশিষ্ট ১

জেনেভা কনভেনশন ১৯২৯

পার্ট ১: সাধারণ নীতিমালা

১. যুদ্ধরত সকল পক্ষের জন্য কার্যকর হবে, যারা শত্রুর কাছে ধৃত।

২. শত্রু সরকারের হেফাজতে থাকবে। কিন্তু ধৃতকারী ব্যাটেলিয়নের কাছে নয়। মানবিক আচরণ পাবে। প্রতিশোধ নেয়া যাবে না।

৩. তাদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাকে সম্মান। নারীদেরকে তাদের লিঙ্গ বিবেচনায় আচরণ।

৪. বন্দিদেরকে বন্দিকারী পক্ষ ভরণপোষণ দেবে। অফিসারদের, নারীদের, অসুস্থদের, টেকনিক্যালদের আলাদা সুবিধায় রাখতে হবে।

পার্ট ২: বন্দিকরণ

৫. নিজ দেশের বা আর্মির গোপন তথ্য দেবার জন্য বন্দিকে চাপ-হুমকি দেয়া যাবে না।

৬. সামরিক দ্রব্য ছাড়া বন্দির ব্যক্তিগত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা যাবে না।

পার্ট ৩: বন্দিত্ব

পর্ব ১: বন্দিদের সরিয়ে নেয়া

৭. দ্রুততম সময়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ক্যাম্পে নিতে হবে।

৮. যুদ্ধরত সকল পক্ষকে জানিয়ে দিতে হবে ধরার ব্যাপারে। দ্রুত বন্দিদেরকে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে হবে।

পর্ব ২: যুদ্ধবন্দি ক্যাম্প

৯. গরাদে রাখা বা আটকে রাখা যাবে না। খারাপ আবহাওয়া থেকে সরিয়ে ভালো জায়গায় রাখতে হবে।

অধ্যায় ১: ক্যাম্প বসানো

১০. স্বাস্থ্যকর জায়গায় রাখা। ভবন বা কুঁড়েঘরে। তাদের আবাসন মান, জনপ্রতি স্থান সংকুলান, বিছানাপত্র হতে হবে হেফাজতকারী বাহিনীর মতোই।

অধ্যায় ২: খাবার-পোশাক

১১. বন্দিকারী বাহিনীর সমান খাদ্য বরাদ্দ থাকতে হবে। পর্যাপ্ত পানি ব্যবহার, ধূমপানের সুযোগ। রান্নাঘরে খাটানো যাবে।

১২. বন্দিকারী পক্ষ বন্দিদেরকে পোশাক, জুতো, অন্তর্বাসের ব্যবস্থা করবে। রেগুলার সেগুলো পরিবর্তন করবে। ক্যান্টিন থাকতে হবে, ক্যান্টিনের লাভও বন্দিদের জন্য ব্যয় হবে।

অধ্যায় ৩: ক্যাম্পে স্বাস্থ্য পরিস্থিতি

১৩. ক্যাম্পে সর্বদা পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর অবস্থা বজায় রাখা। গোসল ইত্যাদির জন্য ব্যবস্থা ও পানি সরবরাহ রাখা।

১৪. চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

১৫. মাসে একবার মেডিকেল টীম কর্তৃক পরিদর্শনের ব্যবস্থা।

অধ্যায় ৪: নৈতিক চাহিদা

১৬. ধর্মপালনের স্বাধীনতা ও ব্যবস্থা

১৭. বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও ক্রীড়ামুখী রাখা

অধ্যায় ৫: ক্যাম্প শৃঙ্খলা

১৮. বন্দিকারী বাহিনীর অফিসারদের স্যালুট দিতে হবে।

১৯. বন্দিরা র‌্যাঙ্ক-ব্যাজ পরতে পারবে।

২০. যেকোনো নোটিশ, নিয়মজারি, ঘোষণা তাদের বোধগম্য ভাষায় হতে হবে।

অধ্যায় ৬: অফিসারদের বিশেষ সুবিধাদি

২১. যুদ্ধরত পক্ষগুলো নিজ নিজ আর্মির র‌্যাঙ্ক-পদবি ডেকোরাম জানিয়ে দেবে, যাতে অফিসার বন্দিদের উপযুক্ত সুবিধা দেয়া যায়।

২২. একই বাহিনীর অফিসার-সেনা একসাথে রাখা যাবে না। অফিসারদেরকে ভাতা দেবে বন্দিকারী বাহিনী।

অধ্যায় ৭: বন্দিদের আর্থিক যোগান

২৩. বন্দি অফিসাররা বন্দিকারী বাহিনীর একই র‍্যাঙ্কের সমান বেতন পাবে। মাসের বেতন মাসে দেয়া। কোনো কাটা যাবে না নিজেদের খরচ বাবদ। এটা যুদ্ধ শেষে বন্দির পক্ষ পরিশোধ করে দেবে।

২৪. বন্দি অফিসারদের একাউন্ট মেইনটেইন করা হবে। মুক্তির সময় একাউন্ট ব্যালেন্স তার হাতে দেয়া হবে।

অধ্যায় ৮: বন্দিদের অন্যত্র সরানো

২৫. অসুস্থদের না সরানো

২৬. কোথায় নেয়া হচ্ছে, কেন, এসব জানাতে হবে। সরানোর খরচ বন্দিকারী বাহিনী বহন করবে।

পর্ব ৩: যুদ্ধবন্দিদের কাজ

অধ্যায় ১: সাধারণ নীতিমালা

২৭. অফিসার ছাড়া বাকিদের কাজে নিয়োগ করা যাবে। শুধু দেখভাল-টাইপ কাজে বাধ্য করা যাবে। কাজ করতে গিয়ে আহত হলে, ক্ষতিপূরণ পাবে।

অধ্যায় ২: কাজের ধরন

২৮. বন্দিদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হলে, সকল দায়দায়িত্ব বহন করবে বন্দিকারী বাহিনী।

২৯. সাধ্যাতীত কাজে লাগানো যাবে না।

৩০. বেসামরিক লোকদের মত কর্মঘণ্টা। সপ্তাহে রবিবার ছুটি।

অধ্যায় ৩: নিষিদ্ধ কাজ

৩১. সামরিক যেকোনো কাজে লাগানো যাবে না।

৩২. অস্বাস্থ্যকর বা ঝুঁকিপুর্ণ কাজে লাগানো যাবে না।

অধ্যায় ৪: শ্রমিক-আবাসন

৩৩. ক্যাম্পের মতই স্বাস্থ্যকর ও ফ্যাসিলিটি থাকতে হবে।

অধ্যায় ৫: বেতন

৩৪. ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের কোনো কাজে লাগালে বেতন পাবে না। যুদ্ধরত উভয় পক্ষ ঠিক করবে যুদ্ধবন্দিদের বেতন। যতদিন ঠিক না হচ্ছে, ততদিন বন্দিকারী বাহিনীর সমানই পাবে।

পর্ব ৪: বহির্জগতের সাথে সম্পর্ক

৩৫-৪১. চিঠি-পার্সেল আদানপ্রদান ইত্যাদি সংক্রান্ত। পরিবারের সাথে যোগাযোগ।

পর্ব ৫: বন্দিকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ

অধ্যায় ১: যেকোনো অব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে পারবে।

অধ্যায় ২: নিজেদের প্রতিনিধি ঠিক করতে পারবে যিনি মধ্যস্থতা করবে নানা বিষয়ে।

অধ্যায় ৩: যুদ্ধবন্দিদের দণ্ডবিধি। একই অপরাধে বন্দিকারী সেনার যে সাজা, একই সাজা। পালানোর চেষ্টা কোনো অপরাধ বিবেচিত হবে না। শাস্তি হিসেবে শুধু নজরদারি বাড়ানো হবে, কোনো সুবিধা হরণ করা যাবে না। ইত্যাদি।

পার্ট ৪: বন্দিত্ব শেষে

নিরপেক্ষ ভূমিতে তাদের সরিয়ে নেয়া হবে। এই খরচ পুরোপুরি বন্দিকারী বাহিনী বহন করবে।

যদি কারুর ফৌজদারি বিচার চলে, তাদের রেখে দেয়া হবে।

এরপর থেকে শেষ অব্দি ধারাগুলো হল, কীভাবে এই কনভেনশন কার্যকর হবে, কবে থেকে হবে। ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ২

মানবাধিকার সনদ ১৯৪৮

(সরল বঙ্গানুবাদ)

যেহেতু পৃথিবীতে স্বাধীনতা, সুবিচার ও শান্তির ভিত্তিমূলই হল মানব পরিবারের সকল সদস্যের 'জন্মগত সম্মান ও অবিচ্ছেদ্য সমানাধিকার'-কে স্বীকৃতি দেয়া।

যেহেতু মানবাধিকারের অসম্মান ও অবজ্ঞা থেকেই ঘটেছে সেসব বর্বরোচিত ঘটনাগুলো যা মানব-বিবেককে অত্যাচারে জর্জরিত করেছে। যেহেতু মানুষ বাকশক্তি ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ভয়-দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবে এমন একটি পৃথিবী নির্মাণই সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আকাঙক্ষা।

স্বৈরাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে যাতে শেষ আশ্রয় হিসেবে মানুষকে বিদ্রোহ করতে না হয়, সেজন্য এটা জরুরি যে, মানবাধিকারকে আইনের শাসন দ্বারা রক্ষা করতে হবে।

যেহেতু জাতিসমূহের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গঠনকে প্রোমোট করা দরকার।

যেহেতু জাতিসংঘের জনগণ চার্টারের মাধ্যমে মৌলিক মানবাধিকারের উপর, মানব ব্যক্তিত্বের মর্যাদা-মূল্যের উপর এবং নারী-পুরুষ সমানাধিকারের উপর নিজেদের ঈমানকে পুনঃনিশ্চিত করেছে এবং আরও স্বাধীনতার দিকে সমাজের অগ্রগতি ও জীবনমান উন্নয়নের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করেছে।

যেহেতু সদস্য রাষ্ট্রগুলো বাইয়াতবদ্ধ হয়েছে যে, তারা জাতিসংঘের সহযোগিতায় মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সার্বজনীন সম্মানকে প্রোমোট করবে।

যেহেতু এই বাইয়াত বাস্তবায়নের জন্য এই অধিকার ও স্বাধীনতাগুলোর একটা কমন বুঝ থাকাটা সবচেয়ে জরুরি।

অতএব, এখন, সাধারণ পরিষদ ঘোষণা করছে এই সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ। সকল মানুষ ও সব জাতির জন্য অর্জনের পথে ধাবিত হবার একটা কমন লক্ষ্য হিসেবে,

যতদিন না প্রত্যেক ব্যক্তি এবং সমাজের প্রত্যেক সত্তা এই ঘোষণাকে ধ্রুব সত্য মেনে নিয়ে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লড়তে থাকবে, যাতে এই অধিকার ও স্বাধীনতাগুলো প্রোমোট করা যায়। এবং ক্রমে ক্রমে জাতীয়-আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের দ্বারা এগুলোর সার্বজনীনতা, কার্যকর স্বীকৃতি ও পালনকে নিশ্চিত করা যায়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোতেও এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডের জনগণের মাঝেও।

আর্টিকেল ১

সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং সম্মানে-অধিকারে সমান। তাদের রয়েছে যুক্তি-বিবেকের ক্ষমতা এবং তাদের পরস্পরের মাঝে আচরণ হবে ভ্রাতৃত্বের প্রেরণায়।

আর্টিকেল ২

এই সনদে উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতার স্বত্ববান হবে প্রত্যেকেই, কোনো প্রকার বৈষম্য ছাড়া, যেমন— জাত, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা ভিন্ন আদর্শ, জাতীয়-সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ড, সম্পত্তি, জন্মগত মর্যাদা। এছাড়াও কোনো ভূখণ্ডের রাজনৈতিক, বিচারিক বা আন্তর্জাতিক স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে মানুষের মাঝে ফারাক করা চলবে না, হোক তার দেশ স্বাধীন, পরাধীন, ট্রাস্ট বা অসার্বভৌম।

আর্টিকেল ৩

জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং নিরাপত্তার অধিকার প্রত্যেকের।

আর্টিকেল ৪

কাউকে দাসত্বে বা বাধ্যশ্রমে রাখা যাবে না। দাসব্যবসার যত ধরন আছে, সব নিষিদ্ধ।

আর্টিকেল ৫

কাউকে নির্যাতন বা নির্দয়-অমানবিক-অপমানকর আচরণ বা শাস্তি দেয়া যাবে না।

আর্টিকেল ৬

প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে সর্বত্র আইনত একজন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাবার।

আর্টিকেল ৭

আইনের চোখে সবাই সমান। আইন সুরক্ষা দেবার ব্যাপারে সবাই সমান। এই সনদ

লঙ্ঘন হয় বা লঙ্ঘনকে উস্কে দেয় এমন ক্ষেত্রে সবাই সমান সুরক্ষা পাবে।

আর্টিকেল ৮

আইন-সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়, এমন ক্ষেত্রে সকলেই উপযুক্ত জাতীয় মানবাধিকার ট্রাইব্যুনালে বিচার পাবার হকদার।

আর্টিকেল ৯

কাউকে নিয়মবহির্ভূতভাবে গ্রেপ্তার, আটক বা নির্বাসন দেয়া যাবে না।

আর্টিকেল ১০

কারও বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি অভিযোগ প্রমাণে এবং তার অধিকার-আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত করতে একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন ট্রাইবুনালে সুষ্ঠু (fair) ও প্রকাশ্য শুনানির (public hearing) অধিকার প্রত্যেকের থাকবে সমান।

আর্টিকেল ১১

(১) শাস্তিপ্রাপ্য অপরাধে হলে অভিযুক্ত হলে আইনত : দোষী প্রমাণ না হওয়া অব্দি প্রত্যেকে নির্দোষ। প্রকাশ্য বিচারে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল নিশ্চয়তা থাকবে।

(২) যে সময়ে কাজটি করেছে, ঠিক সেই সময় প্রচলিত আইনে(জাতীয় বা আন্তর্জাতিক) অপরাধ নয়, এমন দোষে কাউকে দোষী করা যাবে না। কিংবা অপরাধ করার সময় ঐ অপরাধের যে দণ্ড প্রচলিত, তার চেয়ে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না। (নতুন আইন করে)

আর্টিকেল ১২

নিয়ম বহির্ভূতভাবে কারও গোপনীয়তা, পরিবার, বাসাবাড়ি বা যোগাযোগে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। কারও সম্মান ও খ্যাতির উপর আক্রমণ করা যাবে না। এমন হস্তক্ষেপ বা আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের আইনের আশ্রয় নেবার অধিকার থাকবে।

আর্টিকেল ১৩

(১) রাষ্ট্রের সীমানার ভিতর প্রত্যেকের চলাফেরা ও বসবাসের স্বাধীনতা রয়েছে।

(২) প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে নিজের দেশসহ যেকোনো দেশ ত্যাগ এবং নিজ দেশে ফেরার।

আর্টিকেল ১৪

(১) নির্যাতন থেকে বাঁচতে প্রত্যেকের অধিকার থাকবে অন্যদেশে আশ্রয় চাওয়ার ও পাওয়ার।

(২) জাতিসংঘের লক্ষ্য-নীতিবিরুদ্ধ অপরাধ বা অরাজনৈতিক অপরাধে ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রযোজ্য হবে না।

আর্টিকেল ১৫

(১) প্রত্যেকের একটি জাতীয়তা পাবার অধিকার রয়েছে।

(২) নিয়ম বহির্ভূতভাবে কাউকে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আবার জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকারও ক্ষুণ্ণ করা যাবে না।

আর্টিকেল ১৬

(১) পূর্ণবয়স্ক নর-নারীর বিবাহ ও ও পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে— জাত, জাতীয়তা বা ধর্মের বাধা ব্যতিরেকেই। বিবাহের জন্য, বিবাহের মাঝে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদে তাদের সমানাধিকার প্রাপ্য।

(২) ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রীর মুক্ত-পূর্ণ সম্মতিতেই কেবল বিবাহ সম্পন্ন হবে।

(৩) পরিবার হল সমাজের প্রাকৃতিক ও মৌলিক ইউনিট। সমাজ-রাষ্ট্র একে সুরক্ষা দেবে।

আর্টিকেল ১৭

১) প্রত্যেকের নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার থাকবে, সেই সাথে সম্মিলিত সম্পত্তিরও।

২) নিয়মবহির্ভূতভাবে কাউকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

আর্টিকেল ১৮

চিন্তা-বিবেক-ধর্মের স্বাধীনতা প্রত্যেকের অধিকার। ধর্ম-বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতা এবং প্রকাশের (চর্চা-শিক্ষা-উপাসনা-পালনের দ্বারা) স্বাধীনতা থাকবে। একাকী-প্রকাশ্যে, গোপনে-সমাজের সামনে সবভাবেই।

আর্টিকেল ১৯

মতামত দান ও মতপ্রকাশের অধিকার সবার। হস্তক্ষেপ ছাড়াই মত দেয়া, বাধাহীনভাবে মিডিয়াতে সুযোগ নেয়া, তথ্য আহরণের অধিকার এর মাঝে শামিল।

আর্টিকেল ২০

১) প্রত্যেকের জমায়েত হবার ও সংগঠন করার অধিকার আছে।

২) কাউকে কোনো সংগঠনে যোগ দেবার জন্য জোর করা যাবে না।

আর্টিকেল ২১

১) নিজ দেশে সরকারে অংশ নেবার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। হয় সরাসরি, কিংবা মুক্তভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে।

২) নিজ দেশের সরকারি চাকরিতে প্রত্যেকের সমান সুযোগ থাকবে।

৩) সরকারের কর্তৃত্বের ভিত্তি হল জনগণের ইচ্ছা। সময় সময় সুষ্ঠু নির্বাচনের দ্বারা এই ইচ্ছা প্রকাশ পাবে। নির্বাচন হবে সার্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের মাধ্যমে, সংঘটিত হবে গোপন ভোট বা অন্য মুক্ত ভোট ব্যবস্থার দ্বারা।

আর্টিকেল ২২

সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। জাতীয় প্রচেষ্টা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং দেশীয় সংস্থা ও উপকরণের মাধ্যমে তার অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার বাস্তবায়ন করা হবে, যা তার ব্যক্তিত্বের মুক্ত বিকাশ ও মর্যাদার জন্য অপরিহার্য।

আর্টিকেল ২৩

১) কাজ করার অধিকার, কাজ বেছে নেবার অধিকার, যথাযথ ও অনুকূল কর্মপরিবেশের অধিকার এবং বেকারত্ব থেকে সুরক্ষার অধিকার প্রত্যেকের আছে।

২) সমান কাজের জন্য সমান বেতন প্রত্যেকের অধিকার, কোনো প্রকার বৈষম্য ব্যতিরেকে।

৩) প্রত্যেক কর্মীর যথাযথ ও অনুকূল পারিশ্রমিকের অধিকার রয়েছে। যা তার ও তার পরিবারের মানবোচিত মর্যাদার জীবন নিশ্চিত করবে। এবং তা সামাজিক নিরাপত্তার নানান উপায়-উপকরণ দ্বারা আরও বর্ধিত করা হবে।

৪) নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যোগ দেবার।

আর্টিকেল ২৪

প্রত্যেকের বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার রয়েছে। যেমন, কর্মঘণ্টার যৌক্তিক সীমা নির্ধারণ এবং পর্যায়ক্রমে বৈতনিক ছুটির দিন।

আর্টিকেল ২৫

১) প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে জীবনমান বজায় রাখার। যা নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য পর্যাপ্ত, যেমন: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং দরকারি সামাজিক পরিষেবা। বেকারত্ব-রোগ-প্রতিবন্ধিতা-বৈধব্য-বার্ধক্য বা অন্যান্য অভাব-অনটনে সুরক্ষার অধিকার রয়েছে সবার, যখন পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে নেই।

২) মাতৃত্ব ও শৈশবে বিশেষ যত্ন ও সহযোগিতা প্রয়োজন। বৈধ-অবৈধ সকল শিশু একই সামাজিক সুরক্ষা পাবে।

আর্টিকেল ২৬

১) শিক্ষার অধিকার সবার। কমপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ের শিক্ষা হবে বিনামূল্যে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা সাধারণ্যে সহজলভ্য হবে। উচ্চশিক্ষা হবে সকলের জন্য মেধার ভিত্তিতে সমান সুযোগ দ্বারা।

২) শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানব-ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মৌলিক স্বাধীনতা-মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাকে জোরদার করা। সকল জাতি-বর্ণ-ধর্মের মাঝে বোঝাপড়া, সহিষ্ণুতা-বন্ধুত্বকে তুলে ধরবে এই শিক্ষা। শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে জাতিসংঘের কার্যক্রমকে আরও বেগবান করবে এই শিক্ষা।

৩) সন্তানকে কেমন শিক্ষা দেয়া হবে তা নির্বাচনে পিতামাতার অগ্রাধিকার থাকবে।

আর্টিকেল ২৭

১) সমাজের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অংশ নেবার স্বাধীন অধিকার থাকবে প্রত্যেকের। শিল্প উপভোগ, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও কল্যাণে অংশ নেয়ার অধিকার থাকবে।

২) নিজের রচিত বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক বা শৈল্পিক নির্মাণকে নিজ নৈতিক-পার্থিব স্বার্থে সুরক্ষা দেবার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে।

আর্টিকেল ২৮

এই সনদে উল্লিখিত অধিকার ও স্বাধীনতাগুলো যেন পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়, এমন সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় (order) প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে।

আর্টিকেল ২৯

১) যে কমিউনিটিতে ব্যক্তিত্বের মুক্ত ও পূর্ণ বিকাশ হয়, কেবল সেই কমিউনিটির প্রতি প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে।

২) কারও অধিকার ও স্বাধীনতা পাবার ক্ষেত্র তখনই আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হবে, যখন অপরের সম্মান-স্বীকৃতির সুরক্ষা দেবার প্রয়োজন পড়বে। এবং নৈতিকতা রক্ষা, গণশৃঙ্খলা রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক সমাজের সার্বিক কল্যাণ রক্ষার দরকার পড়বে।

৩) জাতিসংঘের নীতি-লক্ষ্যের পরিপন্থী কোনো ক্ষেত্রে কোনোভাবেই এইসব অধিকার-স্বাধীনতাগুলো দেয়া হবে না।

আর্টিকেল ৩০

এখানে উল্লিখিত অধিকার ও স্বাধীনতার কোনো একটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমন কোনো কাজে লিপ্ত রাষ্ট্র, গ্রুপ বা ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োগের স্বার্থে এই সনদের কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানো চলবে না।

পরিশিষ্ট ৩

ধর্ষণ প্রমাণে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের সংজ্ঞায় কোনো ধোঁয়াশা নেই। ইসলামে 'যিনা বিল জবর' বা জবরদস্তি ব্যভিচার করা একটা অপরাধ। এর শর্ত হল:

১. এটা যিনা হতে হবে। বিবাহিতা স্ত্রীও না, শরঈ দাসীও না। সুতরাং বিবাহিতা স্ত্রী ও শরঈ মালিকানাধীন দাসীর সাথে যেহেতু যিনা বলে কিছু হয় না (দুটোই বৈধ মিলন), সুতরাং 'যিনা বিল জবর'-ও হয় না। এখানে ধর্ষণ ও যিনা-বিল-জবর এর মাঝে পার্থক্য।

২. 'জোর করা' ব্যাপারটা থাকতে হবে, যার প্রমাণ হল:

- নারীর চিৎকার। যদি মহিলা সজোরে চিৎকার করে তবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। [৪০১]

- এমন হতে পারে, অস্ত্র বা হুমকির মুখে চিৎকার করতে পারেনি। যদি প্রমাণ হয় যে, মহিলাকে অস্ত্রের মুখে, জীবননাশের ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ধর্ষক 'মুহারিব' অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হিসেবে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে—

> “ যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে লড়াই করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, **তাদেরকে হত্যা করা হবে** অথবা **শূলীতে চড়ানো হবে** অথবা **তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে** অথবা **দেশ থেকে বহিষ্কার** করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।'[৪০২]

এই আয়াত অনুসারে ধর্ষকের অপরাধের ভয়াবহতা অনুসারে এবং সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপনকে উদ্দেশ্য করে ৪টি শাস্তির যেকোনোটি রায় দিবেন বিচারক।

---

[৪০১] সাইয়্যেদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ ২/২৫৪

[৪০২] সূরা মায়িদা, ৫ : ৩৩

উপরের দুটি শর্ত পাওয়া গেলে নারীকে ছেড়ে দিয়ে শুধু পুরুষের উপর হদ শাস্তি দেয়া হবে। আলকামাহ ইবনু ওয়াইল (রহ.) হতে তার পিতা থেকে বর্ণিত,

> “ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে জনৈকা মহিলা সলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে নাগালে পেয়ে তার উপর চেপে বসে তাকে ধর্ষণ করে। সে চিৎকার দিলে লোকটি সরে পড়ে। ... আসল অপরাধী দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমিই অপরাধী। তিনি ধর্ষিতা মহিলাটিকে বললেন: তুমি চলে যাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন আর নির্দোষ ব্যক্তি সম্পর্কে উত্তম কথা বললেন। যে ধর্ষণের অপরাধী তার ব্যাপারে তিনি বললেন: তোমরা একে পাথর মারো। [৪০৩]

ইমাম আবূ হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন :

> “ যদি মহিলাকে বলাৎকার করা হয় কিংবা জোরপূর্বক ছিনতাই করা হয়, তাহলে মহিলার উপর কোনো শাস্তি কার্যকর হবে না। [৪০৪]

আর মহিলার সম্মতির প্রমাণ পাওয়া গেলে (অসম্মতির প্রমাণ না থাকলে) মহিলাও দোষী সাব্যস্ত হবে। দুধ কা দুধ, পানি কা পানি।

---

[৪০৩] সুনানে আবু দাউদ ৪৩৭৯

[৪০৪] ইসলামী আইন ও আইনবিজ্ঞান, ১/২৬৬।
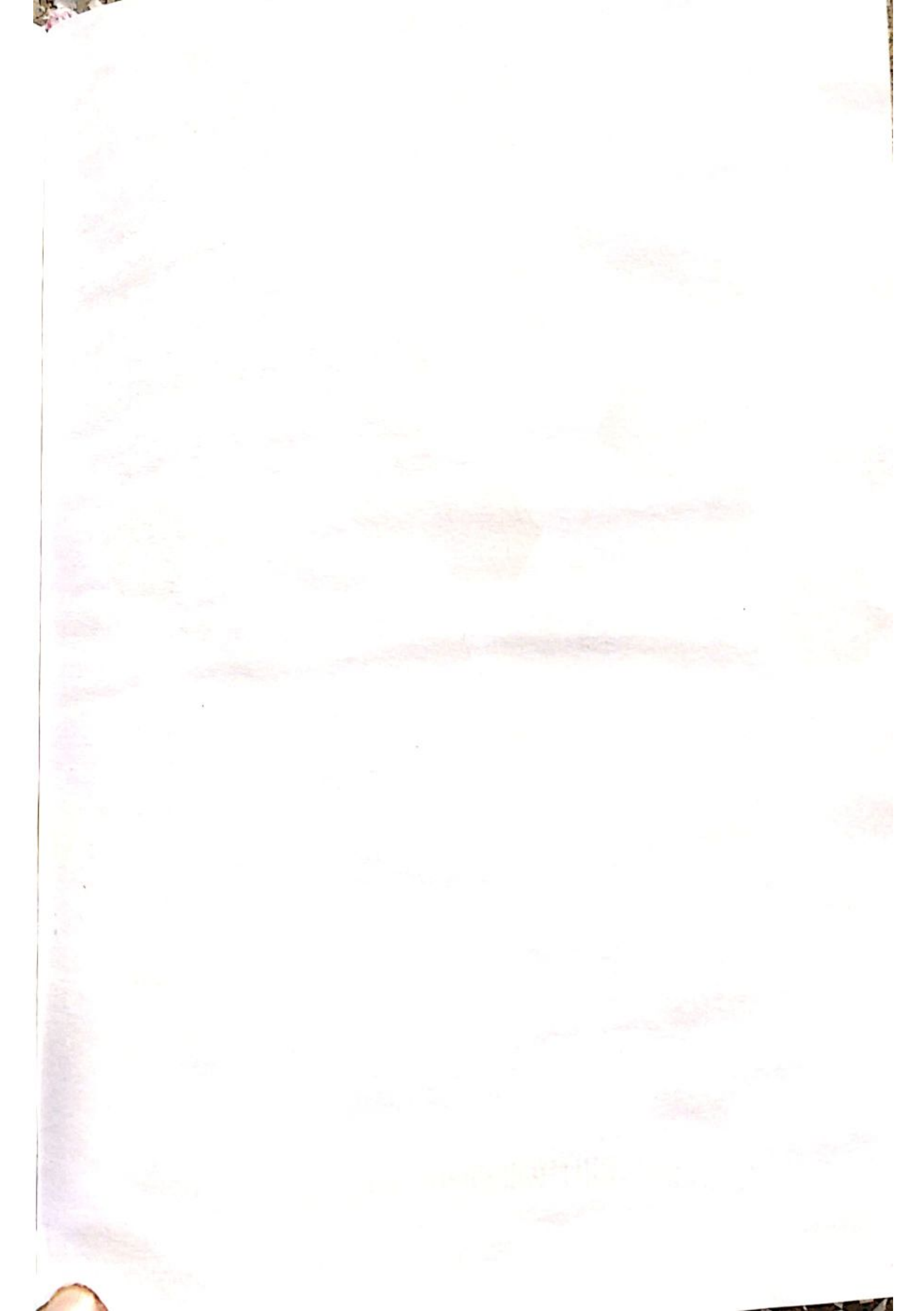
সুপ্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীতে নানাভাবে দাসপ্রথার প্রচলন চলে আসছে। প্রচলিত ছিল দাসপ্রথার বিভিন্ন উৎস। ইসলাম এসে একদিকে দাসপ্রথার একাধিক উৎসকে বন্ধ করেছে, অন্যদিকে মানব সভ্যতার নির্মম বাস্তবতা 'যুদ্ধকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্বের' বিবেচনায় এই প্রথাকে পরিপূর্ণরূপে বিলুপ্তও করেনি। তবে একটিমাত্র উৎস (যুদ্ধবন্দি) থেকে প্রাপ্ত দাসদেরকে আখিরাতের মুক্তি ও সামাজিক জীবনের সম্মানের দিকে নিয়ে আসার জন্য দিয়েছে নজিরবিহীন এক পদ্ধতি।

যুদ্ধপরবর্তী বাস্তবতায় ইসলামের সিদ্ধান্তের কোনো বিকল্প আজ পর্যন্ত কোনো সভ্যতা দিতে পারেনি। এমনকি সভ্যতার গর্ব জেনেভা কনভেনশনগুলোও পারেনি পরাজিতদের উপর যুদ্ধ পরবর্তীতে নেমে আসা বিপর্যয়ের সুষ্ঠু সমাধান দিতে। বিভিন্ন সভ্যতায় দাসপ্রথা ও ইসলামে দাসপ্রথার তুলনা তুলে ধরার পাশাপাশি লেখক আঘাত করেছেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার 'আধুনিক দাসপ্রথা'র কাঠামোতেও।

বইয়ের অনন্য বৈশিষ্ট্য হল:

এক. বইটিতে প্রতিরক্ষামূলক হীনম্মন্য অবস্থান গ্রহণের পরিবর্তে ইউরোপীয় 'স্বাধীনতার' দর্শনকে প্রশ্ন করা হয়েছে।

দুই. শান্তি ও মানবতার দাবিদার পুঁজিবাদী বিশ্বের হর্তাকর্তাদের চাপিয়ে দেয়া আধুনিক দাসপ্রথার নির্মমতর অথচ অগোচর চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে।

তিন. মূল বিষয়বস্তুর সাথে কোনোভাবে প্রাসঙ্গিক, এমন বিষয়গুলোর অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ আলোচনা এসেছে। যেমন: কনসেন্ট বা সম্মতি, স্বাধীনতা, সমতা ইত্যাকার গালভরা বুলির পেছনের বাস্তবতা।

এমন আরো অনেক বিষয়েরই আলোচনা এসেছে যা পড়ার সময়ই পাঠক দেখতে পাবেন।

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
01924076365

বাংলাবাজার শাখা
১ আন্ডার গ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা। 01715023118

www.maktabatulazhar.com

ISBN No. 978-984-93388-3-6
Design by: Bushra Afzal